গৌড়ীয়

বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার, এম-এ, প্রণীত।

মূল্য দুই টাকা মাত্র

প্রবাসী প্রেস,
৯১নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা,
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শৈশবে যাঁর মুখে 'নিমাই সন্ন্যাসে'র কথা

শুনিয়া আমার হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের

প্রতি ভক্তির প্রথম বীজ অঙ্কুরিত

হয়, যিনি 'শচীমাতার' মত

অসীম সহিষ্ণুতায় দারুণ

মনোবেদনা সহ্য

করিয়াছিলেন

সেই

পূজনীয়া **মাতৃদেবীর**

পবিত্র স্মৃতিতে

নিমাই-জীবনী-সম্বলিত এই গ্রন্থখানি

পরম শ্রদ্ধাভরে

উৎসর্গীকৃত

হইল।

১৯২৭

সূচীপত্র

শুদ্ধিপত্র।

১১ পৃষ্ঠায় ১৮ লাইনে "বাক্যকাল" স্থানে বাল্যকাল হইবে।

১৬ " ১৬ " "পালাবোধ" স্থানে পাপবোধ হইবে।

১৭ " ১৫ " "করিতেছি" স্থানে করিতেছে হইবে।

১৭ " ২৩ " "ক্রমে" স্থানে ক্রমে হইবে।

২২ " ২৩ লাইনে "অবতারাবাদ" স্থানে অবতারবাদ হইবে।

২৩ " ৬ " "অবতারাত্বের" স্থানে অবতারত্বের হইবে।

২৩ " ৭ " "শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রাত" স্থানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি হইবে।

৩৯ " ১১ " "নিতান্ত" স্থানে নিতান্ত হইবে।

৪৮ " ১০ " "চৈতন্য ভাগবতের" স্থানে চৈতন্য ভাগবতে হইবে।

৪৮ " ২১ " "জীবনে" স্থানে জীবনের হইবে।

৪৮ " ২২ " "বৃন্দাবন দাস সমস্ত ঘটনা" স্থানে বৃন্দাবন দাস যে সমস্ত ঘটনা হইবে।

৫২ " ১৩ " "রচনা" স্থানে রচনার হইবে।

৫৯ " ১৬ " "বা" স্থানে কি হইবে।

৬৩ " ২৩ " "সাধারণতঃর" স্থানে সাধারণতঃ হইবে।

৭৫ " ৬ " "সুস্পষ্ট" স্থানে সুস্পষ্ট হইবে।

৭৫ " ১৭ " "গৃহে" স্থানে গৃহের হইবে।

৭৫ " ২২ " "অঙ্গিনার" স্থানে আঙ্গিনার হইবে।

৭৬ " ৭ " "সচক্ষে" স্থানে স্বচক্ষে হইবে।

৭৭ " ৭ " "কড়চায় প্রামাণিকতার" স্থানে কড়চার প্রামাণিকতা হইবে।

৭৭ পৃষ্ঠায়	২০ লাইনে		“বিবরণ” স্থানে বিবরণে হইবে।	
৮০	,,			“১৪৮৫” স্থানে ১৪৮৬ হইবে।
৮৪	,,	১৩	,,	“সে” স্থানে যে হইবে।
৮৫	,,	১৯	,,	“দুর্ব্বিত্ততারই” স্থানে দুর্ব্বৃত্ততারই হইবে।
৮৮	,,			“চপলাতার” স্থানে চপলতার হইবে।
৮৯	,,	২১	,,	“নির্ব্বান্ধাতিশয্যে” স্থানে নির্ব্বন্ধাতিশয্যে হইবে
৯২	,,	২	,,	“কোথা” স্থানে কোথায় হইবে।
৯৫	,,	৬	,,	“বিবাহে” স্থানে বিবাহের হইবে।
১০৭	,,	৪	,,	“পারিতেন” স্থানে পারেন হইবে।
১১৩	,,	১৬	,,	“দুরতীর্থ” স্থানে দুরতীর্থে হইবে।
১১৭	,,	৩	,,	“তাহাতে” স্থানে তাঁহাতে হইবে।
১৩৫	,,	৯	,,	“গ্রেন্থকারগণ” স্থানে গ্রন্থকারগণ হইবে।
১৩৬	,,	১৪	,,	“কল্লনা” স্থানে কল্পনা হইবে।
১৩৬	,,	১৫	,,	“দেখানর” স্থানে দেখাইবার হইবে।
১৩৮	,,	২৩	,,	“অনুবক্ত” স্থানে অনুরক্ত হইবে।
১৪০	,,	১৭	,,	“কবিতে” স্থানে করিতে হইবে।
১৪১	,,	২৩	,,	“বাদির” স্থানে আদির হইবে।
১৪২	,,	১৫	,,	“প্রধমে” স্থানে প্রথমে হইবে।
১৪৫	,,	১২	,,	“গৃহেই” স্থানে গৃহই হইবে।
১৫১	,,	২৩	,,	“দুর্ব্বিত্ত” স্থানে দুর্ব্বৃত্ত হইবে।
১৫৩	,,	৪	,,	“ছিমাম” স্থানে ছিলাম হইবে।
১৬৮	,,	২০	,,	“ন্যাই” স্থানে নাই হইবে।
১৭০	,,	৫	,,	“লইল” স্থানে হইল হইবে।
১৮২	,,	২০	,,	“যও” স্থানে যাও হইবে।

১৯৪ পৃষ্ঠায় ১১ লাইনে "স্পষ্ট্ই" স্থানে স্পষ্টই হইবে।

২৮৪	,,	১৭	,,	"সর্ব্বভৌম" স্থানে সার্ব্বভৌম হইবে।
২০২	,,	৬	,,	"গবিন্দ" স্থানে গোবিন্দ হইবে।
২৩৭	,,	১০	,,	"ষষ্ঠি" স্থানে যষ্টি হইবে।
১৪০	,,	১৪	,,	"পরিক্ষা" স্থানে পরীক্ষা হইবে।
২৪৫	,,	৮	,,	"না" স্থানে নাই হইবে।
২৪৭	,,	৬	,,	"যাইবেন" স্থানে যাইবে হইবে।
২৫২	,,	৬	,,	"যুদ্ধের" স্থানে যুদ্ধের হইবে।
২৫৪	,,	১০	,,	"স্থান" জায়গায় স্থানে হইবে।
২৫৬	,,	১৯	,,	"শ্রীচৈন্যদেব" স্থানে শ্রীচৈতন্যদেব হইবে।
২৫৬	,,	২১	,,	"হইকেন" স্থানে হইলেন হইবে।
২৫৭	,,	১৪	,,	"হইলেন" স্থানে হইয়া হইবে।
২৭০	,,	২০	,,	"তাহারা" স্থানে তাঁহারা হইবে।
২৮৩	,,	১৪	,,	"দশক্রোশ" স্থানে দশক্রোশ হইবে।
২৮3	,,	১৪	,,	"ক্ষমতা" স্থানে ক্ষমা হইবে।
২৯৮	,,	৫	,,	"শ্রীবাসাচার্য্যের" স্থানে শ্রীবাসাচার্য্যের হইবে।
৩০৪	,,	১৫	,,	"গৃহে" স্থানে গৃহের হইবে।
৩০৯	,,	১৬	,,	"ব্যপ্ত" স্থানে ব্যাপ্ত হইবে।
৩২৯	,,	২৩	,,	"কারয়া" স্থানে করিয়া হইবে।

বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব

বৈষ্ণবধর্ম্মের জন্ম ও বিকাশ

ভারতের ধর্ম্ম-ইতিহাসে বৈষ্ণবধর্ম্ম এক অমূল্য সম্পদ। কোনও কোনও অংশে ইহাকে জগতের ধর্ম্ম ভাবের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ বলা যাইতে পারে। সভ্যজগতে এখনও ইহার যথোপযুক্ত মূল্য ও সম্মান হয় নাই। নানা আবর্জ্জনা ও কুসংস্কারের চাপে পড়ায় ভারতবর্ষেই ইহার যথেষ্ট সমাদর হইতেছে না। যদি কখনও সেই সকল আবর্জ্জনার মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া ইহাকে প্রকৃত বিশুদ্ধমূর্ত্তিতে জগতের সম্মুখে ধরা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ধর্ম্মজগতের অলঙ্কার স্বরূপ ইহা গৃহীত হইবে।

বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস অতি প্রাচীন ও সুবিস্তৃত। এখানে আমরা তাহার সম্পূর্ণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। কেবলমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। গৌড়-দেশ বৈষ্ণবধর্ম্মের জন্মস্থান নহে। কিন্তু বোধ হয় সেখানেই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ হইয়াছিল; এবং গৌড়ীয় সাধু শ্রীচৈতন্যদেবেই তাহার পূর্ণ পরিণতি হইয়াছিল। এই মহাপুরুষের ধর্ম্মভাব অপূর্ব্ব জিনিস।

দুঃখের বিষয় যে, এই সাধু-পুরুষের জীবন ও শিক্ষার প্রকৃত সমাদর হয় নাই। যাহা সমগ্র মানবের ধর্ম্মজীবনকে অলঙ্কৃত করিবার যোগ্য, তাহা কেবল ভারতের এক প্রান্তে আবদ্ধ রহিয়াছে। বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশেও বৈষ্ণবধর্ম্ম সাধারণের উপেক্ষা ও অবজ্ঞার বস্তু হইয়া রহিয়াছে; সেজন্য বোধ হয় শ্রীচৈতন্যদেবের অনুবর্ত্তীরাই দায়ী। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-কালে এবং তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরে কিছু দিন তাঁহার ধর্ম্ম দ্রুতবেগে পূর্ব্বভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে যে প্রেমভক্তির বন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা বহু দেশ ছাপাইয়া দক্ষিণে উৎকল, কলিঙ্গ, দ্রাবিড় ও উত্তরে মথুরা, বৃন্দাবন পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই আশ্চর্য্য ধর্ম্মান্দোলনের ইতিহাস এখনও যথাযথরূপে লিখিত হয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি, বিকাশ ও অধঃপতন ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু এবং ঐতিহাসিক উভয়েরই গভীর চিন্তা ও আলোচনার যোগ্য। আশা করি একদিন না একদিন ইহার যথোপযুক্ত আলোচনা হইবে।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ জগন্নিয়ন্তার প্রতি প্রেম। ভারতীয় ধর্ম্মভাব অতি প্রাচীন যুগে জ্ঞানপথে পরিচালিত হইয়াছিল। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ বিশ্বস্রষ্টার জ্ঞানান্বেষণে মগ্ন হইয়াছিলেন; তাঁহারা গভীর তপস্যা ও সাধনা দ্বারা অপূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া-ছিলেন ও তাহারই মহিমা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

উপনিষদ এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, এই বাহ্য জগতে এবং মানবাত্মায় যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বিদ্যমান রহিয়াছেন তাঁহাকে জানিয়া মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। বহুকাল ধরিয়া ভারতের চিন্তাশীল ও ধর্ম্মপিপাসু লোকেরা এই ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা করিয়াছিলেন। তৎপরে কর্ম্ম বা মানবসেবার মাহাত্ম্যও কীর্ত্তিত হইয়াছিল। মহাত্মা

বুদ্ধের ধর্ম্মকে প্রধানতঃ কর্ম্ম ও সেবার ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মের ধর্ম্মে ভারতের গভীরতম ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় নাই। আরো গভীরতর অন্বেষণে তাহা ভগবৎপ্রেম বা ভক্তিতে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমিকায় ব্যাসের মানসিক অবস্থার যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সাধারণভাবে ভারতের ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষার সম্বন্ধে সত্য। ব্যাসদেব বলিতেছেন যে বেদ-বেদান্ত মহাভারত প্রভৃতি রচনা করিয়াও তিনি অন্তরে শান্তি পান নাই—তখন নারদ তাঁহাকে ভক্তি-শাস্ত্র রচনা করিতে উপদেশ দিলেন। ভারতের ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষারও এই ইতিহাস। জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধনায় তৃপ্ত না হইয়া তাহা ভগবদ্ভক্তির পথে ধাবিত হইয়াছিল। ঈশ্বরকে কেবলমাত্র জানিয়া বা তাঁহার আদিষ্ট কার্য্য করিয়া ভারতীয় ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় নাই; ঈশ্বরকে জানার পর তাঁহার প্রেমের জন্য, নিঃস্বার্থ নিষ্কাম ভালবাসার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। এই আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা হইতে যে ধর্ম্মভাব উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাকেই আমরা বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিতেছি। এই ধর্ম্মে আরাধ্য দেবতা বিভিন্ন সময়ে বিষ্ণু, নারায়ণ, বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বৈদিক দেবতা বিষ্ণুই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম। সেইজন্য এই ধর্ম্মের নাম বৈষ্ণবধর্ম্ম হইয়াছে।

সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের অনতিপরে বা তাহার সঙ্গে-সঙ্গেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের, অন্ততঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মভাবের সূচনা হয়। ক্রমে বহু সাধু ও ভক্তের সাধনা ও ধর্ম্মভাবের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ইহা ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ও বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে ভক্তি-ধর্ম্মের প্রথম বা প্রাচীনতম গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ তাহার পূর্ব্বেই বৈষ্ণবধর্ম্মের জন্ম হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন, বৌদ্ধধর্ম্ম অভ্যুত্থানের পূর্ব্বেই বাসুদেবধর্ম্ম নামে একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বর্ত্তমান

ছিল। বাসুদেব-নামক দেবতার পূজা এই সম্প্রদায়ের মূল কথা। ক্রমে এই বাসুদেব ও কৃষ্ণ এক হইয়া যান। সম্ভবতঃ কৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র এই প্রবাদ বাসুদেব নাম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। ভগবৎ-গীতায় কৃষ্ণ ও বাসুদেব উভয় নামই পাওয়া যায়। যাহা হউক, অতি প্রাচীনকাল হইতে ভক্তিমূলক একটী ধর্ম্মধারা ভারতবর্ষে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল এবং বিবিধ স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহার অনেক সাধক হইয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে রামানুজ, রামানন্দ, মাধ্বা-চার্য্য, কবীর, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বহু সাধক ও ধর্ম্মাচার্য্যগণ এই ধর্ম্মভাব সাধন করিয়া তাহার বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি দিয়াছেন, এবং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত মত ও সাধন লইয়া বিবিধ মণ্ডলী বা আশ্রম প্রচলিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের যে শাখা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বে এখানে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচলন থাকিলেও তাঁহার দ্বারাই ইহার বিশেষ পরিপুষ্টি ও প্রসার হইয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উপাস্যদেবতা শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ-উপাসনা প্রাচীন; ঠিক কোন্ সময়ে কৃষ্ণ-উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলা দুষ্কর। আমরা দেখিয়াছি, ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ উপাস্য দেবতারূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণ-উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। বেদ বা উপনিষদে কৃষ্ণ নামে কোন দেবতার উল্লেখ নাই; কেবলমাত্র ছান্দোগ্যউপনিষদে কৃষ্ণ-নামে একজন ঋষির উল্লেখ আছে। সর্ব্ব প্রথমেই মহাভারতে দেবতা কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বোধ হয় আদিম মহাভারতে বা মহাভারতের প্রথমস্তরে কৃষ্ণ একজন অসাধারণ শক্তিশালী ক্ষত্রিয় যোদ্ধামাত্র ছিলেন, ক্রমে পরবর্ত্তীকালে তাঁহাকে দেবতা করা হইয়াছে। যাহা হউক বর্ত্তমান মহাভারতেই

শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রথম সূচিত হইয়াছিল, কিন্তু মহাভারত বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উপাস্য মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ নহে, বৃন্দাবনলীলার শ্রীকৃষ্ণ।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়, মহাযোদ্ধা এবং অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ। শ্রীমদ্ভগবদগীতার কৃষ্ণ মহাজ্ঞানী, সমন্বয়-ধর্ম্মের আচার্য্য। বৃন্দাবন-লীলার শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক, ব্রজ-বালকদের সঙ্গে গোচারণ করিতেন এবং গোপীগণের সঙ্গে লীলা করিতেন। মহাভারত বা ভগবদ্গীতায় ইহার কোন উল্লেখ নাই। বিষ্ণু-পুরাণ, হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা উত্তরোত্তর বিস্তৃত আকার ধারণ করিয়াছে। এই বৃন্দাবনলীলার শ্রীকৃষ্ণ কোথা হইতে আসিলেন ইহা ভারতীয় ধর্ম্ম-ইতিহাসের একটি অমীমাংসিত সমস্যা। কেহ কেহ বলেন, আভীর নামক এক যাযাবর জাতি এক সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়া অবস্থান করে। ক্রমে তাহারা ভারতবাসীর সঙ্গে মিলিত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের উপাস্যদেবতা গোপবালক ছিলেন। ক্রমে এই দেবতা ভারতীয় কৃষ্ণের সঙ্গে এক হইয়া যান। কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা এই আভীরজাতির নিকট হইতে গৃহীত। আমরা এখানে ইহার বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি না। ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকাল বৃন্দাবনের গোপগণের সঙ্গে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার জন্মের অব্যবহিত পরেই তাঁহার পিতা বসুদেব গোকুলে নন্দগৃহে তাঁহাকে রাখিয়া আসেন এবং সেখানে নন্দ ও যশোদার পুত্ররূপে তিনি বর্দ্ধিত হন। মহাভারতে এই বিবরণ পাওয়া যায় না। নন্দ-যশোদাসুত

বালক শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। বিষ্ণু-পুরাণ, হরিবংশ, ভাগবতপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইহার বিস্তৃত এবং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত বিবরণ আছে। অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণের বিবরণ অপেক্ষা ভাগবতের বিবরণ অধিক বিস্তৃত এবং ভাগবতের বিবরণ অপেক্ষা ব্রহ্মবৈবর্ত্তের আরও অধিক বিস্তৃত। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বোধ হয় কথাটী আরও পরিষ্কার হইবে। বিষ্ণু-পুরাণে গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের রাসলীলার বর্ণনা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত; ভাগবতে এই বিবরণ অনেক বিস্তৃত আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু এখানেও রাধিকার নামের উল্লেখ নাই। কেবলমাত্র লিখিত আছে যে, গোপিনীগণের মধ্যে একজন, কৃষ্ণের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এই গোপিনীর নাম ও তাঁহার বিশেষ পরিচয়াদি বর্ণিত আছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ বৈষ্ণবদিগের সর্ব্বপ্রধান শাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণই ইহার বহু সমাদর করিয়া থাকেন। বাস্তবিকই ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ; ইহাতে ভক্তিতত্ত্ব অতি গভীরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভক্তির মাহাত্ম্য, ভগবানের করুণা, তাঁহার নামকীর্ত্তনের ফল বহু দৃষ্টান্তের দ্বারা এই গ্রন্থে বিবৃত করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাও ইহাতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ইহাতে রাধার নাম নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে রাধার স্থান অতি উচ্চ; তাঁহারা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের লীলা গ্রহণ করিয়া তাহাকে তাঁহাদের ধর্ম্মমত ও সাধনের প্রধান বস্তু করিয়াছেন। রাধিকা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে কৃষ্ণের সমান, এমন কি স্থানে স্থানে তাঁহার অপেক্ষা উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক ও কবিগণ পুরাণ-বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের লীলায় স্বীয় সাধনা ও কল্পনার সাহায্যে অনেক নূতন বিষয়

সংযোগ করিয়াছেন। তাঁহাদের হস্তে রাধাকৃষ্ণলীলা একদিকে যেমন মধুর ও সরস হইয়াছে, অপর দিকে তাহা অশ্লীলতার দোষেও দূষিত হইয়াছে। ভক্তগণ রাধাকৃষ্ণলীলার মধ্যে একটি গভীর তত্ত্ব দেখেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যানুসারে সমুদয় রাধাকৃষ্ণলীলা একটি বিস্তৃত রূপক। কৃষ্ণ পরমাত্মা এবং রাধা জীবাত্মা। রাধাকৃষ্ণের আখ্যায়িকার ছলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে গভীর প্রেমের যোগ তাহা রূপকের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার ব্যাকুলতা, তাঁহার বিরহে বেদনা, মিলনে আনন্দ প্রভৃতি রাধিকার কৃষ্ণের জন্য অনুরাগ, বিরহের বেদনা, ও মিলনের আনন্দের দ্বারা বিবৃত করা হইয়াছে। সাধকের নিকট এই তত্ত্ব সত্য হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোক ইহা না বুঝিয়া রূপককে বাস্তব ঘটনা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, বঙ্গদেশে বংশপরম্পরা ধরিয়া এই রাধাকৃষ্ণলীলা বহুল প্রচার হইয়াছে। সাধকগণ ইহা দ্বারা আপনাদের ধর্ম্মসাধনের পরিপুষ্টি কবিতেন; কবিগণ ইহাকে কাব্যের প্রধান বিষয় করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং তরলপ্রকৃতি গ্রাম্য যুবকগণ রাধাকৃষ্ণ-লীলার বর্ণনার ছলে নিজেদের নীচ রুচির চরিতার্থতার জন্য অশ্লীল সঙ্গীত রচনা করিয়া পথে পথে গাহিয়া বেড়াইত। কাব্য ও বিকৃত রুচির চরিতার্থতার জন্য ব্যবহৃত হইলেও মূলতঃ রাধাকৃষ্ণলীলা ধর্ম্মভাব হইতে প্রসূত এবং ইহার প্রধান উদ্দেশ্য যে ধর্ম্মভাবের পরিপুষ্টি তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্রমে গৌড়ীয় সাধক এবং বৈষ্ণবগণ সংস্কৃত ছাড়িয়া প্রচলিত লৌকিক ভাষায় রাধাকৃষ্ণলীলার বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের পরে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব গোস্বামী নামে একজন গৌড়ীয় কবি সংস্কৃত ভাষায় রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়া গীতগোবিন্দ নামে একখানি গীতিকাব্য রচনা করিয়াছিলেন;

ইহার ভাষা সংস্কৃত হইলেও তাহা প্রায় আধুনিক বাঙ্গলারই মত। বহু অশ্লীলতা-দোষে দূষিত হইলেও ইহার ভাব ও ভাষা অতি সুললিত। জয়দেবের কিছুকাল পরেই আরও দুইজন প্রতিভাশালী কবি সংস্কৃত একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া প্রচলিত গ্রাম্য ভাষায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে বহু সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বিদ্যাপতি, মিথিলা দেশবাসী। বর্ত্তমান বেহার দেশের অন্তর্গত মজঃফরপুর জেলা ইঁহার নিবাসস্থান ছিল। সে সময়ে মিথিলা গৌড়েরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রচলিত বঙ্গভাষার সঙ্গে তাঁহার ভাষার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ছিল। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি বোধ হয় বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। মিথিলা অপেক্ষা বঙ্গদেশেই সেগুলির অধিক প্রচলন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান সময়ে মিথিলা অঞ্চলে সেগুলির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশেই সেগুলি বহু সমাদরে রক্ষিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির অল্পদিন পরেই সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে আর একজন কবি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নাম চণ্ডীদাস। তিনিও রাধা-কৃষ্ণলীলা-বিষয়ে বহু সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতগুলি অপেক্ষাকৃত সুমার্জ্জিত এবং গভীর ধর্ম্মভাব-ব্যঞ্জক; বহু পরিমাণে মানবীয় ভাব এবং রক্তমাংসের গন্ধে দূষিত হইলেও জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনা ধর্ম্মভাবমূলক, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না। তাঁহারা কেবল কবি ছিলেন না, সাধকও ছিলেন; রাধাকৃষ্ণের রূপকের ছলে ভগবানের জন্য ভক্তের ব্যাকুলতা, বেদনা প্রভৃতি বর্ণনা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধকগণ আপনাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষা রাধাকৃষ্ণের রূপকের দ্বারাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের একটি বিশেষত্ব। তাঁহারা

আপনাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা নিজমুখে ব্যক্ত না করিয়া রাধার মুখেই ব্যক্ত করিতেন। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ব্যতীত আরও অনেক সাধক ও কবি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীতাদি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু জয়দেব চণ্ডীদাসের রচনাগুলি কাব্যাংশে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যে সময়ে ইঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বহুপূর্ব্ব হইতে পরবর্ত্তীকাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে রাধাকৃষ্ণ-উপাসক বৈষ্ণব সম্প্রদায় বহু বিস্তৃত ছিল। বঙ্গদেশের নানা স্থানে বৈষ্ণবগণ পুরাণোক্ত ভক্তিধর্ম্ম অল্পাধিক পরিমাণে সাধন করিত। কিন্তু সে সময়ে বঙ্গদেশে তান্ত্রিক ধর্ম্মই প্রবল ছিল; প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের ধারা অতি ক্ষীণভাবেই চলিতেছিল, এমন সময়ে বঙ্গদেশে এক অসাধারণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিলেন, যিনি প্রচলিত বৈষ্ণবধর্ম্মকে নিজ জীবনের সাধনা ও ভক্তি দ্বারা বহু উন্নত এবং শক্তিশালী করিয়াছিলেন। ইনি নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁহার জীবনে বৈষ্ণবধর্ম্মের পূর্ণ পরিণতি হইয়াছিল; শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্ম্ম কেবল গৌড়ের গৌরব নহে, বিশ্বমানবের ধর্ম্ম ভাবের অত্যুচ্চ অভিব্যক্তি ও সাধকগণের অমূল্য সম্পদ।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে এবং তাঁহার তিরোধানের পরে কিছুদিন প্রবল উদ্যমে এই ভক্তিধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, অল্পকালেই সেই বেগ মন্দীভূত হইয়া গিয়াছিল এবং ক্রমে বদ্ধ নদীর ন্যায় সেই ভক্তিধারা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। আমরা যথাসাধ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্ম

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রীচৈতন্যদেবের নামে প্রসিদ্ধ হইলেও তিনি তাহার প্রবর্ত্তক ছিলেন না। তাঁহাব বহুপূর্ব্বে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচলন ছিল; এমন কি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের যাহা বিশেষত্ব তাহা শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে প্রচলিত হইয়াছিল। জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতি সাধক কবিগণ ভিন্ন নানা স্থানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনেক সাধক হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গের আধ্যাত্মিক অবস্থার চিত্র যেরূপ মলিন বলিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা কিছু অতিরঞ্জিত। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে বহু উন্নত পূতচরিত্র বৈষ্ণব সাধুর পরিচয় পাওয়া যায়। মাধবেন্দ্রপুরী নামক একজন মহাভক্ত বঙ্গদেশে যাতায়াত করিতেন। তাঁহার আশ্চর্য্য ভক্তির বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়।

ইঁহারই শিষ্য ঈশ্বর পুরীর নিকট শ্রীচৈতন্যদেব গয়ায় বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে মাধবেন্দ্রপুরীর আরও অনেক শিষ্য ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যও এই মাধবেন্দ্রপুরীর নিকটে বৈষ্ণবধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের বহু পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্য নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। ইনি একজন অসাধারণ লোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী কালে শ্রীচৈতন্যদেবের মণ্ডলীতে ইনি যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন ক্রমে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। 'সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবের জন্মের ৫২ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউর পরগণার নবগ্রামে ইঁহার

জন্ম হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় না হইলেও ইহা উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীচৈতন্য ও অদ্বৈতাচার্য্য উভয়েই শ্রীহট্ট অঞ্চলের লোক; এবং ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা গঙ্গাতীরে বাসের জন্য নবদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের পিতা কুবের পণ্ডিত শ্রীহট্ট অঞ্চলে লাউরাধিপতির প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সম্ভবতঃ ইঁহারা বংশানুক্রমে স্থানীয় ক্ষুদ্র রাজার রাজমন্ত্রীর কার্য্য করিতেন। কুবের পণ্ডিতের প্রপিতামহ নৃসিংহ মিশ্র স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে অতি হীন অবস্থা হইতে ধন, মান ও পদগৌরব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তদানীন্তন দিনাজপুরের রাজা তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। রাজকার্য্যে তাঁহাকে সর্ব্বদা গৌড়ে যাতায়াত করিতে হইত। সেই সময়ে তিনি শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে একটী আবাস বাটী নিশ্মাণ করেন। কুবের পণ্ডিত বহুদিন সম্মানসহকারে লাউরাধিপতির প্রধান মন্ত্রীর কাজ করেন। পরিণত বয়সে বহু সন্তানের অকাল মৃত্যুতে সংসারে বীতরাগ হইয়া তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের গঙ্গাতীরস্থ শান্তিপুর ভবনে আসিয়া বাস করেন। অদ্বৈতাচার্য্যের জন্ম শ্রীহট্টস্থ নবগ্রামের বাটীতেই হইয়াছিল। বোধ হয় কিছুকাল শান্তিপুরে বাসের পরে কুবের পণ্ডিত রাজা দিব্যসিংহের বিশেষ অনুরোধে নবগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টে জন্ম হইলেও অদ্বৈতাচার্য্য বাক্যকাল হইতে শান্তিপুরে বাস করিতেন। বৈষ্ণবজীবনচরিতকারগণ লিখিয়াছেন যে, রাজা দিব্যসিংহের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে মতবিরোধে বিরক্ত হইয়া অদ্বৈতাচার্য্য পিতামাতার সহিত নবগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আগমন করেন। রাজা দিব্যসিংহ শক্তিউপাসক ছিলেন। বালক অদ্বৈত কৃষ্ণভক্ত; রাজবাড়ীর কালীমূর্ত্তিকে প্রণাম করেন নাই, এই জন্য রাজার সঙ্গে বিরোধ হয়। বৈষ্ণবজীবনচরিতরচয়িতাগণ এসম্বন্ধে

অনেক অলৌকিক ব্যাপারের বর্ণনা করিয়াছেন। সে সমুদয় স্পষ্টই পরবর্ত্তী কালের কল্পনা। সম্ভবতঃ কুবের পণ্ডিত অদ্বৈতের বাল্যকালেই বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাতীরে বাসের জন্য পুনরায় শান্তিপুরে গমন করেন। তখন অদ্বৈতের বয়স একাদশ বৎসর বলিয়া লিখিত হইয়াছে। যে কারণেই হউক, বাল্যকাল হইতেই অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুর ও নবদ্বীপে বাস করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের বহু পূর্ব্বেই তিনি নবদ্বীপের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও পরম বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য,
অদ্বৈত আচার্য্যনাম সর্ব্বলোকে ধন্য।
জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর,
কৃষ্ণ ভক্তি বাখানিতে যে হেন শঙ্কর।
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্র পরচার,
সর্ব্বত্র বাখানে কৃষ্ণপদ ভক্তি সার।
তুলসী মঞ্জুরী সহিত গঙ্গাজলে,
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা কুতূহলে।

চৈঃ ভাঃ আদিখণ্ড, ২য় ভাগ।

এই বিবরণে সম্ভবতঃ কিয়ৎপরিমাণে পরবর্ত্তী কালের ছায়া পড়িয়া থাকিবে। তাহা হইলেও অদ্বৈতাচার্য্য প্রথম বয়স হইতেই যে একজন সাত্ত্বিক বৈষ্ণব ছিলেন তাহাতে সংশয় নাই। শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে তিনি নবদ্বীপ নিবাসী বৈষ্ণবগণের নিঃসংশয়িত নেতা ছিলেন। অপর দিকে তিনি গভীর জ্ঞানীও ছিলেন। মনে হয়, বহুদিন পর্য্যন্ত জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের মধ্যে তিনি দোলায়মান ছিলেন। পরে আমরা তাহার বিশেষ পরিচয় পাইব। তাঁহার শিক্ষার ও সাধনের ঐতিহাসিক বিবরণ

পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব লেখকগণ যে জীবনচরিত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বহু পরিমাণে কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। কথিত আছে, তিনি শান্তিপুর আগমনের পূর্ব্বেই ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতিতে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তৎপরে শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুল্লবাড়ী গ্রামের শান্তাচার্য্য নামক একজন অধ্যাপকের নিকট বেদ ও ভাগবত অধ্যয়ন করেন। তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতা উননব্বই বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন এবং জননী লাভা দেবী পতির চিতায় সহমৃতা হন। পিতামাতার মৃত্যুর পর অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাদিগের পিণ্ড প্রদানের জন্য গয়া গমন করেন এবং তথা হইতে পুরী, রামেশ্বর, দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি বহুতীর্থ ভ্রমণ করেন। তীর্থ ভ্রমণকালে মাধ্বসম্প্রদায়ের বিখ্যাত আচার্য্য মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বৃন্দাবনে মদনগোপালবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এইরূপ লিখিত আছে। কিন্তু এই সকল বিবরণ কত-দূর ঐতিহাসিক, তাহা বলা যায় না। ঘটনাসমূহের অনেক দিন পর ভক্ত বৈষ্ণবগণ এই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহা-দের রচনায় কল্পনা এবং পরবর্ত্তী কালের ছায়া বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। তিনি কত দিন তীর্থ ভ্রমণে অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যে সকল স্থান ভ্রমণ এবং যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে তাহা সত্য হইলে বহু বৎসর বিদেশে অতিবাহিত হইয়া থাকিবে। বৃন্দাবনে মদনগোপালের প্রতিষ্ঠানন্তর তাঁহার আদেশে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। অতঃপর তিনি শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া ভাগবত অধ্যাপনা করিতে থাকেন। বহু ছাত্র এবং ভক্ত তাঁহার নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিছুদিন পর শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরী শান্তিপুরে আগমন করিয়া তাঁহার গৃহে দুই

মাস কাল অবস্থান করেন। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার সঙ্গে গভীর ভাবে ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করেন এবং তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে তিনি পুনরায় পুরী গমন করিয়াছিলেন। সেখানে মুকুন্দদেব, পুরুষোত্তম, কামদেব প্রভৃতি অনেকে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ভক্তিভাবে আকৃষ্ট হন। তন্মধ্যে পুরুষোত্তম ও কামদেব তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে শান্তিপুরে আগমন করেন। ইতিপূর্ব্বে বৃন্দাবনে অবস্থানকালে কৃষ্ণদাস নামে একটি ব্রাহ্মণ-তনয় অদ্বৈতাচার্য্যের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকটে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহার সঙ্গে শান্তিপুর আগমন করেন। শান্তিপুরে তাঁহার নিকট থাকিয়া দশ বৎসর ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের পরে অদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণদাসকে ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষা দেন। উত্তরকালে এই কৃষ্ণদাস অদ্বৈতাচার্য্যের অনুগত, বিশ্বস্ত সেবক হইয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার সেবায় তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণদাসের পরিবর্ত্তে হরিদাস নাম প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু এ কথার সার্থকতা বুঝিতে পারা যায় না। বৈষ্ণবদের নিকট হরিদাস অপেক্ষা কৃষ্ণদাসের নামই অধিক প্রিয় হইবার কথা। এই সময়ে শ্যামদাস নামক দক্ষিণদ্রাবিড়-দেশীয় এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শান্তিপুরে আগমন করেন এবং অদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গে বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার নিকটে ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ ও ভাগবত অধ্যয়ন করেন। তর্কচূড়ামণি উপাধিখ্যাত যদুনন্দন আচার্য্য নামক অপর একজন ব্রাহ্মণেরও এইসময়ে তাঁহার নিকটে দীক্ষা-গ্রহণের উল্লেখ আছে। শ্যামদাস আচায্য নামক অপর একজন রাঢ়দেশীয় বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত স্বপ্নে আদেশ পাইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের নিকটে আসিয়া দীক্ষাগ্রহণ ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এইসময়ে লাউরাধিপতি দিব্যসিংহ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের

নিকটে বাস ও তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে কৃষ্ণদাস নাম প্রদান করেন। এই সকল ঘটনা সম্পূর্ণ প্রামাণিক কি না সন্দেহ। তবে ইহা নিশ্চিত যে, ক্রমে ক্রমে বহু জ্ঞানী, বিদ্বান এবং সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ এবং ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীতে সুপ্রসিদ্ধ যবন কুলোদ্ভব হরিদাসও এই সময়ে অদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গে মিলিত হন। (অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে বহু সমাদরে গ্রহণ করেন এবং গঙ্গাতীরে বাসের জন্য একটী কুটির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।) এই হরিদাসের জীবনী অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক, সম্ভবতঃ যশোহরের অন্তর্গত বূঢ়ণ গ্রামে কোনও মুসলমান বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালের কোনও কোনও বৈষ্ণব লেখক হিন্দু পিতামাতা হইতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, কিন্তু শৈশবে কোনও কারণে মুসলমান গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, এরূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহা স্পষ্টই কল্পনা। উত্তরকালীন সংরক্ষণশীল হিন্দু লেখকগণ মুসলমানের বৈষ্ণবত্ব স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইয়া এই কাল্পনিক বিবরণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহার কোনও উল্লেখ নাই। পরন্তু হরিদাসের সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত আছে, তাহাতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে, তিনি মুসলমান-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধ হয় প্রথম জীবনেই কোনও বৈষ্ণব সাধুর সংস্পর্শে আসিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ জন্মে এবং তজ্জন্য পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হন। তৎপর তিনি এক নির্জ্জন প্রান্তরে বেনাবনের মধ্যে একটী গোফা নির্ম্মাণ করিয়া একান্তে ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হন। নিত্য তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন; নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকেরা তাঁহার অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব

দেখিয়া গভীর শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু স্থানীয় দুর্দ্দান্ত জমিদার রামচন্দ্র খান্ তাঁহার বিরোধী হইলেন। হরিদাসের প্রতিপত্তি তাঁহার সহ্য হইল না। সে দুর্বৃত্ত, তাঁহার সাধন ভঙ্গ করিবার জন্য একজন সুন্দরী যুবতী বারাঙ্গনাকে নিযুক্ত করিলেন। রামচন্দ্রখানের পরামর্শে সে এক-দিন সন্ধ্যাকালে হরিদাসের গোফায় গিয়া উপস্থিত হইল এবং বিবিধ হাব-ভাবে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিল। সাধু হরিদাস বলিলেন, আমি প্রতি দিন তিন লক্ষ হরিনাম জপের ব্রত গ্রহণ করিয়াছি; আজ এখনও তিন লক্ষ নাম পূর্ণ হয় নাই, তুমি অপেক্ষা কর, নাম জপ শেষ হইলে তোমার সঙ্গে কথা বলিব। এই বলিয়া তিনি চক্ষু নিমীলিত করিয়া সাধনে মগ্ন হইলেন। এইভাবে সমুদায় রজনী কাটিয়া গেল; প্রভাতে বারাঙ্গনা ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল। কথিত আছে, উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি সে এইরূপ সাধু হরিদাসকে প্রলোভিত করিয়া তাঁহার মনে কোনও ভাবান্তর ঘটাইতে পারিল না। পক্ষান্তরে তৃতীয় রাত্রি অবসানে তাহার নিজের মনেই দারুণ নির্ব্বেদ ও অনুতাপ জাগিয়া উঠিল। নির্জ্জন প্রান্তরে রজনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সাধু হরিদাসের অসাধারণ ভক্তিভাব দেখিয়া তাহার পাপাবোধ জাগিয়া উঠিল এবং নিজ জীবনের মলিনতা স্মরণ করিয়া হরিদাসের শরণাপন্ন হইল। হরিদাস তাহার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং পাপপথ পরিত্যাগ করতঃ ধর্ম্ম সাধনের উপদেশ দিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কথিত আছে যে, সে নারী আপনার সর্ব্বস্ব দরিদ্র ও ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া হরিদাসের গোফায় বসিয়া তাঁহার উপদেশ অনুসারে ধর্ম্ম সাধন করিয়া পরম ধার্ম্মিকা বলিয়া পরিগণিত হইল। ক্রমে হরিদাসের বৈষ্ণ-ধর্ম্মগ্রহণের কথা দেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তার কর্ণগোচর হইল। তিনি কাজিদের প্ররোচনায় তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরিত্যাগ

করিয়া পুনরায় কলমা পড়িয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। তিনি আপনার ধর্ম্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন না :—

খণ্ড খণ্ড এই দেহ, যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥

হরিদাসের দৃঢ়তা দেখিয়া মুসলমান শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে বাইশ বাজারে প্রহার করিয়া প্রাণবধের আজ্ঞা দিলেন। হরিদাস তাহাতে বিচলিত হইলেন না। প্রহরীরা তাঁহাকে বাজারে বাজারে লইয়া গিয়া জনসাধারণের সম্মুখে নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল। তাহাদের নিদারুণ প্রহারে ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, তিনি প্রার্থনা করিলেন যে, "হে ভগবান, তুমি ইহাদের অপরাধ লইওনা"।

"এইসব জীবের প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহে এ সভার অপরাধ॥"

চৈঃ, ভাঃ, আদিখণ্ড, ১১ অধ্যায়।

এই উক্তি খৃষ্টধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যীশুর Father forgive them, for they know not what they do (পিতা, ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা জানেনা যে কি করিতেছি) এই উক্তির সমতুল্য। অবশেষে মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া প্রহরীরা তাঁহাকে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিল। তাঁহার মৃতকল্প দেহ গঙ্গাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিল; শীতল জল-স্পর্শে তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিল; ক্রমে সবলতা লাভ করিয়া তিনি তাঁহার বাসস্থান ফুলিয়া গ্রামে গমন করিলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকারেরা লিখিয়াছেন যে, তিনি যোগ বলে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন; পরে প্রহরীরা পরিত্যাগ করিয়া গেলে যোগ হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল; মুসলমানেরাও আর তাঁহার প্রতি নির্য্যাতন করিল না। হরিদাস ক্রমে

শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তিনিও তাঁহার গভীর ধর্ম্মানুরাগ ও অসাধারণ ভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। হরিদাসের বিবরণে সুস্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। নবদ্বীপে নাতিদুর্ব্বল একটি বৈষ্ণবমণ্ডলী ছিল। অদ্বৈতাচার্য্যের নবদ্বীপ গমনের পূর্ব্বে শ্রীবাস পণ্ডিত ইঁহাদিগের নেতা ছিলেন এবং তাঁহার বাটীতেই বৈষ্ণবগণ সাধারণতঃ মিলিত হইতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সময় পর্য্যন্ত শ্রীবাসের বাটী বৈষ্ণগণের মিলনের স্থান ছিল। সম্ভবতঃ ইঁহার বাটী বেশ প্রশস্ত ছিল সেই জন্যই তাঁহার বাটীতে বৈষ্ণবগণের মিলনের সুবিধা হইত। শ্রীবাস ধনী না হইলেও অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থার লোক ছিলেন। নবদ্বীপের লোকেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব হৃদয় পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে অর্থাৎ যখন দাম্ভিক অধ্যাপকরূপে পরিচিত ছিলেন তখনও পথে শ্রীবাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিতেন।

শ্রীবাস পণ্ডিতেরা চার সহোদর ছিলেন; অপর তিন ভাইয়ের নাম শ্রীকান্ত, শ্রীপতি ও রাম। শ্রীবাস সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইঁহারা সকলেই পরম বৈষ্ণব। নিত্য ভক্তিযোগে কৃষ্ণকীর্ত্তন ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন। এতদ্ভিন্ন চন্দ্রশেখর আচার্য্য, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বহু বৈষ্ণবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যের প্রকটের পূর্ব্বেই তাঁহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সহাধ্যায়ী মুরারি গুপ্ত এবং গদাধর পণ্ডিত যাঁহারা পরিণামে শ্রীচৈতন্যদেবের গভীর অনুরাগী ভক্ত হইয়াছিলেন, প্রথমজীবন হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্মের সাধক ছিলেন। নবদ্বীপের বাহিরে বঙ্গদেশ ও আসামের নানাস্থানে ভক্ত বৈষ্ণবগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; বিশেষ ভাবে

শ্রীহট্ট অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম্মের বহু প্রচার হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতির পূর্ব্বনিবাস শ্রীহট্ট। আমরা দেখিয়াছি,—অদ্বৈতাচার্য্য বাল্যকাল হইতে কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তাহা হইলে সে সময়ে শ্রীহট্ট অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব থাকার সম্ভাবনা। চট্টগ্রামে ও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার ছিল বলিয়া মনে হয়। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণের মধ্যে অনেকের জন্মস্থান চট্টগ্রাম। মুকুন্দদত্ত চট্টগ্রামবাসী লোক। পরমভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রামবাসী এবং শ্রীচৈতন্যের প্রকটের পূর্ব্বেই ভক্তিধর্ম্মের সাধক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভের প্রথম অবস্থায় তিনি নবদ্বীপে আগমন করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব্বেই তাঁহার আশ্চর্য্য ভক্তিভাবের উল্লেখ আছে; পরে তাহার বিশেষ পরিচয় পাইব। এই সকল বিবরণে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে চৈতন্যদেবের পূর্ব্বেই বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের বহুল প্রচার হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষত্ব

যদিও শ্রীচৈতন্যদেবের বহুপূর্ব্বে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত ছিল এবং তাঁহার পূর্ব্বেও সমকালে অনেক বৈষ্ণব সাধু ও সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান পুরুষরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে যে গভীর ভক্তির বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল চৈতন্যদেবকে তাহার প্রথম প্রবর্ত্তক বলা যায় না। আমরা দেখিয়াছি, শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্যপ্রমুখ বহু বৈষ্ণব সাধক বঙ্গদেশের নানা স্থানে ভক্তি ধর্ম্মের সাধন ও প্রচার করিতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ কেহ কেহ আধ্যাত্মিক জীবনে অনন্যসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব সাধকগণ যে কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অলঙ্কাররূপে গণ্য হইবার যোগ্য এবং ষোড়শ শতাব্দীর ভক্তি-আন্দোলনে তাঁহাদের কার্য্য ও প্রভাব নিতান্ত অল্প ছিলনা। তথাপি বয়সে প্রাচীন এবং কালে প্রথম হইলেও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মান্দোলন অদ্বৈতাচার্য্যের নামে প্রসিদ্ধ না হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের নামেই পরিচিত। আপাত-দৃষ্টিতে ইহা অন্যায় এবং অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইতে পারে। বোধ হয় সমসাময়িক বৈষ্ণবগণের মধ্যে এ বিষয় লইয়া কিঞ্চিৎ মনো-মালিন্যও ঘটিয়াছিল। তৎকালীন বৈষ্ণব ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্যের স্থান লইয়া অনুবর্ত্তীগণের মধ্যে বাদানুবাদের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। কেহ কেহ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে বৈষ্ণবমণ্ডলীর নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আবার কেহ নিত্যানন্দকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধানপুরুষ বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অপর দিকে ইঁহাদিগকে সাধারণের চক্ষুতে হীন করিবারও চেষ্টা হইয়াছিল। যথা:—

"এই অবতারে কেহো গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পলায়॥
পূজয়ে গোবিন্দ যেন না মানে শঙ্কর।
এই পাপে অনেকে যাইব যমঘর॥"

চৈঃ, ভাঃ, আদিখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

সে সময়ে বোধ হয় ইহা লইয়া বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যথেষ্ট বাদানুবাদ ও মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। অবশেষে উভয়পক্ষে একটা সন্ধি হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, জনসাধারণের সরল এবং স্বাভাবিক বিচার অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও অজ্ঞাতসারে নিরপেক্ষ সত্য আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যেমন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-বিধানে বাপ্তিষ্ট জন পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সেণ্ট্ পল অসাধারণ প্রচারক হইলেও ঈশা প্রবর্ত্তক গণ্য হইয়াছেন, সেইরূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে অদ্বৈতাচার্য্য পূর্ব্বগামী এবং নিত্যানন্দ তেজস্বী প্রচারক হইলেও চৈতন্যদেবই প্রবর্ত্তকরূপে সম্মানিত হইয়াছেন। জনসাধারণের এই সহজ বিচার ইতিহাস অনুমোদন করিয়াছে। কিন্তু বয়সে সর্ব্বকনিষ্ঠ এবং প্রথম জীবনে শিষ্যস্থানীয় হইয়া কিরূপে শ্রীচৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতির উপরে স্থান লাভ করিলেন তাহা আলোচনার যোগ্য। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান তত্ত্ব "ভক্তিবাদ" শ্রীচৈতন্যদেব প্রথম প্রচার করেন নাই। তবে বৈষ্ণবধর্ম্মে তিনি কি নূতন জিনিষ আনিলেন যাহার জন্য অল্প দিনের মধ্যে অদ্বৈত প্রমুখ প্রাচীন ও প্রবীণ ভক্তদের উপরে

তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল? শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম্মে এমন কি নূতন জিনিষ আনিলেন যাহার বলে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধানপুরুষ বলিয়া গণ্য হইলেন? আমরা সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতাখ্যায়কদিগের মধ্যে দুইজন প্রধান ও মৌলিক,—চৈতন্যভাগবতপ্রণেতা বৃন্দাবন দাস, ও চৈতন্য চরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ। ইঁহাদের মধ্যে বৃন্দাবন দাস প্রথম; কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া নিজগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে নূতন তথ্য অধিক নাই; কিন্তু তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। খৃষ্টধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ঈশার জীবনচরিত লেখকদিগের মধ্যে সেণ্ট্ জনের যে স্থান ও কার্য্য, চৈতন্যচরিতামৃতলেখকেরও তদনুরূপ স্থান ও কার্য্য। তিনি একটী মত ও উদ্দেশ্য লইয়া চৈতন্যদেবের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জন যেমন প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে ঈশ্বর আদিম অনাদি স্বর্গীয় বাণী (Divine Logos) মানবের পরিত্রাণের জন্য মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন [In the beginning was the Word, and the Word was with God and the Word was God···And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld his glory, as of the only begotten of the father full of grace and truth] St. John. Chap. I vs. 1 and 14, সেইরূপ কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য রাধাপ্রেমের অবতার। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে অবতারাবাদ হিন্দু চিন্তায় ওতঃপ্রোতঃ হইয়া গিয়াছিল। চৈতন্যদেবের জীবন চরিত লেখকগণ সকলেই তাঁহাকে

বিষ্ণুর বা শ্রীকৃষ্ণের অবতার মনে করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের অবতার-বাদ পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারবাদ হইতে অনেক পরিমাণে বিভিন্ন। পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারবাদীগণ অসুর বিনাশ বা ভূভার হরণের জন্য বিষ্ণুর অবতার কল্পনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতাখ্যায়কগণ সে শ্রেণীর অবতারবাদী নহেন। তাঁহাদের মতে শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমের অবতার। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্বের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ কৌতুহল জনক। তাঁহার মতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি রাধিকার প্রেমে মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য রাধিকার যে প্রেম অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্য মানবাত্মার যে ব্যাকুলতা তাহা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ। ঈশ্বরেরও তাহা আস্বাদনের জন্য লালসা হয়। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ এই কথা রূপক-আকারে বহু বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকার যে গভীর প্রেম তাহা আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার ভাব এবং রূপ অঙ্গীকার করিয়া কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

"আমা হইতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সেই সুখ মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার,—
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে॥"

চৈঃ চরিতামৃত আঃ লীঃ ৪র্থ অধ্যায়।

অন্যত্র :—

"ব্রজ বধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি ॥
প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ ॥
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥"

চৈঃ চরিতামৃত আঃ লীঃ ৪৫

কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই কথার মধ্যে একটী গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এখানে তাহার বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি না। আপাততঃ এইমাত্র বলিতে চাই যে, তিনি একটী বিশেষ উদ্দেশ্য বা ভাব (Idea) লইয়া চৈতন্যদেবের জীবনী লিখিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে সেরূপ কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে লোকমুখে যে সব কথা শুনিয়াছিলেন সরলভাবে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঈসা চরিতাখ্যায়কদিগের মধ্যে সেণ্ট্ মার্কের সঙ্গে তাঁহার তুলনা হয়। বৃন্দাবন দাসও শ্রীচৈতন্যকে বিষ্ণুর অবতার জ্ঞান করিতেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারের যে হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা হইতে এই মহাপুরুষের প্রধান কার্য্য, অন্ততঃ তাঁহার সমসাময়িক এবং অব্যবহিত পরবর্ত্তী বংশের দৃষ্টিতে যাহা প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহা জানা যায়। তিনি লিখিতেছেন :—

"কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাঁহার ॥

তথাপি শ্রীভাগবতে গীতায় যে কহে।
তাহি লিখি, যে নিমিত্তে অবতার হয়ে ॥"

এই ভূমিকার পরে শ্রীমদ্ভগবতগীতা হইতে অবতার প্রয়োজন সম্বন্ধীয় সুবিখ্যাত শ্লোক দুইটী উদ্ধার করতঃ লিখিতেছেন :—

"ধর্ম্মপরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্ম্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে ॥
সাধুজন-রক্ষা দুষ্ট বিনাশকারণে।
ব্রহ্মা আদি প্রভুর পায় করেন বিজ্ঞাপনে ॥
তবে প্রভু যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে ॥
কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরি সংকীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥
এই কহে ভাগবত সর্ব্বতত্ত্বসার।
কীর্ত্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার ॥"

চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

এখানে দেখা যাইতেছে, যে চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাস মনে করিতেন যে সংকীর্ত্তন প্রচারের জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার হইয়াছিল। চৈতন্যভাগবতের আরম্ভে যে সংস্কৃত শ্লোকে ভূমিকা করা হইয়াছে তাহাতে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে "সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ" বলা হইয়াছে। শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস পুনরপি বলিয়াছেন :—

"কলিযুগে সর্ব্ব ধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তন।
সব প্রকাশিলেন শ্রীচৈতন্যনারায়ণ ॥
কলিযুগে সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হইল প্রভু সর্ব্বপরিকরে ॥"

চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

সুতরাং সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বৃন্দাবন দাসের মতে সংকীর্ত্তন প্রচার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান কার্য্য। অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্য এবং বৈষ্ণব সাধারণেরও এই মত। 'হাট পত্তন' নামক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিত আছে :—

ধন্য ধন্য কলিযুগ সর্ব্বযুগ সার।
নাম সংকীর্ত্তন যাহে করিলেন প্রচার॥

চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক নামক গ্রন্থে সংকীর্ত্তন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ইহা ভগবান চৈতন্যের সৃষ্টি :—

"ইয়মিয়ং ভগবচ্চৈতন্যসৃষ্টি।"

সংকীর্ত্তন প্রচলন যে শ্রীচৈতন্যদেবের একটী প্রধান কীর্ত্তি তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান মিলন কীর্ত্তি; এই সংকীর্ত্তনের প্রভাবেই তাঁহারা বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও আসাম সংকীর্ত্তনের রবে নাচিয়া উঠে। বাস্তবিক মানবহৃদয়কে মাতাইতে সংকীর্ত্তনের মত সহজ ও সুন্দর উপায় আর কিছু নাই। জগতের প্রায় সকল ধর্ম্মমণ্ডলীতে সঙ্গীতের কার্য্যকারিতা স্বীকৃত হইয়াছে এবং কোনও না কোন প্রকার সঙ্গীতের প্রচলনও আছে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে খোল করতাল সহকারে যে সংকীর্ত্তনের প্রচলন হইয়াছে বোধ হয় তাহার মত হৃদয়োন্মত্তকর জিনিস আর কিছুই নাই। ভারতবর্ষের যে সকল প্রদেশে এই সংকীর্ত্তনের প্রচলন নাই সেখানকার লোকেরাও বঙ্গদেশে আসিয়া বৈষ্ণবদিগের সংকীর্ত্তন শুনিয়া মুগ্ধ হন। এমন কি এখন খৃষ্টান প্রচারকগণও আপনাদের ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সংকীর্ত্তনের সাহায্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন এই, শ্রীচৈতন্যদেবই কি সংকীর্ত্তন নূতন প্রবর্ত্তন করেন?

আমরা দেখিতে পাই, শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে বঙ্গদেশে সংকীর্ত্তনের বহুল প্রচার হইয়াছিল। বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব ঐতিহাসিকগণ শ্রীচৈতন্যদেবকেই সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন। অবশ্য জনসাধারণের মধ্যে সংকীর্ত্তনের বহুল প্রচার চৈতন্যদেবের প্রভাবেই হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনিই যে সংকার্ত্তন-প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। শ্রীচৈতন্য দেবের পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে সংকীর্ত্তন প্রচলিত ছিল। বৈষ্ণব গ্রন্থেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ—

"সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্যবিলাস॥
সর্ব্বকাল চারি ভাই গায় কৃষ্ণনাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান॥"

চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

অন্যত্র—

"কৃষ্ণকথা শুনিবেক নাহি হেন জন।
আপনা আপনি সভে করেন কীর্ত্তন॥"

চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

আরো—

দুঃখ ভাবি অদ্বৈত করেন উপবাস।
সকল বৈষ্ণবগণে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য কেনে বা কীর্ত্তন।
কারে বা বৈষ্ণব বলি, কিবা সংকীর্ত্তন॥
কিছু নাহি জানে লোকে ধনপুত্ররসে।
সকল পাষণ্ড দেখি বৈষ্ণবেরে হাসে॥

চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈস্বরে॥”

চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ২য় অধ্যায়।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে পূর্ব্বেও সংকীর্ত্তন ছিল। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, সেই সংকীর্ত্তন অতি সামান্য প্রকারের ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ সংকীর্ত্তনের বহুল উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন প্রচলিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ের বৈষ্ণবদিগের সংকীর্ত্তনের প্রধান অঙ্গ খোলের বাদ্য। বৈষ্ণবপ্রভাবের বাহিরে খোলের বাদ্য দেখা যায় না। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেবই এই খোলের আবিষ্কার করেন। কিন্তু একথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ইহা খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয়। কেননা আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে যখন সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন তাহার সঙ্গে খোলের বাজনা ছিল। ইহার পূর্ব্বে খোলের বাজনার অস্তিত্বের সুস্পষ্ট কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহার পূর্ব্বেও মৃদঙ্গ নামক এক প্রকার যন্ত্রের উল্লেখ আছে। চৈতন্যের জন্মের সময়ে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে যে সব বাদ্য বাজিয়াছিল তাহার মধ্যে মৃদঙ্গও ছিল।

“ততক্ষণে আইল সকল বাদ্যকার।
মৃদঙ্গ সানাঞি বংশী বাজায় আবার।”

চৈঃ ভাঃ, আদিখণ্ড, ২ অধ্যায়।

চৈতন্যের বিবাহোৎসবেও বাদ্যযন্ত্র-সকলের মধ্যে মৃদঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"বাদ্য আসি করিতে লাগিল বাজনিয়া
মৃদঙ্গ সানাঞি জয়ঢাক করতাল।
নানাবিধ বাদ্যধ্বনি উঠিল বিশাল॥"

চৈঃ ভাঃ, আদিখণ্ড, ১০ম অধ্যায়।

তবে এই মৃদঙ্গ বর্ত্তমান সময়ের খোল কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। বর্ত্তমান সময়ে মৃদঙ্গ বলিতে খোলকে বুঝায়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে বা তৎপূর্ব্বে বিবাহাদিতে মৃদঙ্গ নামক যে যন্ত্রের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা বর্ত্তমান সময়ের খোল কিনা বুঝিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে খোলের ব্যবহার দেখা যায় না। সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার সংকীর্ত্তনে মৃদঙ্গ ব্যবহার আরম্ভ করেন। তিনি নবদ্বীপের রাজপথে এবং নীলাচলে রথযাত্রার সময়ে যে সংকীর্ত্তন বাহির করিতেন, তাহাতে মৃদঙ্গ ব্যবহার হইত। যথা—

"মন্দিরা মৃদঙ্গ করতাল শঙ্খ
না জানি কতেক বাজে
মহা হরিধ্বনি চতুর্দ্দিকে শুনি
মাঝে শোভে দ্বিজরাজে॥"

চৈঃ ভাঃ, মধ্যখণ্ড, ২৩ অধ্যায়।

তৎপূর্ব্বে বৈষ্ণবেরা যে সংকীর্ত্তন করিতেন, বোধ হয় তাহাতে খোল ব্যবহার হইত না; কেবল হাততালি দিয়া গান করিতেন। চৈতন্য ভাগবতে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাশের পূর্ব্বে শ্রীবাসাদির যে সংকীর্ত্তনের বর্ণনা আছে, তাহাতে কেবল হাততালির কথাই উল্লিখিত আছে। যথা—

"অতি পরমার্থ শূন্য সকল সংসার।
তুচ্ছ-রস বিষয়ে সে আদর সভার॥
গীতা ভাগবত বা গড়ায় যে যে জন।
তারাও না বোলে না বোলায়ে সংকীর্ত্তন॥
হাতে তালি দিয়া বা সকল ভক্তগণ।
আপনা আপনি মেলি করেন কীর্ত্তন॥"

চৈঃ ভাঃ, আদিখণ্ড ১১ অধ্যায়।

অন্যত্র—

"আপনা আপনি সব সাধুগণ মেলি।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণ নাম দিয়া করতালি॥
তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে।
পাষণ্ডে পাষণ্ডে মেলি বল্গাইয়া মরে॥"

চৈতন্য ভাগবত, আদিখণ্ড, ১১ অধ্যায়।

সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যদেব যখন প্রথম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন, তখন তিনিও কেবল হাততালি দিয়া কীর্ত্তন করিতেন। পাঠ বন্ধ করিয়া ছাত্রগণকে লইয়া তিনি যখন প্রথম সংকীর্ত্তন করেন, তখন কেবলমাত্র হাততালির উল্লেখ আছে। যথা :—

"দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনি কীর্ত্তন করে শিষ্যগণে লইয়া॥"

চৈঃ ভাঃ, মধ্যখণ্ড ১ অধ্যায়।

পরে কোন সময়ে মৃদঙ্গের ব্যবহার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গীত বিষয়ে আশ্চর্য্য প্রতিভা ছিল। বৈষ্ণব জীবনচরিত-লেখকগণ তাহার কোন উল্লেখ

করেন নাই। তবে আমরা দেখিয়াছি, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবকে সংকীর্ত্তনের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়াছেন।

বৈষ্ণব সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ইহা কতটা শ্রীচৈতন্যের কার্য্য, এবং কতটা নরোত্তমদাস প্রভৃতি পরবর্ত্তী বৈষ্ণব গায়কগণের কার্য্য তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। তবে শ্রীচৈতন্যদেব যে অনেক পরিমাণে বৈষ্ণব সংকীর্ত্তনের বর্ত্তমান আকার দিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে নবদ্বীপে এবং পুরীতে যে সংকীর্ত্তন বর্ণনা আছে, তাহা বর্ত্তমান সময়ের বৈষ্ণব সংকীর্ত্তনের অনুরূপ। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া সম্প্রদায় গঠন করিয়া সংকীর্ত্তন করিতেন। এক একটী সম্প্রদায়ে দুই খানি খোল, চারিখানি বা ততোধিক করতাল এবং কয়েকজন গায়ক থাকিতেন। বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণবদের সংকীর্ত্তনও ঠিক এইরূপ হইয়া থাকে। বোধ হয় চৈতন্যদেবই স্বীয় প্রতিভাবলে এই অদ্ভুত মনোমুগ্ধকর সংকীর্ত্তন সৃষ্টি করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বে সংকীর্ত্তন প্রচলিত থাকিলেও তিনিই যে ধর্ম্মসাধনে সংকীর্ত্তন বিশেষভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে সংকীর্ত্তনের বহুল প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যে কারণেই হউক বৈষ্ণবাচার্য্য ও ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সংকীর্ত্তনের প্রচারের জন্যই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ হইতেই সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশে সংকীর্ত্তন প্রচার শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রধান ও স্থায়ী কার্য্য। সংকীর্ত্তনের সাহায্যে তিনি পূর্ব্ব ভারতের পল্লীতে পল্লীতে ভক্তিধারা প্রবাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলেও বদ্ধ বারিধারার মত তাহা

অল্পসংখ্যক বা বিচ্ছিন্ন ভক্তমণ্ডলীতে আবদ্ধ ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব আপনার হৃদয়ের অগাধ প্রেম ও ভক্তির বন্যাতে দেশ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। প্রচলিত ধর্ম্মহীনতা, বিকৃত ধর্ম্ম, দুর্নীতি, পাপ ও বিষয়াসক্তি দূর করিয়া সুবিমল ভক্তির ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। তিনি ধর্ম্মের এক বৃহৎ আদর্শ দেখিয়া ছিলেন, এবং জগৎকে তাহা দিবার জন্য সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাসাদি মহাভক্ত হইলেও তাঁহাদের জীবনে সে আবেগ, অনুপ্রাণনা বা ঈশ্বরপ্রেরণা আসে নাই। সেই জন্যই তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও বঙ্গদেশে বা বৈষ্ণবমণ্ডলীতে নব-জীবন সঞ্চার করিতে পারেন নাই। শ্রীচৈতন্যের জীবনে নূতন আদর্শের মহা আবেগ লক্ষিত হয়। সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান এক এক ব্যক্তিকে এক একটী নূতন সত্য বা আদর্শ প্রচারের জন্য জগতে পাঠান। শ্রীচৈতন্যদেব সেই শ্রেণীর মহাপুরুষ ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। তিনি মানস-চক্ষুতে ধর্ম্মের এক উন্নত আদর্শ দেখিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে নানা কুসংস্কার, দুর্নীতি, ধর্ম্মবিকার ও পাপে বঙ্গদেশ আচ্ছাদিত ছিল। একদিকে তান্ত্রিক কদাচারে সমাজ কলুষিত হইয়া গিয়াছিল; লোকে ধর্ম্মের নামে নানা বীভৎস আচরণ করিত; মদ্য, মাংস, ব্যভিচার ও পশুবধ দেশমধ্যে অবাধে প্রচলিত হইতেছিল। অপর দিকে জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতগণ বিকৃত বৈদান্তিক দর্শনের অনর্থকর প্রভাবে মহাভ্রমে পতিত হইয়া প্রকৃত ধর্ম্ম এবং নীতি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। সাধারণ লোকে ধর্ম্ম বলিতে কেবল কতকগুলি প্রাণহীন ক্রিয়া, মিথ্যা আড়ম্বর ও কুৎসিৎ আমোদ বুঝিত। শ্রীচৈতন্যদেব এই সকলের মধ্যে সুশীতল ভক্তি ধর্ম্মের এক মহান আদর্শ দর্শন করিয়া-ছিলেন। ঈশ্বরে বিমল ভক্তি এবং মানবে প্রীতি তাঁহার ধর্ম্মের মূলমন্ত্র।

এ কথা তিনি নূতন বলেন নাই; কিন্তু এই প্রাচীন সত্য তাঁহার জীবনে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষত্ব তাঁহার অদ্ভুত জীবন। তিনি কোন নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করেন নাই। জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প শিক্ষা ও উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেব ও হজরত মহম্মদের নামে বহু উপদেশ রহিয়াছে। মহর্ষি ঈশার উপদেশ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত হইলেও নিতান্ত কম নহে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের মুখের কথা বলিয়া অতি সামান্যই পাওয়া যায়। তাঁহার মুখের কথা অপেক্ষা জীবন ও দৃষ্টান্তই ধর্ম্ম-জগতে নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। তিনি নিজ জীবনে ভক্তিধর্ম্ম সাধন করিয়া দেশবাসীকে ভক্তি শিক্ষা দিয়াছিলেন। অকপট ঈশ্বর প্রীতি কি জিনিষ তাহা মানব তাঁহার জীবনে দেখিয়াছিল। যেখানে যাইতেন, লোকে তাঁহার আশ্চর্য্য ভক্তি দেখিয়া অবাক হইত। মানব ইতিহাসে এমন ঈশ্বর-প্রীতি আর কোথাও দেখা যায় নাই। হরিনাম কীর্ত্তন ও শ্রবণে দরদর ধারায় অশ্রু বহিত, অঙ্গে স্বেদ কম্প পুলক দেখা দিত, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে ভক্তির বহিঃপ্রকাশের বিশেষ আদর হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, সকলের জীবনেই এই ভক্তির বহিঃপ্রকাশের প্রাবল্য দেখা যায়। ইহার দ্বারা তাঁহারা ধর্ম্ম জীবনের গভীরতা মাপ করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে অদ্ভুত ভক্তি লক্ষণের কথা শোনা যায়। হরিনাম শ্রবণে আনন্দে অধীর হইয়া তিনি নাচিতেন, কাঁদিতেন, হাসিতেন, অঙ্গে স্বেদ কম্প পুলক দেখা দিত। অবশেষে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই অবস্থায় থাকিতেন। বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহাকে মহাভাব আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব গয়া হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতেই

তাঁহাতে এই মহাভাবের লক্ষণ দৃষ্ট হয়; ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া এমন হইয়াছিল যে, অনেক সময়েই তিনি এই ভাবে মগ্ন থাকিতেন। সাধারণ লোকরা যে অনেক পরিমাণে ইহা দেখিয়াই তাঁহাকে অসাধারণ মানুষ মনে করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রকার ভক্তির বহিঃপ্রকাশের অপব্যবহার সম্ভব হইলেও ইহা অতি মূল্যবান জিনিষ। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে যে ভক্তি-লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, তাহাতে কোনও কৃত্রিমতা ছিল না। তাঁহার অন্তরে যে উচ্ছ্বসিত ভগবৎ-প্রেম প্রবাহিত হইয়াছিল, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহা বাহির হইয়া পড়িত। ভক্তিশাস্ত্রে অনেক দিন হইতেই ঈশ্বর-প্রীতির এই সব লক্ষণের বিবরণ ছিল। শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাভাবের বর্ণনা আছে। বৈষ্ণব কবিগণ কৃষ্ণপ্রেমে রাধিকার চিত্তবিকারেরও নানা বর্ণনা করিয়া-ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে এই সকল বর্ণনা চাক্ষুষ সত্য হইয়াছিল। ঈশ্বরের প্রীতি যে কি জিনিষ কল্পনা ও বর্ণনা ছাড়িয়া মানুষ এখন তাহা চক্ষুতে দেখিল। ভগবানের বিরহে চৈতন্যদেবের যে কাতরতা, "কৃষ্ণরে বাপরে কোথায় গেলে" বলিয়া যে মহা ক্রন্দন, মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি, তাঁহার সহবাসে যে বিমল আনন্দ, আহার নিদ্রা ভুলিয়া ভগবৎ গুণানুকীর্ত্তন, এই সকল দেখিয়া মানুষ বুঝিল ধর্ম্ম কি জিনিস, ভক্তি কি? অল্পদিনের মধ্যে যে বহু লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, এমন কি তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিল, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। এদেশে শ্রীচৈতন্যের অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের সাধুপুরুষদিগকেও আধুনিক সময়েও ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করা হইয়াছে। চৈতন্যদেব যখন গয়া হইতে ফিরিয়া আসিলেন লোকে তাঁহার পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। যে যুবক উদ্ধত, অহঙ্কারী, জ্ঞানগর্ব্বিত ছিল, তাহার

একি পরিবর্ত্তন! হরি বলিতে নয়নে দরদরধারে অশ্রু বহে, সকলের চরণে পড়িয়া প্রেম ভিক্ষা করে। প্রথম দর্শনের পর বৈষ্ণব মণ্ডলীতে শ্রীমান্ পণ্ডিত তাঁহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের যে বিবরণ দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেই সকল কথা বেশ বুঝা যাইবে। তিনি বলিতেছেন:—

"পরম অদ্ভুত কথা, মহা অসম্ভব।
নিমাঞি পণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব॥
গয়া হইতে আইলেন সকল কুশলে।
শুনি আমি সম্ভাষিতে গেলাঙ বিকালে॥
পরম-বিরক্ত-রূপ সকল সম্ভাষ।
তিলার্দ্ধেক ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ॥
নিভৃতে যে লাগিলেন কহিতে কৃষ্ণকথা।
যে যে স্থানে দেখিলেন যে অপূর্ব্ব যথা॥
পাদপদ্ম তীর্থের লইতে মাত্র নাম।
নয়নের জলে সব পূর্ণ হইল স্থান॥
সর্ব্ব অঙ্গে মহা-কম্প পুলক পূর্ণিত।
'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া মাত্র পড়িলা ভূমিত॥
সর্ব্ব-অঙ্গে ধাতু নাই হইলা মূর্চ্ছিত।
কথোক্ষণে বাহ্য দৃষ্টি হৈলা চমকিত॥
শেষে যে বলিয়া 'কৃষ্ণ' কান্দিতে লাগিলা।
হেন বুঝি গঙ্গা-দেবী আসিয়া মিলিলা॥
যে ভক্তি দেখিল আমি তাহান নয়নে।
তাহানে মনুষ্য-বুদ্ধি আর নাহি মনে॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ১ম অধ্যায়।

অন্যত্র ঠিক এইরূপ বর্ণনা আছে—

"মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর প্রতি দিনে-দিনে।
কীর্ত্তন করেন সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সনে॥

* * *

যখন প্রভুর হয় আনন্দ-আবেশ।
কে কহিব তাহা, সবে পারে প্রভু 'শেষ'॥
শতেক-জনেও কম্প ধরিবারে নারে।
লোচনে বহয়ে শত শত নদী ধারে॥
কনক-পনস যেন পুলকিত-অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে বহুরঙ্গ॥
ক্ষণে হয় আনন্দ মূর্চ্ছিত প্রহরেক।
বাহ্য হৈলে না বোলয়ে কৃষ্ণ-ব্যতিরেক॥
হুঙ্কার শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে।
তাঁর অনুগ্রহে তাঁর ভক্ত সব ত'রে॥
সর্ব্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ক্ষণে ক্ষণে হয়।
ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময়॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সব-ভাগবত গণে
নরজ্ঞান আর কেহো না করয়ে মনে॥"

চৈ ভা মধ্যখণ্ড ২য় অধ্যায়।

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ভক্তগণ তাঁহার অসাধারণ ভক্তি লক্ষণ দেখিয়াই প্রথমতঃ তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের এই ঈশ্বর বুদ্ধি আর একটী কারণে বদ্ধমূল হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব সময়ে সময়ে ভাবের অবস্থায় "আমি ঈশ্বর" এরূপ কথা বলিতেন। কোনও কোন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকদের মুখে ঈশায়

ঈশ্বরত্ব স্থাপন কল্পে এই যুক্তি শুনিয়াছি যে অন্যান্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকেরা আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। ঈশা স্বয়ং আপনাকে ঈশ্বর বা ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। মহর্ষি ঈশা ক্বচিৎ দুই একটী স্থানে আপনাকে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু চৈতন্যদেব অনেক সময়ে আপনাকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত লেখকগণ বহুবার তাঁহার ঈশ্বরত্ব ঘোষণার কথা লিখিয়াছেন। যোগের অবস্থায় তিনি কেবলমাত্র মুখে "আমি ঈশ্বর" বলিতেন তাহা নহে, ভক্তদের নিকট হইতে ঈশ্বরোচিত পূজা গ্রহণ করিতেন। এমন কি বৃদ্ধ পিতামহতুল্য প্রবীণ ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের মস্তকে পা তুলিয়া দিয়াছিলেন। পূজা গৃহে বিষ্ণুখট্টার উপরে বসিয়া সকলকে বলিতেন, "আমাকে পূজা কর।" এই সকল বিবরণ অতিরঞ্জিত হইলেও একেবারে ভিত্তিহীন মনে করা যায় না। সাধারণতঃ তিনি বিনয়ের অবতার ছিলেন। আপনাকে অধম,পাপী বলিয়া ধিক্কার দিতেন; ভগবানের দর্শন পাইলাম না বলিয়া কাঁদিয়া অধীর হইতেন। কিন্তু আবার সময়ে সময়ে যে তিনি আপনাকে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া অনুভব করিয়াছেন তাহাও অস্বীকার করা যায় না। সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে, তিনি অতিশয় ভাবপ্রবণ লোক ছিলেন। যখন যে চিন্তা মনে আসিত তাহাতে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন। শ্রীচৈতন্য আপনাকে কেবল মাত্র বিষ্ণুর অবতার বলিতেন না; ভাবের সময় তিনি আপনাকে অন্যের সঙ্গেও অভিন্ন মনে করিতেন। একদিন অক্রুরের কথা ভাবিতে ভাবিতে আপনাকে অক্রুর মনে করিলেন। যথা—

"অক্রুর-যানের শ্লোক পঢ়িয়া পঢ়িয়া।
ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হৈয়া॥

হইলেন মহাপ্রভু যে হেন অক্রুর।
সেই মত কথা কহে, বাহ্য গেল দূর॥
"মথুরায় চলে নন্দ! রাম-কৃষ্ণ লৈয়া।
ধর্ম্মুম্মুখ রাজমহোৎসব দেখি গিয়া॥"

চৈ, ভা, মধ্যখণ্ড ৩য় অধ্যায়।

যাহা হউক জীবনচরিত লেখকদের অতিরঞ্জন বাদ দিলেও সময়ে সময়ে শ্রীচৈতন্য দেব যে আপনাকে ঈশ্বর বা বিষ্ণুর সঙ্গে অভেদ বলিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই সকল উক্তি সেই ভাবের যে ভাবে ঈশা আপনাকে ঈশ্বরের হইতে অভিন্ন বলিয়াছিলেন "I and my father are one". যখন কোনও মানুষ আপনার আমিত্ব সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিতে পারেন, তাঁহার নিজের স্বার্থ, সুখ, ইচ্ছা, রুচি, কিছু থাকে না, একেবারে ভগবদিচ্ছায় আপন ইচ্ছা মিশিয়া যায় তখন বাস্তবিকই তিনি বলিতে পারেন আমি ও আমার পিতা এক। উপনিষৎকার ঋষিগণ এই সত্য উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই ভাবেই বলিয়াছিলেন "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।" এই অবস্থাকেই ভগবদ্গীতাকার যোগের অবস্থা বলিয়াছেন। আধ্যাত্মিক জীবনের ইহা অতি উন্নত অবস্থা। কিন্তু এই অভেদজ্ঞান লাভ সহজসাধ্য নয়। ঈশা, চৈতন্যের পক্ষেই একথা বলা সম্ভব। তাঁহারাও যখন তখন একথা বলিতেন না। মহাভাবের মুহূর্ত্তে কচিৎ কখনও বলিয়া থাকিবেন। অনুবর্ত্তীরা সেই এক মুহূর্ত্তের কথাকেই বাড়াইয়া বিস্তৃত করিয়াছেন, এবং তাহার উপরে তাঁহাদের ঈশ্বরত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যদেবের অসাধারণ ঈশ্বরভক্তি যাহার বাহ্য প্রকাশ দেখিয়া সমসাময়িক লোকেরা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, এবং তাঁহার

ভক্তেরা তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার মনে করিয়াছিল, জগতের ধর্ম্ম ইতিহাসে অপূর্ব্ব জিনিষ। বোধ হয় এমন অধীর উচ্ছ্বসিত ভগবৎপ্রেম জগতে আর কখনও দেখা যায় নাই। একদিকে এই গভীর ভগবদ্ভক্তি অপর-দিকে উদার মানবপ্রীতি, চৈতন্যচরিত্রে এই উভয়ের মধুর সামঞ্জস্য হইয়াছিল। বাস্তবিক এই দুই একই জিনিষের বিভিন্ন প্রকাশ, প্রকৃত ভগবদ্ভক্তি মানব প্রীতির উৎস; আবার অকপট মানবপ্রীতি ভগবদ্ভক্তির সোপান। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি ভাবুকতাতে পরিসমাপ্তি লাভ করে নাই। তিনি ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া বলিলেন "আচণ্ডালে দেহ প্রেম।" তৎকালে এই উদার মানবপ্রীতি ঘোষণা কম কথা নহে। সে সময়ে বঙ্গদেশে জাতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পূর্ণ মাত্রায় রাজত্ব করিতেছিল। ব্রাহ্মণগণ নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে নিতান্ত অবজ্ঞা ও ঘৃণার চক্ষুতে দেখিতেন। বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথম নিম্নশ্রেণার লোকদিগের জন্য উন্নত ধর্ম্মের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবই এই সংস্কারের প্রবর্ত্তক। এখানেও বলা যাইতে পারে যে, যেমন শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বেও ভক্তি ধর্ম্ম এদেশে প্রচলিত ছিল, এবং অদ্বৈতাদি তাহার সাধক ছিলেন, সেইরূপ অদ্বৈতাদি এই উদার মানবপ্রীতির সূচনা এবং শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ইহার বহুল প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্য ভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন যে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সর্ব্বপ্রথমে চৈতন্যকে স্ত্রীশূদ্র প্রভৃতি হেয় শ্রেণীর মধ্যে ভক্তি প্রচারের অনুরোধ করেন। শ্রীচৈতন্যের আকর্ষণে তিনি যখন শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন তখন চৈতন্যদেব তাঁহাকে বর লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

অদ্বৈত বোলেন "যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥

বিদ্যা ধন-কুল আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত, তোর ভক্তি যে যে জনে বাধে॥
সে পাপিষ্ঠ-সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গায়্যা॥"

চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

এই বর্ণনা অনুসারে অনুমান করা যাইতে পারে যে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অন্তরে চণ্ডালাদি তৎকালীন সমাজে হেয় জাতিগণের মধ্যে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের প্রকটের পূর্ব্বে কার্য্যতঃও তিনি এই উদার সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। যবন কুলোদ্ভব হরিদাস যখন শান্তিপুরে আগমন করেন, তখন অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে বহু সম্মানে গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে জাতিভেদের কঠিন শৃঙ্খল ভঙ্গ করিতে বোধ হয় নিত্যানন্দের অধিক উৎসাহ হইয়াছিল। আহারের সময়ে তিনি উচ্ছিষ্ট অন্ন ছিটাইয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে গুপ্ত জাত্যভিমানের মস্তক চূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তথাপি এ-বিষয়েও শ্রীচৈতন্যদেব নেতা ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা ক্ষীণভাবে জাগিয়াছিল, শ্রীচৈতন্য তাহা দৃঢ় ও প্রকাশ্য-ভাবে সমর্থন ও প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন, ব্রাহ্মণোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ হরিভক্তি বিহীনশ্চ ব্রাহ্মণঃ শ্বপচাধমঃ।" শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন "আচণ্ডালে দেহ প্রেম।"

কেবল হিন্দু সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে ভক্তিধর্ম্ম সাধনে পূর্ণ অধিকার দিয়াই শ্রীচৈতন্যের উদার হৃদয় ক্ষান্ত হইল না। তিনি মুসলমানদিগকেও তাঁহার মণ্ডলীতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময় হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্য

দেবের নিকট হিন্দু মুসলমান ভেদ ছিল না। যবন হরিদাস তাঁহার অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন, তিনি যখন নবদ্বীপে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন তখন নিত্যানন্দ ও হরিদাস এই উভয়কে প্রধান প্রচারক করিলেন। ইহাতে মনে হয়, তাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই সমভাবে তাঁহার ধর্ম্মগ্রহণ করিবে। তিনি যখন নবদ্বীপ ছাড়িয়া নীলাচলে বাস করেন, তখন হরিদাসকে আপনার নিকটে লইয়া যান, এবং প্রতিদিন তাঁহাকে না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। হরিদাসের মৃত্যুতে তিনি অতিমাত্র ব্যথিত হইয়াছিলেন, এবং গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সৎকার করাইয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দুই জন প্রধান পুরুষ, রূপ এবং সনাতন সম্ভবতঃ প্রথমজীবনে মুসলমান ছিলেন। তাঁহারা তৎকালীন গৌড়ের বাদসাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা হিন্দু বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বয়ং তাঁহারা অথবা তাঁহাদের পিতা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব নাম দবীর খাস ও সাকর মল্লিক ছিল। উভয়েই সংস্কৃত ও পারসীক ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। রাজকার্য্যেও তাঁহারা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বলিতে গেলে তাঁহারাই দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদের প্রথম জীবনের যথাযথ ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে তাঁহাদের জীবন যে বিশেষ রহস্যময় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা যে মুসলমান হইয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের নাম হইতেই বুঝা যায়। যখন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য পুরী আসিয়াছিলেন, তখন হরিদাসের মত তাঁহাদিগকে নগরের প্রান্তে পৃথক বাসা দেওয়া হইয়াছিল। এইসব কারণে মনে হয় তাঁহারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়

জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগ দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের যবনত্ব খণ্ডন করিয়া স্বীয় মণ্ডলীতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে রূপ ও সনাতন নাম প্রদান করতঃ স্বীয় ভক্তিধর্ম্ম প্রচারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অসামান্য প্রতিভা বা বিদ্যা দ্বারা তাঁহারা পরিণামে বৈষ্ণবধর্ম্মের গোঁসাই অর্থাৎ নেতৃগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বৃন্দাবনে মোগল সৈন্য এবং আরও ২।১ জন মুসলমানকে স্বীয় ধর্ম্মমণ্ডলীতে গ্রহণ করার উল্লেখ আছে। এই সকল ঘটনা হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় শ্রীচৈতন্যদেব জাতিবর্ণের নিগড় ছিন্ন করিয়া নিম্নশ্রেণী এবং মুসলমানগণকেও স্বীয় মণ্ডলীতে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তবে হিন্দুসমাজের চিরপ্রসিদ্ধ স্থিতিস্থাপকতার প্রভাবে তাঁহার এই চেষ্টা যথেষ্ট কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে নাই। মুসলমানদিগকে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করিতে না পারিলেও চৈতন্যদেবের শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছিল। আশ্রমধারী বৈষ্ণবদিগের মধ্য হইতে জাতিভেদ ত সম্পূর্ণ উন্মূলিত হইয়াছিল; যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কোনও প্রকার জাতিগত বৈষম্য থাকিত না। সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার প্রধান শিষ্যগণের আদর্শ ইহাই ছিল। কিন্তু তাঁহাদের সে আদর্শ বহুল পরিমাণে গৃহীত হয় নাই। তাঁহাদের অনুবর্ত্তীদের মধ্যে অধিকাংশই সামাজিক বিষয়ে জাতিভেদ রক্ষা করিয়াই চলিতেন; তবু তাঁহাদের মধ্যেও জাতিভেদের উগ্রতা অনেকপরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল। অনেক নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও উন্নত ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া গোঁসাই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেন।

যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যদেব যে স্ত্রীশূদ্র চণ্ডালদিগকেও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা দিতে সংকল্প করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সাক্ষাৎভাবে না হউক পরোক্ষভাবে শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়েও বঙ্গদেশে তিনি প্রথম পথপ্রদর্শক। রমণীদিগকে উন্নত ধর্ম্মজীবন লাভের পথে অগ্রসর হইতে তিনি সর্ব্বপ্রথম উৎসাহিত করেন; তাঁহার উৎসাহে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক মহিলা গভীর ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, বোধ হয় তিনি বালবিধবাদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। একটি প্রবাদ আছে যে শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন এবং তৎপরে তাঁহার গর্ভে চৈতন্য-ভাগবত-রচয়িতা বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। বৃন্দাবন দাসের বাল্যজীবনের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় নাই, তাহাকে নারায়ণীর পুত্র বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, কোথাও তাঁহার পিতার নাম বা পরিচয় দেওয়া হয় নাই। ইহাতে মনে হয় তাঁহার জন্ম বিষয়ে কোন রহস্য ছিল। নারায়ণী শ্রীচৈতন্যদেবের অতিশয় প্রিয় পাত্রী ছিলেন, তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের 'অবশেষ পাত্র' বলা হয়! এ কথার অর্থ কি ভাল বোঝা যায় না। নারায়ণীর প্রথম পতির মৃত্যুর পরে তাঁহার সন্তান হইয়াছিল এবং শ্রীচৈতন্যদেব তথাপি তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন। বাস্তবিক শ্রীচৈতন্যদেব একজন তেজস্বী সংস্কারক ছিলেন। যাহা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত বুঝিতেন তাহা নির্ভয়ে কার্য্যে পরিণত করিতেন। একদিকে তিনি নম্রতার অবতার ছিলেন, তৃণ হইতেও দীন ছিলেন, কিন্তু অপরদিকে কর্ত্তব্যসাধনে তিনি মহা তেজস্বী ছিলেন। মহাকবি ভবভূতি মহৎব্যক্তিদিগের যে লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন শ্রীচৈতন্য দেবের চরিত্রে তাহা পূর্ণ মাত্রায় লক্ষিত হয়। তিনি কুসুমের ন্যায়

কোমল হইলেও প্রয়োজনমত বজ্রের ন্যায় কঠিন হইতে জানিতেন। তিনি সাধারণতঃ মেষশাবকের মত নিরীহ; পদাঘাত করিলেও উচ্চ কথা বলিতেন না; কিন্তু অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিবাদের সময়ে তিনি সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিতেন। ভয় কাহাকে, বলে তাহা জানিতেন না। তাহার প্রমাণ নবদ্বীপের কাজীর অন্যায় আদেশের প্রতিবাদ। শ্রীচৈতন্যদেব যখন নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন প্রচার করিলেন, তখন তথাকার মুসলমান শাসনকর্ত্তা আদেশ করিলেন যে, কেহ প্রকাশ্যে সংকীর্ত্তন করিতে পাইবে না; করিলে শাস্তি হইবে। এই কথা যখন শ্রীচৈতন্যদেবের কর্ণে গেল, তিনি হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন; তিনি বলিলেন, ইহা কখনই হইতে পারে না; জনসাধারণের ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ! এ আদেশ অন্যায়। আমি আজই নবদ্বীপের পথে পথে সংকীর্ত্তন করিব, দেখি কে বাধা দেয়। সে কালের দিনে ইহা কম সাহসের কথা নয়। তাঁহার আশ্বাসবাণীতে ভক্তগণ মহা উৎসাহিত হইলেন। অপরাহ্নে সদলে শ্রীচৈতন্যদেব রাজপথে সংকীর্ত্তন করিতে বাহির হইলেন। দলে দলে লোক তাঁহার সঙ্গে চলিলেন; মুসলমান শাসনকর্ত্তা ভয়ে লুকায়িত হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নিরীহ ব্রাহ্মণ-তনয়ের এ কি তেজ!

সাধারণতঃ আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে ভাবুক মনে করিয়া থাকি। কিন্তু তাঁহাতে অসাধারণ ভাবুকতার সঙ্গে আশ্চর্য্য কর্ম্মকুশলতা এবং গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি যে ভাবে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভা ছিল; যদিও মনে হইতে পারে যে, তিনি নিজের সাধন ভজন লইয়া মগ্ন থাকিতেন কিন্তু তাহার মধ্যেও

স্বীয় ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি অতি সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। স্বয়ং আসিয়া নীলাচলে বসিলেন। সেখানে বহু সংখ্যক তীর্থযাত্রীর সমাগম হইত। তাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ভক্তিধর্ম্ম গ্রহণ করিত। নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য নিয়োজিত করিলেন; তিনি অল্পদিনের মধ্যে বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম বহুল প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অপরদিকে রূপ এবং সনাতন প্রভৃতিকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন, তাঁহারা তদঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচনে শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্চর্য্য প্রতিভা ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, তিনি অসাধারণ কর্ম্মী (organiser) ছিলেন।

অপরদিকে ধর্ম্ম বিজ্ঞান বিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের কম কৃতিত্ব ছিল না। তাঁহার অদ্ভুত ভক্তিতে জ্ঞান গরিমা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। সচরাচর লোকে শ্রীচৈতন্যদেবকে ভক্তির অবতার ও সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক বলিয়া জানে, কিন্তু তিনি অসাধারণ জ্ঞানীও ছিলেন। ধর্ম্ম-জগতে ভক্তিপ্রচার তাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল না। একদিকে যেমন তিনি তান্ত্রিক আচার, বাহ্যাড়ম্বর, সাংসারিকতা প্রভৃতির স্থানে সুবিমল ভক্তির ধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন; অপর দিকে বিকৃত বৈদান্তিক ধর্ম্ম, নিরীশ্বর বৌদ্ধ ধর্ম্ম খণ্ডন করিয়া তাহার স্থানে ভক্তিমূলক একেশ্বর-বাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নীলাচলে সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে বিচারে পরাস্ত করিয়া ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। বারাণসীতেও প্রকাশানন্দ প্রভৃতি বৈদান্তিক পণ্ডিতদিগকে বৈদান্তিক ধর্ম্ম হইতে ভক্তিধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার এতদ্বিষয়ক যুক্তিগুলি রক্ষিত হয় নাই; তাহা রক্ষিত হইলে ধর্ম্ম সাহিত্যে তাহা অতি মূল্যবান জিনিষ হইত। শুনা যায়

বাসুদেব নিরসন নামে একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন তাহার চিহ্ন পাওয়া যায় না। এতদ্ভিন্ন দাক্ষিণাত্যে নানা স্থানে বৌদ্ধ শ্রমণদিগের সঙ্গে বিচার করিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তিধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, ধর্ম্ম বিজ্ঞানে তিনি অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। এই সকল কারণেই তিনি বৈষ্ণবদিগের নেতা হইয়াছিলেন। ইতিহাস এবং জনশ্রুতি ন্যায়তঃই একবাক্যে তাঁহাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে।

শ্রীচৈতন্য-জীবনীর উপকরণ

আমরা বলিয়াছি, শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও উপদেশ অপেক্ষা তাঁহার জীবনই অধিকতর মূল্যবান। অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের শিক্ষা বলিয়া গ্রন্থ, সঙ্গীত, বচনাদি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের মুখের বাণী বলিয়া অতি সামান্যই পাওয়া যায়। ধর্ম্মরাজ্যে চৈতন্যদেবের জিবনী অতিশয় মূল্যবান বস্তু। সৌভাগ্যক্রমে এতৎসম্বন্ধে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই কয়েকখানি জীবনচরিত লিখিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে বৃন্দাবন দাস প্রণীত চৈতন্য ভাগবত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। কিন্তু ইহারা উভয়েই চৈতন্যদেবকে দর্শন করেন নাই। চৈতন্যভাগবত-প্রণেতা বৃন্দাবন দাস স্বীয় গ্রন্থ-মধ্যে বার বার আক্ষেপ করিয়াছেন যে, সে সময়ে জন্ম হয় নাই, চৈতন্যদেবকে দেখিবার সুযোগ হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িকগণের মধ্যে মুরারি গুপ্ত, স্বরূপ দামোদর এবং রঘুনাথ দাস তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত কড়চাকারে লিখিয়া রাখিয়াছেন, এরূপ উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই সকল গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বরূপ দামোদরের 'কড়চার' কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। মুরারি গুপ্তের 'কড়চা' বলিয়া একখানি সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানি মুরারি গুপ্তের লিখিত বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার রচিত হইলেও তাহাতে চৈতন্যভাগবত অপেক্ষা কোন নূতন তথ্য পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম জীবন-সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবত এবং শেষ জীবন সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃত সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান এবং প্রামাণিক গ্রন্থ।

বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম জীবনের বিবরণ চৈতন্যভাগবতে বিস্তৃতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু শেষ জীবনের বিবরণ অতি অসম্পূর্ণ। ইহার কারণ কি বুঝিতে পারা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে, এই গ্রন্থের শেষ অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেকথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। প্রথমাংশ রক্ষিত হইলেও শেষ অংশ রক্ষিত হইল না, ইহার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। চৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন যে, চৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ জীবনের ভালরূপ বিবরণ না থাকায় বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণের আদেশে তিনি স্বীয় গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন; সুতরাং স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের সময়েও চৈতন্যভাগবতের চৈতন্যদেবের শেষ জীবনের বিবরণ অসম্পূর্ণ ছিল। চৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যদেবের বিবরণ কেবলমাত্র অসম্পূর্ণ নহে, কিন্তু কোন কোন মূল বিষয়ে চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণের সম্পূর্ণ বিরোধী। যেমন চৈতন্যচরিতামৃত মতে শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসের পর নীলাচলে গমন করিয়া তথায় কিছুদিন বাস করিয়া দাক্ষিণাত্যে তীর্থভ্রমণে গমন করেন, কিন্তু চৈতন্যভাগবত অনুসারে তিনি কিছুদিন নীলাচলে বাস করিয়া পুনরায় গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণই অধিক প্রামাণিক বলিয়া মনে হয়। চৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের শেষ অংশের বিবরণ এইপ্রকার সংক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন কেন কিছু বোঝা যায় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-দেবের প্রথম জীবনে বিবরণ লিখিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি বার বার বলিয়াছেন, এই বিষয়ে বৃন্দাবন দাস সমস্ত ঘটনা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি তাহাই সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাস্তবিকও চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যদেবের

সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে। তবে ইহার কিছুই তাঁহার স্বচক্ষে দেখা নয়। লোকমুখে তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ঠিক কোন্ সালে লিখিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। তিনি চৈতন্যদেবকে দেখেন নাই; সে কথা নিজেই বার বার বলিয়াছেন; তাহা হইলে কি চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল? কিন্তু অপর দিকে তিনি বলিয়াছেন, নিত্যানন্দের আদেশে তিনি চৈতন্যভাগবত রচনা করেন। তিনি যে নিত্যানন্দের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন, তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহা হইলে নিত্যানন্দের তিরোভাবের পূর্ব্বে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া থাকিবেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পরলোক গমনের পরে নিত্যানন্দ অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর পরে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হইলে নিত্যানন্দের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হওয়া সম্ভব হইত না। এই বিষয়ে আর একটি কথা ভাবিবার আছে। বৃন্দাবন দাস শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর পুত্র। বৈষ্ণব গ্রন্থে এবং চৈতন্যভাগবতেও বার বার সে কথার উল্লেখ আছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন স্থানে বৃন্দাবন দাসের পিতার উল্লেখ বা নাম পর্য্যন্ত নাই। একটি প্রবাদ আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেবের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে, নিত্যানন্দের আশীর্ব্বাদে বিধবা নারায়ণীর গর্ভে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। বৃন্দাবন দাসের জন্ম সম্বন্ধে যে একটি রহস্য ছিল তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের উপায় নাই। তাঁহার পিতার নামের উল্লেখ না থাকা বিশেষ বিস্ময়ের কারণ, তবে তিনি যে নারায়ণীর পুত্র তাহা সুনিশ্চিত। এই নারায়ণী শ্রীচৈতন্যদেব যে সময়ে নবদ্বীপে সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশ করেন সে সময়ে চারি বৎসরের বালিকা ছিলেন। সম্ভবতঃ শৈশবে তিনি শ্রীচৈতন্যের

প্রিয় পাত্রী ছিলেন। একদিন শ্রীবাসের গৃহে চৈতন্যদেব নারায়ণীকে হরি নামে কাঁদাইয়াছিলেন; ইহা ব্যতীত চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধের আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

যে সময়ে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশ করেন, তখন নারায়ণী চারি বৎসরের বালিকা। তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যু সময়ে নারায়নীর বয়স ন্যূনাধিক ৩০ বৎসর হইবে। সম্ভবতঃ ইতিপূর্ব্বেই বৃন্দাবন দাসের জন্ম হইয়া থাকিবে; তাঁহার বাল্য জীবনের কোনই প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তিনি নবদ্বীপের বাহিরে কোন স্থানে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। প্রথম জীবনে সম্মানিত না হইলেও উত্তরকালে বৈষ্ণবসমাজে তিনি সুপরিচিত এবং সমাদৃত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। চৈতন্যভাগবত ব্যতীত নিত্যানন্দ-বংশমালা নামে তিনি আর একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই দুই গ্রন্থ রচনার জন্য বৈষ্ণবসমাজে তাঁহার এত সমাদর হইয়াছিল। তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। উত্তর কালে নরোত্তম দাস স্বীয় জন্মস্থান ক্ষেতরী গ্রামে শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে মহোৎসব করেন বৃন্দাবন দাস তাহাতে উপস্থিত ছিলেন এবং তাহার বিবরণে "বিজ্ঞবর বৃন্দাবন দাস" নামে তাহার উল্লেখ আছে। কোন সময়ে তিনি চৈতন্যভাগবত রচনা করেন তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না; সম্ভবতঃ ইহা তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা। এমনও হইতে পারে যে-পুস্তক সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। চৈতন্য ভাগবতের শেষ অংশের অসম্পূর্ণতার কারণও ইহা হইতে পারে। ১৬১৫ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণদাস কবিরাজ নয় বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ শেষ করেন।

"শাকে সিদ্ধগ্নিবাণেন্দৌ শ্রীমদ্বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যো হসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"

ইহার অনেক পূর্ব্বে চৈতন্যভাগবত রচিত হইয়া থাকিবে। কেননা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে বার বার এই পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং সে সময়ে চৈতন্যভাগবত বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ সমাদৃত ও প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের সময়ে ইহার নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল। পরে কোন সময়ে তাহার পরিবর্ত্তে চৈতন্যভাগবত এই নাম হয়। চৈতন্য-জীবনীগুলির মধ্যে এই পুস্তক খানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া মনে হয়। তবে ইহাতেও বহু অতি-প্রাকৃত এবং অন্ধবিশ্বাস ও অবিচারিত ভক্তিমূলক বিবরণ আছে। তাহা স্বাভাবিক। সে সময়ে এরূপ বিশ্বাস বহু বিস্তৃত ছিল। সকল পুস্তকেই, এমন কি শ্রীচৈতন্যদেব অপেক্ষা অনেক নিম্ন শ্রেণীর লোকের জীবনেও এরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুর অনতিবিলম্বেই বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার জীবদ্দশায়ও কেহ কেহ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া মনে করিতেন। বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি জীবন-চরিত লেখকগণ তাঁহাকে অবতার জ্ঞান করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের রচনায় অতি-প্রাকৃত বিবরণ থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তবে এই বিষয়ে চৈতন্যভাগবত অন্যান্য জীবনী অপেক্ষা অধিকতর নির্দ্দোষ। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যজীবনী তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন; জন্ম হইতে গয়া গমন পর্য্যন্ত প্রথম খণ্ড; গয়া প্রত্যাগমন হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত, মধ্যখণ্ড এবং অবশিষ্ট অংশ অন্ত্যখণ্ড নামে অভিহিত করিয়াছেন; এই বিভাগ অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। গয়া গমন এবং সন্ন্যাস-গ্রহণ বাস্তবিক চৈতন্য

জীবনের দুইটী স্তর নির্দ্দেশ করে। বৃন্দাবন দাস প্রথম ও মধ্য খণ্ডের বিবরণ বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই অংশের ইতিহাস তাঁহার পুস্তকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল পাওয়া যায়। অন্যান্য গ্রন্থকারগণ তাঁহার লিখিত বিবরণ অপেক্ষা নূতন তথ্য বিশেষ কিছুই দিতে পারেন নাই। আক্ষেপের বিষয় যে, বৃন্দাবন দাস অন্ত্যখণ্ডের বিবরণ সম্পূর্ণ রাখিয়া যান নাই।

ঐতিহাসিকের নিকটে চৈতন্য-জীবনীর উপকরণকল্পে চৈতন্যভাগবতের পরেই চৈতন্যচরিতামৃতের স্থান। কিন্তু বৈষ্ণবগণ চৈতন্যভাগবত অপেক্ষা চৈতন্যচরিতামৃতকে অধিক সমাদর করিয়া থাকেন। তাহার কারণ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের অবতার মনে করিলেও তাঁহার মানবীয় চরিত্র বহু পরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিতেই অধিকতর প্রয়াসী। গ্রন্থ রচনা প্রয়োজনীয়তার কারণ তিনি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৃন্দাবনে বৈষ্ণবগণ প্রতিদিন অপরাহ্ণে চৈতন্যভাগবত শ্রবণ করিতেন, কিন্তু তাহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলা ভালরূপ বর্ণিত না থাকায় তাঁহাদের তৃপ্তি হইত না। অবশেষে তাঁহারা কৃষ্ণদাস কবিরাজকে বিস্তৃতভাবে অন্ত্যলীলা বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন; তখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃদ্ধ হইয়াছেন। বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও ভক্তগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কবিরাজ গোস্বামী এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন।

নয় বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। চৈতন্যচরিতামৃত সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদ আছে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। কথিত আছে, গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে গ্রন্থকার বৃন্দাবনের তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের নেতা শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনের

জন্য তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। জীবগোস্বামী বাস্তবিকই সে সময়ে বৈষ্ণবদিগের অগ্রণী ছিলেন; বিশেষতঃ বৈষ্ণবতত্ত্ব ব্যাখ্যা এবং প্রচার বিষয়ে তিনি এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত রূপ ও সনাতন গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইঁহারা ভক্তি ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাঙ্গালা ভাষায় ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন দেখিয়া বিরক্তি বা ঈর্ষাবশতঃ এই গ্রন্থ প্রচার করিতে তিনি অনুমতি দিলেন না, গ্রন্থখানি বৃন্দাবনের মন্দিরে পেটিকায় বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বভাবতঃই এই ঘটনায় মর্ম্মাহত হইলেন। হইবারই ত কথা। বৃদ্ধ বয়সে বহু পরিশ্রমে তিনি যে পুস্তক রচনা করিলেন তাহা ভক্তসমাজে প্রচারিত হইল না, ইহাতে ত গভীর ক্ষোভ হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক, কিন্তু বৈষ্ণব-সুলভ ভক্তিতে তিনি নীরবে এই ক্ষোভ বহন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার এক শিষ্য বলিলেন যে, গ্রন্থ রচনা সময়ে প্রতিদিন যতটুকু লেখা হইত, তিনি তাহার একখানি প্রতিলিপি করিয়া রাখিতেন, সুতরাং তাঁহার নিকটে সমস্ত গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি আছে। এই সংবাদে কবিরাজ গোস্বামী অতিশয় প্রীত হইলেন। তাঁহার গ্রন্থের প্রতিলিপি গোপনে গৌড়দেশে প্রেরিত হইল। এইরূপে গ্রন্থখানি লোকসমাজে প্রচারিত হয়। এই কথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। জীব গোস্বামীর মত পণ্ডিত ও ভক্ত এই প্রকার সঙ্কীর্ণতার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন, ইহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না।

চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের অতিশয় শ্রদ্ধা ও আদরের সামগ্রী। বাস্তবিকই গ্রন্থখানি অতি মূল্যবান। ইহাতে বৈষ্ণবধর্ম্ম বিষয়ক অনেক গভীর তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি

লিখিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ কেবল বৈষ্ণবসমাজ নহে, ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই গভীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ঝামরপুর গ্রামে সম্ভবতঃ ১৫১৭ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা চিকিৎসা ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কৃষ্ণদাসের ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার অল্পদিনের পরে তাঁহার মাতাও পরলোক গমন করেন। কৃষ্ণদাস ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামদাস তাঁহাদের পিতৃ-স্বসা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণদাসের জীবন দুঃখময় ছিল। কিন্তু নানা সংগ্রামের মধ্যে কৃষ্ণদাস জ্ঞান ও ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া মনে হয় তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। অল্প বয়সেই তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে। একবার শ্রীপাদ নিত্যানন্দের ভৃত্য মীনকেতন রামদাস ঝামরপুর আগমন করেন। ইহার সংস্পর্শে কৃষ্ণদাসের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। কিছু দিন পরে তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন। বৃন্দাবন যাত্রা-সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন যে, স্বপ্নে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করেন। তদনুসারে তিনি বৃন্দাবন আগমন করেন। তখন তাঁহার বয়স কত ঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ প্রথম যৌবন। বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি রূপসনাতন ও রঘুনাথ দাসের সঙ্গ লাভ করেন। বিশেষভাবে তিনি রূপগোস্বামী এবং রঘুনাথ দাসের অনুগত ছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতের প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে এইরূপ ভনিতা আছে

"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥"

চৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত বিষয়গুলি প্রধানতঃ তিনি রঘুনাথ-দাসের মুখে শুনিয়া থাকিবেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম জীবনের বিবরণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা চৈতন্য-ভাগবত হইতে সংগৃহীত। কিন্তু শেষ জীবনের অনেক নূতন কথা চৈতন্য-চরিতামৃতে পাওয়া যায়। এই সব তথ্য তিনি স্বরূপ, দামোদর ও রঘুনাথ দাসের কড়চা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন।

"স্বরূপ গোঁসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুইয়ের কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ॥"

চৈঃ চঃ অন্ত্যলীলা ১৪শ পরিচ্ছেদ।

অনেক ঘটনাই রঘুনাথ দাসের গৌরস্তব কল্পবৃক্ষ হইতে লইয়াছিলেন। একাধিক বার তিনি রঘুনাথ দাসের গৌরস্তব কল্পবৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"এই লীলা নিজগ্রন্থে রঘুনাথ দাস।
গৌরস্তব কল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ॥"

চৈঃ চঃ অন্ত্যলীলা ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শ্রীরূপ গোস্বামীর পুস্তক হইতে কোন কোন বিবরণ পাইয়াছিলেন—

"প্রলাপ সহিত এ উন্মাদ বর্ণন।
শ্রীরূপ গোঁসাই ইহা করিয়াছে বর্ণন॥"

রঘুনাথ দাসের মুখেও অনেক কথা শুনিয়া থাকিবেন। তাহা হইলেও চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণনা সমুদয়ই শোনা কথা। সে সময়ে

শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে যে সমুদয় কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহা সংগ্রহ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের প্রায় একশত বৎসর পরে এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়। ইহার বহু পূর্ব্বেই বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। সুতরাং এ সময়ের রচনায় যে বহু অলৌকিক ব্যাপার স্থান পাইবে, তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে।

বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণ দাস কবিরাজ ব্যতীত আরও একজন চৈতন্য-ভক্ত তাঁহার জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় পাত্র শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর। ইহার পুস্তক সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় নাটকআকারে লিখিত। নাম চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক। পুস্তকখানি বৃহৎ হইলেও ইহাতে নূতন তথ্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। অধিকন্তু বহুল পরিমাণে কৃত্রিমতা ও কল্পনাতে পরিপূর্ণ। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের সম্পূর্ণ জীবনী নাই। তাঁহার জীবনের কোন কোন অংশ লইয়া দশ অঙ্কে একখানি নাটক লেখা হইয়াছে।

চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে যে সকল বিবরণ আছে, ইহাতে তাহারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। সামান্য সামান্য বিষয়ে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যেমন চৈতন্যদেবের পুরী আগমনের পরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ বিষয়ে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে আগমন করিয়া অতিশয় আগ্রহ-বশে একাকী অগ্রে যাইয়া জগন্নাথ দর্শনের জন্য মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং ভাবাবেগে জগন্নাথের বিগ্রহ আলিঙ্গন করিতে যান। প্রতিহারিগণ তাঁহাকে বাধা দিয়া প্রহার করিতে যায়। সে সময় সার্ব্বভৌম মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বাধা দেন। শ্রীচৈতন্যদেব তখন

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। বহুক্ষণে মূর্চ্ছা অপনোদন হইল না দেখিয়া সার্ব্বভৌম তাঁহাকে সেই অবস্থায় স্বগৃহে লইয়া আসেন। পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হয়। ইত্যবসরে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গিগণ সংবাদ পাইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু—চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গিগণ পুরীতে পৌছিয়া জগন্নাথ দর্শনের সুবিধার জন্য তাঁহাকে লইয়া সার্ব্বভৌমের ভগ্নিপতি তাঁহাদের পূর্ব্বপরিচিত গোপীনাথ আচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার পরামর্শানুসারে তাঁহার সঙ্গে সার্ব্বভৌমের নিকটে যান। জগন্নাথের মন্দিরে মূর্চ্ছা প্রভৃতির কোনই উল্লেখ নাই।

ইহা অপেক্ষা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে চৈতন্য-জীবনী-সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানি বহুদিন অজ্ঞাত ছিল। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে বিশ্বকোষপ্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু একটি প্রাচীন গ্রন্থালয়ে ইহা প্রাপ্ত হন। পুস্তকখানি যে প্রাচীন এবং প্রামাণিক তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। বিশ্বকোষ পুস্তকালয়ে যে পুঁথিখানি রক্ষিত হইয়াছে, তাহা দুইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন। গ্রন্থকার জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের কয়েক বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র শ্রীচৈতন্যের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান বর্দ্ধমান জেলায় আমাইপুর গ্রাম। পুরী হইতে গৌড়ে আগমন সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব একবার সুবুদ্ধি মিশ্রের বাটীতে অতিথি হন। সেই সময়ে তিনি বালক জয়ানন্দের নামকরণ করেন। ইতিপূর্ব্বে জয়ানন্দের মাতা রোদণীর অনেকগুলি সন্তান হইয়া শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেইজন্য দেশপ্রচলিত প্রথামত নবজাত সন্তানের নামকরণাদি করা হয় নাই। তাহাকে "গুইঞা" বলিয়া ডাকা হইত।

শ্রীচৈতন্যদেব "গুইঞা" নাম পরিবর্ত্তন করিয়া শিশুর জয়ানন্দ নাম রাখিলেন। এই শিশু উত্তরকালে নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের আদেশে চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থেই এই সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়।

"অভিরাম গোঁসাঞির পাদোদক প্রসাদে।
পণ্ডিত গোঁসাঞির আজ্ঞা চৈতন্য-আশীর্ব্বাদে॥
বাপ সুবুদ্ধিমিশ্র তপস্যার ফলে।
জয়ানন্দের মন হইল চৈতন্য মঙ্গলে॥
শুক্লা দ্বাদশী তিথি বৈশাখ মাসে।
জয়ানন্দের জন্ম হৈল চৈতন্য-প্রসাদে॥
মা রোদণী ঋষি নিত্যানন্দের দাসী।
যার গর্ভে জন্মিঞা চৈতন্যানন্দে ভাসি॥
খুড়া জ্যেঠা পাষণ্ড চৈতন্যে অল্প ভক্তি।
মহা পাষণ্ড তবু ধরে মহাশক্তি॥"

জয়ানন্দ কেবল কবি নন; সুগায়কও ছিলেন। তিনি স্বরচিত গ্রন্থ গ্রামে গ্রামে গান করিয়া বেড়াইতেন।

"ইবে শঙ্খ চামর সঙ্গীত বাদ্য রসে।
জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল গাএ শেষে॥"

জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল রচনার পূর্ব্বে চৈতন্য-জীবনী-সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছিল, জয়ানন্দ তাহার একটী তালিকা দিয়াছেন।

"সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অবতার।
চৈতন্য চরিত্র আগে করিল প্রচার॥

চৈতন্য সহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে।
সার্ব্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে॥
শ্রীপরমানন্দ পুরী গোঁসাঞি মহাশয়ে।
সংক্ষেপ করিল তঁহ্ গোবিন্দ বিজয়ে॥
আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড করি।
শ্রীবৃন্দাবনদাস রচিল সর্ব্বোপরি॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।
সঙ্গীত প্রবন্ধে তার পদে পদে ধ্বনি॥
সংক্ষেপে করিলেন তিঁহি পরমানন্দ গুপ্ত।
গৌরাঙ্গ বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত॥
গোপাল বসু করিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে।
চৈতন্য মঙ্গল তাঁর চামর বিচ্ছন্দে॥"

এই সকল পুস্তকের সবগুলি এখন পাওয়া যায় না; অবশ্য চৈতন্যচরিতামৃত তখনও রচিত হয় নাই। বর্ত্তমান পুস্তকগুলির মধ্যে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থকে সর্ব্বোচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থখানির নাম তখন চৈতন্যমঙ্গল বা চৈতন্য ভাগবত ছিল তাহা লিখিত হয় নাই। বোধ হয় তখনও তাহার নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল। স্বরূপ, দামোদর বা রঘুনাথ দাসের কড়চার উল্লেখ নাই। অপরদিকে পরমানন্দপুরী কর্ত্তৃক রচিত গোবিন্দবিজয় নামে একখানি পুস্তকের উল্লেখ আছে।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে অনেকগুলি নূতন তথ্য অবগত হওয়া যায়। পুস্তক খানি নয় খণ্ডে বিভক্ত

"প্রথমে আদি খণ্ডে যুগধর্ম্ম কর্ম্ম।
দ্বিতীয়ে নদীয়া খণ্ডে গৌরাঙ্গের জন্ম॥

তৃতীয়ে	বৈরাগ্য খণ্ডে	ছাড়ি গৃহবাস।
চতুর্থে	সন্ন্যাস খণ্ডে	প্রভুর সন্ন্যাস॥
পঞ্চমে	উৎকল খণ্ডে	গেলা নীলাচলে।
ষষ্ঠেতে	প্রকাশ খণ্ডে	প্রকাশ উজ্জ্বলে॥
সপ্তমেতে	তীর্থ খণ্ডে	নানা তীর্থ করি।
অষ্টমে	বিজয় খণ্ডে	গেলা বৈকুণ্ঠপুরী॥
নবমে	উত্তর খণ্ডে	গীত সাঙ্গোপাঙ্গে।
যুগ	অবতার যত	করিলা গৌরাঙ্গে॥"

ইহার মধ্যে নবদ্বীপখণ্ডে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম জীবনের বিস্তৃত বিবরণ আছে। অবশিষ্টাংশ সংক্ষিপ্ত এবং অস্পষ্ট। জয়ানন্দের পুস্তক হইতে জানা যায় যে, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুর গ্রামে বাস করিতেন। সেখানকার তৎকালীন রাজার ভয়ে শ্রীহট্টে জয়পুর গ্রামে গিয়া বাস করেন।

"চৈতন্য গোসাঞের পূর্ব্বপুরুষ ছিল যাজপুরে
শ্রীহট্ট দেশেরে পালায়ে গেলা রাজা ভ্রমরের ডরে"

শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে নবদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র বিপ্লব ও মুসলমান রাজার অত্যাচারের উল্লেখ আছে। সেই সময়ে অনেক লোক নবদ্বীপ ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করে। ইহাদের মধ্যে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একজন—

"বিশারদসুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড় রাজ্য॥"

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে ও বাল্যকালে চৈতন্যদেবের চঞ্চলতার বিবরণ আছে।

"পঢ়িতে পঢ়ুয়া সঙ্গে করিল কন্দল।
গুরুগৃহে ভাঙ্গে কুম্ভ অনেক সকল॥
জলেতে ভাসিল যত পঢ়ুয়ার পুস্তক।
অকথ্য দেখিয়া দিল চৌদিকে রক্ষক॥
কারো দেবমন্দিরে বসিয়া সিংহাসনে।
দেবতাপ্রতিমা নিয়া পোলাএ প্রাঙ্গণে॥
কাহার মন্দির চূড়ে বসিয়া সত্বরে।
গড়াগড়ি দিয়া ভূমে পড়ে বিশ্বম্ভরে॥
আছাড়ের শব্দ যেন হয় ভূমিকম্প।
শদতল তাল যেন বাজে ঘন ডম্ফ॥
কেহো বলে আহা আহা মইল মইল।
এই মত ক্রীড়া করে দ্বিজ শিরোমণি॥
লখিতে না পারে ক্রীড়া জনক জননী॥
কাহার মন্দিরে দেবতার দ্রব্য খাএ।
দ্বারে কপাট দিয়া হাসি গড়ি জায়ে॥"

যে পণ্ডিতের নিকটে তিনি প্রথম শিক্ষালাভ করেন জয়ানন্দের পুস্তক হইতে তাঁহার নাম পাওয়া যায়।

"আর দিন প্রভাতে বালক সব সঙ্গে।
সুদর্শন পণ্ডিতের বাড়ী গেলা নিজ রঙ্গে॥
ক, খ, ৩৪শ অক্ষর কাঠনেতে লিখি।
হামাকুড়ি দিয়া পড়ে গুরুপায়ে দেখি॥"

জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্য দেবের উপনয়নের বয়সও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অষ্টম বর্ষে তাঁহার উপনয়ন হয়। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হইতে জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর দিন ও নিশ্চিত বিবরণ পাওয়া যায়।

"জ্যৈষ্ঠ নিদাঘ কাল কৃষ্ণ অষ্টমী তিথি ।
সেই দিন ভূমিকম্প বারিপূর্ণ ক্ষিতি ॥
মিশ্রপুরন্দর ঘরে হৈলা অচৈতন্য ।
মৃত্যুকাল প্রত্যাসন্ন দেখে সর্ব্ব শূন্য ॥"

শ্রীচৈতন্যদেব তখনও গুরুগৃহে পাঠ করিতেছিলেন। পিতার আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া গঙ্গাতীরে গেলেন ।

"মিশ্রপুরন্দর গঙ্গা অন্তর্জ্জলে রহি ।
প্রবোধিল শচীদেবী ইতিহাস কহি ॥
গুরুগৃহে গৌরাঙ্গ পুস্তক লেখেন যথা ।
রড়দিয়া হরিদাস ঠাকুর গেলা তথা ॥
হরিদাস ঠাকুর বলেন কি পুঁথি লেখহ ।
তোমার বাপ অন্তর্জ্জলে ঝাট গিয়া দেখ ॥
পুঁথি আছাড়িয়া গেলো গঙ্গা অন্তর্জ্জলে ।
করুণা করিয়া কান্দে পিতা করি কোলে ॥"

জয়ানন্দের পুস্তক অনুসারে শ্রীচৈতন্যদেব বিবাহের পূর্ব্বে গয়া গমন করিয়াছিলেন। গয়ার পথে হঠাৎ তাঁহার হৃদয় পরিবর্ত্তনের উল্লেখ নাই। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যদেব বিংশতি বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এইসকল বিষয়ে চৈতন্য-ভাগবতের মতের সঙ্গে তাঁহার মিল নাই। চৈতন্যভাগবতের মত অধিক প্রামাণ্য বলিয়া মনে হয়। জয়ানন্দের মতে শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপ পরিত্যাগের পূর্ব্বে সন্ন্যাস গ্রহণের প্রস্তাব অনেককে জানাইয়াছিলেন। বিশেষতঃ পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে এই সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পথের সঙ্গী জয়ানন্দ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ।

"মুকুন্দ গোবিন্দানন্দ সঙ্গী নিত্যানন্দ।
ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে পার হৈলা গৌরচন্দ্র॥
গঙ্গাপার হৈয়া আগে রৈলা নিত্যানন্দ
মুকুন্দ দত্ত, বৈদ্য গোবিন্দ কর্ম্মকার।
মোর সঙ্গে আইস কাটোয়া গঙ্গা পার॥
আচার্য্যরত্ন চন্দ্রশেখর আচার্য্য হরি।
বসুদেব দত্ত শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত ভগাই গঙ্গাদাস।
তোমা সভা বিদ্যমানে লইব সন্ন্যাস॥"

এখানে দেখা যাইতেছে, জয়ানন্দও গোবিন্দ কর্ম্মকার নামক ভৃত্য শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে গিয়াছিল বলিয়া লিখিয়াছেন। ইহাতে গোবিন্দদাসের কড়চার বিবরণ যে সত্য তাহা প্রমাণিত হয়।

জয়ানন্দ পুরীগমনের পথ বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শান্তিপুর হইতে বহির্গত হইয়া আম্বুয়া, বামে গঙ্গা রাখিয়া কাচমণি বেতড়া দক্ষিণে রাখিয়া কুলীন গ্রাম, দেবনদ পার হইয়া সেয়াখালা দিয়া তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হইলেন, ও স্বর্ণরেখা নদী পার হইয়া বারাসত, দাঁতন, জলেশ্বর, মন্ত্রেশ্বর, আমবদা, বাশদা, রামচন্দ্রপুর পৌছিলেন। তৎপরে রেমুনা, সরোনগর, বাঙ্গালপুর, অসুরগড়, ভদ্রক, ভুবদা, জাজপুর, পুরুষোত্তমপুর, আমড়াল, কটক, কমলপুর, আঠারনালা হইয়া পুরীতে উপস্থিত হয়েন।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক এবং মূল্যবান অংশ শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুর বিবরণ। সাধারণতঃর জীবনচরিত লেখকগণ তাঁহার তিরোধানের কোন উল্লেখ করেন নাই। চৈতন্য-চরিতামৃতে তাঁহার শেষ জীবনের বিস্তৃত বিবরণ আছে, কিন্তু তাঁহার

পরলোক গমনের কোন উল্লেখ নাই। ইহা অতীব বিস্ময়ের বিষয়। হয়ত ভক্তগণের নিকটে ইহা এত শোকাবহ ঘটনা ছিল যে, তাঁহারা ইহার উল্লেখ করিতেন না। অথবা এ বিষয়ে তাঁহাদের কিছু জানা ছিল না। যে কারণেই হউক বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ এ বিষয়ে কিছু লেখেন নাই। জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্তদেবের মৃত্যুর বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে রথযাত্রার সময়ে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার পায়ে ইটের আঘাত লাগে, ক্রমে সেই ক্ষত বৃদ্ধি হইয়া আষাঢ় মাসে শুক্লা সপ্তমী তিথিতে শ্রীচৈতন্তদেব পরলোক গমন করেন।

"নীলাচলে নিশায়ে চৈতন্ত টোটাশ্রমে
আষাঢ় সপ্তমীতিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি।
রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠ পুরী॥
আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয় নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পায়ে আচম্বিতে॥
অদ্বৈত চলিলা প্রাতঃকালে গৌড়দেশে।
নিভৃতে তাঁহার কথা কহিল বিশেষে॥
নরেন্দ্রের জলে সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে।
চৈতন্ত করিল জলক্রীড়া নানারঙ্গে॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্য টোটায়ে শয়ন অবশেষে॥
পণ্ডিত গোঁসাইকে কহিল সর্ব্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা॥
নানাবর্ণে দিব্যমালা আইল কোথা হইতে।
কত বিদ্যাধর নৃত্য করে রাজপথে॥"

রথ আন রথ আন ডাকে দেবগণ।
গরুড়ধ্বজ রথে প্রভু করি আরোহণ॥
মায়ার শরীর তথা রহিল সে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥
অনেক সেবক সর্পদংশ হৈয়া মইলা।
উল্কাপাত বজ্রাঘাত ভূমিকম্প হৈলা॥"

এই সকল কারণে পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল অপেক্ষাও চৈতন্য জীবনী-সম্বন্ধে আর একখানি মূল্যবান পুস্তক আছে। ইহার নাম গোবিন্দদাসের কড়চা। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ আছে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, তিনি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে ছিলেন এবং তৎকালে এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত কড়চা করিয়া লিখিয়াছিলেন।

"না পারি লোকের বুলি সমস্ত বুঝিতে।
যাহা পারি তাহা লিখি আকার ইঙ্গিতে॥
* * * *
দুই চারি বাত কভু প্রভুরে পুছিয়া।
কড়চা করিয়া রাখি মনে বিচারিয়া॥
যেই লীলা দেখিলাম আপন নয়নে।
কড়চা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে॥"

এই কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র পুস্তক অতি মূল্যবান। কিন্তু এই পুস্তকের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে ইহার কোন উল্লেখ নাই। এই দুই

প্রাচীন গ্রন্থে মুরারী গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের কড়চার উল্লেখ আছে কিন্তু গোবিন্দদাসের কড়চা বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। এমন কি শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়ে গোবিন্দদাস নামে কেহ সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই। চৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতার মতে কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে চৈতন্যদেবের সঙ্গে ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন দাক্ষিণাত্যে তীর্থদর্শন গমনে সঙ্কল্প করিলেন তখন নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণ সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব কোন মতে তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন :—

"একাকী যাইব কেহ সঙ্গে না লইব ॥"

অবশেষে ভক্তগণ নিরুপায় হইয়া বলিলেন, তোমার—জলপাত্র বহির্বাস বহিবার জন্য কৃষ্ণদাস নামে এই ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লও :—

"তোমার দুইহস্ত বদ্ধ নাম গণনে।
জলপাত্র বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে ॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
এসব সামগ্রী তোমার কে করে রক্ষণ ॥
কৃষ্ণদাস নামে এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহা সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন ॥
জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমা সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছাকর কিছু না বলিবে ॥
তবে তাঁর বাক্যে প্রভু করি অঙ্গিকারে—
তাঁহা সব লঞা গেল সার্ব্বভৌম ঘরে"

(চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ)

গোবিন্দদাসের কড়চায়ও এইরূপ বিবরণ আছে।

দাক্ষিণাত্য যাত্রার সময়ে ভক্তগণ সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন নিত্যানন্দ কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইতে বলিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব তাহাতেও সম্মত হইলেন না।

"যাত্রার সময়ে নিতাই হইয়া চিন্তিত।
কহিতে লাগিলা বাণী ভক্তিতে বিনীত॥
না যাহ একাকী কহে নিত্যানন্দ রায়।
সঙ্গে সঙ্গে যাই চল মোরা সমুদায়॥
বড় ব্যস্ত যাইতে প্রাণের গদাধর।
প্রেমানন্দ স্বরস্বতী ভারতী শঙ্কর॥
এতশুনি প্রভু মোর ঈষৎ হাসিয়া।
বলে মুহি—একা যাব সঙ্গী না লইয়া॥
অবধৌত নিত্যানন্দ শুনিয়া বচন।
কহিতে লাগিলা করি অশ্রু বরষণ॥
দক্ষিণ যাত্রায় তুমি যাবে অতিদূর।
সঙ্গে যাক কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ঠাকুর॥
পবিত্র হইয়া বিপ্র তাহাই করিবে।
যখন ইহারে যাহা করিতে বলিবে॥"

(গোবিন্দদাসের কড়চা, ৪৮ পৃষ্ঠা)

চৈতন্যদেব যখন এ প্রস্তাবেও সম্মত হইলেন না তখন ভক্তগণ গোবিন্দদাসকে সঙ্গে লইতে বলিলেন।

"সেই কথা শুনি সবে বলিতে লাগিল।
তব সঙ্গে দাস তব গোবিন্দ চলিল॥

এতশুনি প্রভু মোর কন হাসি হাসি।
গোবিন্দের সঙ্গ আমি বড় ভালবাসি ॥
যে যাক্ সে নাহি যাক্ গোবিন্দ যাইবে।
আমার যে কার্য্য তাহা গোবিন্দ করিবে ॥"

(গোবিন্দ দাসের কড়চা, ৪৮ পৃষ্ঠা

এই দুই বিবরণের মধ্যে কোনটী ঠিক তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। চৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঘটনার বহু পরে লোকমুখে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাসের কড়চা যদি বাস্তবিকই শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গীর লেখা হয় তাহা হইলে তল্লিখিত বিবরণই অধিক প্রামাণ্য। কিন্তু সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয় নাই। উত্তরকালে গোবিন্দ নামে একজন ভৃত্য সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে থাকিতেন। চৈতন্য চরিতামৃতে তাহার উল্লেখ আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, এই গোবিন্দদাস পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য পর্য্যটন করিয়া যখন পুরীতে প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন ঈশ্বরপুরী তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য স্বীয় ভৃত্যকে প্রেরণ করেন। এই বিবরণ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। ইহার পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী চৈতন্যদেবের কোন সংবাদ লন নাই। হঠাৎ তাঁহার সেবার জন্য আপনার ভৃত্য পাঠাইবেন, তাহা মনে হয় না। ইহা অপেক্ষা দাক্ষিণাত্য পর্য্যটনের সঙ্গী গোবিন্দদাস পুরী অবস্থানকালে তাঁহার প্রিয়ভৃত্য হইবেন, তাহা অধিকতর যুক্তি সঙ্গত মনে হয়। দীর্ঘকাল বিদেশে সঙ্গে থাকায় সে চৈতন্যদেবের প্রিয় হইয়া থাকিবে। কড়চায় গোবিন্দদাস আপনার নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়াছেন।

"বর্দ্ধমানে কাঞ্চননগরে মোর ধাম।
শ্যামাদাস পিতৃনাম গোবিন্দ মোর নাম॥
অস্ত্র হাতা বেড়ী গড়ি জাতিতে কামার।
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার॥
আমার নারীর নাম শশীমুখী হয়।
একদিনে ঝগড়া ক'রে মোরে কটু কয়॥
নির্গুণে মূরখ বলি গালি দিলা মোরে।
সেই অপমানে গৃহ ছাড়িলাম ভোরে॥"

(গোবিন্দদাসের কড়চা)

গৃহ হইতে বাহির হইয়া গোবিন্দ দাস কাটোয়ায় আসিলেন। সেখানে আসিয়া চৈতন্যদেবের নাম শুনিলেন। চৌদ্দশতত্রিশশকে এই ঘটনা হয়। তখন নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যদেবের নামসংকীর্ত্তনে তোলপাড় হইয়া যাইতেছে। সেকথা লোকমুখে কাটোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকিবে। গোবিন্দদাস এই সংবাদ পাইয়া নবদ্বীপ যাইতে মনস্থ করিলেন। সারাদিন পথ চলিয়া পরদিন প্রাতে নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন।

"নদীয়ার নীচে গঙ্গা নাম মিশ্র ঘাট।
আনন্দ বাড়িল হেরে নদীয়ার পাট॥
ডাহিনে বাগদেবী নদী কুলুকুলু স্বরে।
সকলের আনন্দ লাগিয়া গান করে॥
শ্রীবাস অঙ্গন হয় ঘাটের উপরে।
প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় তাহার নীয়ড়ে॥
বল্লাল রাজার বাড়ী তাহার নিকটে।
ভাঙ্গা চূয়া প্রমাণ আছয়ে তাহার বটে॥

ঘাটে বসি কতখানা হইতেছে মনে।
হেনকালে শ্রীচৈতন্য আইলেন স্নানে॥
কটিতে গামছা বাঁধা আশ্চর্য্য গঠন।
সঙ্গে এক অবধূত প্রফুল্ল বদন॥
তিন চারি সঙ্গী আরো নাচিতে নাচিতে।
স্নানে নামিলেন প্রভু গঙ্গার গর্ভেতে॥"

গোবিন্দ দাস তীরে বসিয়া তাঁহাদের জলকেলি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

"আশ্চর্য্য প্রভুর রূপ হেরিতে লাগিনু।
রূপের ছটায় মুতি মোহিত হইনু॥
স্নান করি গোরাচাঁদ উঠিল ডাঙ্গায়।
কুটিল কুন্তল রাশি পৃষ্ঠেতে লোটায়॥
শুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় অঙ্গের বরণ।
নীল পদ্মদল সম সুদীর্ঘ নয়ন॥
সুন্দর কপোল যুগ প্রশস্ত ললাট।
সহজে চলিলে দেখায় নাটোয়ার নাট॥"

* * *

"হরি বলি অশ্রুপাত করে মোর গোরা।
পিচকারি ধারা সম বহে অশ্রু ধারা"

যেরূপ ও যে ভাব দেখিয়া শত শত নরনারী মোহিত হইয়াছিলেন, সদ্যগৃহত্যাগী গোবিন্দদাসও তাহাতে মুগ্ধ হইবেন আশ্চার্য্য কি!

"ঘাটে বসি এই লীলা হেরিনু নয়নে।
কি জানি কেমন ভাব উপজিল মনে॥

কদম্ব কুসুম সম অঙ্গে কাঁটা দিল।
থর থরি সব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল॥
ঘামিয়া উঠিল দেহ তিতিল বসন।
ইচ্ছা অশ্রুজলে মুহি পাখালি চরণ॥"

সঙ্গীগণসঙ্গে চৈতন্যদেব পথে যাইতে যাইতে বার বার গোবিন্দদাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। গোবিন্দদাস আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া একেবারে চৈতন্যদেবের চরণে গড়াইয়া পড়িলেন। চৈতন্যদেব প্রেমভরে তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। গোবিন্দদাস নিজের পরিচয় দিয়া এবং গৃহত্যাগের কারণ বলিয়া তাঁহার চরণে আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন।—

প্রেমের সাগর চৈতন্যদেব তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া সঙ্গে লইলেন।

"এই বাত শুনি প্রভু বলিলা আমারে।
থাকরে গোবিন্দ তুমি আমার আগারে॥
আমার গৃহেতে তব হইবে পালন।
প্রত্যহ করিবে সুখে নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
প্রতিদিন সুখে পাবে কৃষ্ণের প্রসাদ।
একেবারে পূরিবে মনের সব সাধ॥
সেবার কর্ম্মেতে তুমি নিয়ত থাকিবে।
গঙ্গাজল তুলসী আনিয়া জোগাইবে॥
প্রসাদ পাইবে নিত্য উদর পূরিয়া।
রসা শাক্ শুক্তা মোচার ঘণ্ট দিয়া॥
এত বলি সঙ্গে প্রভু চাহে লইবারে।
অমনি চলিনু মুহি প্রভুর সংসারে॥"

সেই হইতে গোবিন্দদাস চৈতন্যদেবের অনুচর হইলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ সময়ে গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে যান এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সেবা করেন। সুতরাং দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গোবিন্দদাসের শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গী হওয়া অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অপরদিকে কৃষ্ণদাস নামে কোনও ব্রাহ্মণ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে দীর্ঘকাল শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গী হইয়া পথের ক্লেশ ও বিপদের অংশভাগী হইয়া থাকিলে নিশ্চয়ই চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাহার একটি চিরস্থায়ী সম্বন্ধ হইয়া যাইত এবং উত্তরকালে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত, কিন্তু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ব্যতীত অপর কোথাও কৃষ্ণদাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। অপরদিকে চৈতন্যদেবের উত্তর জীবনে গোবিন্দদাস নামে একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই গোবিন্দদাস কড়চার গোবিন্দদাস হওয়ারই সম্ভাবনা। এই বিবরণ অতি স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। আমরা ইচ্ছা করিয়াই গোবিন্দদাসের নিজের কথায় তাঁহার পরিচয় দিয়াছি। এই বিবরণে এমন একটী অকৃত্রিমতার ছাপ রহিয়াছে যে, ইহা কোন আলকারীর লেখা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। গোবিন্দদাসের কড়চার প্রতি পংক্তিতে এই প্রকার স্বাভাবিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি স্বচক্ষে লিখিত বিষয় না দেখিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা এরূপ লেখা সম্ভব নয়। আমরা পাঠকগণের বিচারের জন্য আরও কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। চৈতন্যদেবের নবদ্বীপের বাড়ীর যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা দেখা যাউক :—

"গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর।
পাঁচখানি বড় ঘর দেখিতে সুন্দর॥
নগরের দক্ষিণ সীমায় প্রভুর বাস।
হরিনামে মত্ত প্রভু সদাই উল্লাস॥

প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় নীয়ড়ে তাহার।
কেহ কেহ বলে যারে বল্লাল সাগর॥"

অথবা শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর এই বিবরণ দেখা যাউক :—

"শান্তমূর্ত্তি শচী দেবী অতি খর্ব্বকায়।
নিমাই নিমাই বলি সদা ফুকরায়॥
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হন প্রভুর ঘরণী।
প্রভুর সেবায় ব্যস্ত দিবস রজনী॥
লজ্জাবতী বিনয়িনী মৃদু মৃদু হাস।
মুই হইলাম গিয়া চরণের দাস॥"

অথবা কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের এই বিবরণ দেখা যাউক :—

"পরদিন প্রাতে প্রভু সিনান করিলা॥
আঁচলে নয়ন চাপি কাঁদে নারীগণ।
ঝরঝর অশ্রুধারা করে বরিষণ॥
কেহ বলে রূপের বালাই নিয়ে মরি।
কেমনে ইহার মাতা রবে প্রাণ ধরি॥

* * *

এমন আশ্চর্য্য রূপ কভু দেখি নাই।
কেমনে কৌপীন দণ্ড ধরিবে নিমাই॥
পাষাণে গঠিত হয় কেশব ঠাকুর।
কেমনে মুড়িবে কেশ বড়ই নিষ্ঠুর॥
নারীগণ এইরূপে কত কথা বলে।
হেনকালে প্রভু মোরে ডাকিলা কৌশলে॥
প্রভুবলে দ্রব্য যত আনহ ত্বরিতে।
মুণ্ডন করিব কেশ সন্ন্যাস করিতে॥

আর না রহিব ঘরে বন্ধন দশায় ।
নরক যন্ত্রণা গৃহে কথায় কথায় ॥
এই কথা শুনি শুদ্ধ সত্ত্ব গদাধর ।
অবধূত নিত্যানন্দ শ্রীচন্দ্র শেখর ॥
সন্ন্যাসের উপযুক্ত বিবিধ সম্ভার ।
আনিয়া পূরিল সবে সন্ন্যাসীর ভাণ্ডার ॥
দেবা নামে নাপিতেরে ডাকিয়া আনিল ।
বিল্ববৃক্ষ তলে আসি নাপিত বসিল ॥
নাপিতে বলিলা তবে চৈতন্য গোসাঁই ।
মুণ্ডন করহ দেব ব্রজে চলে যাই ॥
ভারতীর আজ্ঞা পেয়ে নাপিত তখন ।
বসিলা নীয়ড়ে গিয়া করিতে মুণ্ডন ॥
যখন নাপিত শেষে কেশে ক্ষুর দিলা ।
অমনি রমণীগণ ফুকারি উঠিলা ॥
নারীগণ বলে নাপিত একাজ করোনা ।
এমন চুলের গোছা মোড়াইয়া ফেলনা ॥
এই বলি কাঁদিয়া উঠিল নারীগণ ।
মুণ্ডন করিতে দেবা লাগিল তখন ॥
হাজার হাজার লোক সন্ন্যাস দেখিতে ।
কণ্টক নগরে সবে লাগিলা আসিতে ॥
দিবসের শেষভাগে মোড়াইয়া কেশ ।
ধরিলা নিমাই তবে সন্ন্যাসীর বেশ ॥
দণ্ড কমুণ্ডল হাতে কৌপীন পরিল ।
কাষায় বসনে পুনঃ তাহা আবরিল ॥

দাঁড়াইলা ভারতীর সম্মুখে গোসাঁই।
রূপে দিক আলো কইলা বলিহারী যাই॥"

এই সব বিবরণ যিনি স্বয়ং চক্ষুতে না দেখিয়াছেন তাঁহার লেখা সম্ভব নয়। আলোচ্য পুস্তক হইতে এই প্রকার বহু বিবরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যাহার উপরে স্বাভাবিকতা ও অকৃত্রিমতার ছাপ সুস্পষ্ট রহিয়াছে।

গোবিন্দদাসের কড়চায় অনেকস্থলে স্থান ও কাল সুস্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। যেমন সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য কাটোয়ায় যাত্রার দিন :—

"পৌষমাস সংক্রান্তি সন্ধ্যার সময়ে।
ফিরিয়া আইল প্রভু আপন আলয়ে॥"

অথবা পুরী হইতে দাক্ষিণাত্যে যাত্রার দিন :—

"তিনমাস কাল মোর চৈতন্য গোসাঁই।
পুরীতে রহিলা সঙ্গে করিয়া নিতাই॥
তারপর বৈশাখের সপ্তম দিবসে।
দক্ষিণে করিলা যাত্রা ভাসি প্রেমরসে॥"

কাটোয়ায় বিল্ববৃক্ষতলে সন্ন্যাসগ্রহণের বিবরণ পূর্ব্বেই পাইয়াছি। ত্রাজোরে ধনেশ্বর নামক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গৃহে নিম্নলিখিত বিবরণ লওয়া যাইতে পারে।

"ধনেশ্বর নামে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
তাঞ্জোরে থাকেন করি কৃষ্ণের সেবন॥
রাধা কৃষ্ণ মূর্ত্তি আছে তাঁহার মন্দিরে।
সেখানে মোর গোরা গেল ধীরে ধীরে॥
ধনেশ্বর ব্রাহ্মণের অঙ্গিনার মাঝে।
প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ তথায় বিরাজে॥

তথি রহে বহুতর বৈষ্ণব সন্ন্যাসী।
যে স্থান দেখিলে হয় গৃহস্থ উদাসী॥
গো সমাজ শিব রহে তার বা মাঝারে।
শিব দরশন কৈল প্রভু অনুরাগে॥
তাহার নীয়ড়ে ছিল রম্য সরোবর।
পথ দেখাইয়া দিল বিপ্র ধনেশ্বর॥"

এই সকল বিবরণ সচক্ষে দেখা ভিন্ন লেখা সম্ভব মনে হয় না।

গোবিন্দদাসের কড়চার বিবরণ স্থানে স্থানে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কোন আধুনিক লেখক জাল করিয়া প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে এই প্রকার পার্থক্য করিতে সাহস করিতেন না। তিনি নিশ্চয়ই পূর্ব্বরচিত গ্রন্থের অনুসরণ করিতেন। গোবিন্দদাসের কড়চায় দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বিবরণ সাধারণতঃ চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণ অপেক্ষা বিস্তৃত ও পূর্ণতর। সেই বিবরণ চৈতন্যদেবের সঙ্গী ভিন্ন আর কাহারও লেখা সম্ভব নয়। উত্তরকালে অপর কোনও লোক এই সকল স্থান পর্য্যটন করিয়া এই পুস্তক লিখিয়াছেন তাহা সমীচীন মনে হয় না।

এতদ্ভিন্ন আর একটী গভীরতর কথা আছে। গোবিন্দদাসের কড়চায় অলক্ষিতে শ্রীচৈতন্যদেবের মহত্ত্ব যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, চৈতন্য-ভাগবতে বা চৈতন্যচরিতামৃতে তেমন হয় নাই। বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ উভয়েই চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং সেই বিশ্বাসে স্ব স্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উভয় গ্রন্থেই শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। গোবিন্দদাসের কড়চায় সেরূপ কথা নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-দেবের কার্য্য ও ব্যবহারের এমন অনেক বিবরণ রহিয়াছে যাহাতে

তাঁহার মহত্ত্ব অধিকতর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কড়চার লেখকও চৈতন্যদেবকে মহাপুরুষ এবং হয়ত কৃষ্ণের অবতার বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু সে বিশ্বাস চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতার বিশ্বাসের মত সুস্পষ্ট এবং যুক্তিমূলক হয় নাই। এই লেখক পরবর্ত্তীকালের হইলে তাঁহার লেখায় নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব আরও স্পষ্টতর হইত।

গোবিন্দদাসের কড়চায় প্রামাণিকতার বিষয়ে ইহার ভাষা কিছু সংশয় উৎপাদন করে। কড়চার ভাষা চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃতের ভাষা হইতে বিভিন্ন প্রকারের এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেই সময়ে বাঙ্গালাভাষা একটি স্থায়ী ছাঁচে দাঁড়ায় নাই; ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের ভাষায় অনেক পার্থক্য দেখা যায়। বৃন্দাবন দাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইঁহারা উভয়েই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহাদের ভাষা তৎকালীন পণ্ডিত সমাজের প্রচলিত ভাষা। গোবিন্দদাস অশিক্ষিত কর্ম্মকারের ভৃত্য, তিনি সাধারণ লোকের প্রচলিত ভাষায় আপনার কড়চা লিখিয়া গিয়াছেন। সে ভাষার সঙ্গে আধুনিক ভাষার অধিকতর সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব নহে। গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি ও তর্ক উত্থাপন করা হইয়াছে, সেগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত বিচার করিয়াও আমরা এই গ্রন্থখানির প্রমাণিকতায় সন্দিহান হইতে পারি নাই। অপর দিকে ইহার জীবন্ত বিবরণ সুস্পষ্ট স্বাভাবিকতা প্রভৃতি দেখিয়া পুস্তকখানি সমসাময়িক সঙ্গীর লিখিত বলিয়া মনে হইয়াছে। গোবিন্দদাসের কড়চা ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় জীবনীই লোক মুখে শোনা কথা হইতে লিপিবদ্ধ। লেখকগণ কেহই শ্রীচৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎভাবে জানিতেন না। যে সময়ে গ্রন্থগুলি রচিত হয় তাহার পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য-

দেব শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া পূজিত হইতে আরম্ভ হইয়াছেন। সাধারণ লোকে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করিতেন। ঈশা প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের চরিতাখ্যায়কদিগের ন্যায় জীবনচরিত লেখকগণ সরলভাবে সেগুলি বিশ্বাস এবং গ্রহণ করিয়াছেন।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ব্যতীত উক্ত নামের আর একখানি চৈতন্যজীবনী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রচয়িতা লোচন দাস বা ত্রিলোচন দাস ১৫২৩ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী কোগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার গুরু নরহরি সরকারের আদেশে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য অতি সামান্য। ইহাতে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে নূতন তথ্য বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু কাব্যাংশে গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট এবং পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত কাল্পনিক ও অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। সম্ভবতঃ গ্রন্থখানি সঙ্গীত পুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইত; গায়কগণ বৈষ্ণবমণ্ডলীর নিকটে ঐ পুস্তক গান করিয়া বেড়াইতেন। লোচন দাস শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা উল্লেখ যোগ্য। তাঁহার বর্ণনা অনুসারে আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথি রবিবার বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে গুঞ্জা মন্দিরের ভিতরে জগন্নাথ দর্শন করিতে গিয়া শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথের গাত্রে লীন হইয়া যান। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী-সম্বন্ধে এইগুলি প্রাচীন এবং অল্পাধিক পরিমাণে মৌলিক গ্রন্থ। কিন্তু এইগুলিকে বর্ত্তমান সময়ে আমরা যাহাকে জীবনচরিত বলি, সম্পূর্ণরূপে তাহা বলা যায় না। অন্ধ বিশ্বাসের যুগে অনুরাগী ভক্তগণ জনশ্রুতি হইতে লিখিলে যেরূপ হয় এই গুলিতেও তাহাই হইয়াছে। সেণ্ট ম্যাথু, সেণ্ট জন প্রভৃতি লিখিত মহাত্মা

ঈশার জীবনীর ন্যায় শ্রীচৈতন্যদেবের এই জীবনীগুলিতে অনেক অতি প্রাকৃত, অলৌকিক কল্পনাসম্ভূত বিবরণ আছে। অনেক স্থলে এই সকল গ্রন্থের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ এবং স্থানে স্থানে এক গ্রন্থেও স্ববিরোধী কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দোষ সত্ত্বেও এই পুস্তকগুলি বহু মূল্যবান। শ্রীচৈতন্যের জীবনী সম্বন্ধে এইগুলি আমাদের আদিম অবলম্বন। বর্ত্তমান উন্নত বিচারমূলক প্রথানুসারে এই সকল গ্রন্থ হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের প্রকৃত বিবরণ অনেক পরিমাণে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে ষ্ট্রাউস (Straus), রেনান, (Renan) ফ্যারার (Farar) প্রভৃতি যেমন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে মহাত্মা ঈশার বিচারমূলক জীবনী রচনা করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধেও সেইরূপ করা সম্ভব। কিন্তু এই পর্য্যন্ত সেইরূপ জীবনী লেখা হয় নাই। ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্রসেনের সময় হইতে বঙ্গদেশে ও ভারতবর্ষে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়াছে। আধুনিক সময়ে এই সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তকও রচিত হইয়াছে তবে সেইগুলিতেও বর্ত্তমান সময়ের বিচারমূলক প্রণালী (higher critical method) অনুসৃত হয় নাই। বর্ত্তমান পুস্তকে আমরা কিয়ৎপরিমাণে উক্ত প্রণালী অনুসারে শ্রীচৈতন্যের জীবনী সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবন।

চৌদ্দশত সাত শকে (১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে) ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিনে নবদ্বীপ গ্রামে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র; মাতা শচী দেবী। জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট দেশের লোক; সম্ভবতঃ বিদ্যাশিক্ষার জন্য নবদ্বীপে আসেন এবং সেখানে অবস্থিতি করেন। সে সময়ে এইরূপে শ্রীহট্টদেশের অনেক লোক নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেন। লোকে ইহাদিগকে শ্রীহট্টিয়া বলিয়া বিদ্রুপ করিত, নবদ্বীপ বহুকাল হইতে জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্রস্থল ছিল। সেখানে বহু পণ্ডিত বাস করিতেন; এতদ্ভিন্ন গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এইজন্য নানা স্থান হইতে বহুসংখ্যক লোক বিদ্যাশিক্ষা বা গঙ্গাবাসের জন্য নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিত। সে সময়ে নবদ্বীপ বোধ হয় একটী বড় গণ্ডগ্রাম ছিল। ভক্তিরত্নাকর নামক বৈষ্ণব গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের পঞ্চাশ বৎসর পরবর্ত্তী সময়ের নবদ্বীপের যে বিবরণ দেওয়া আছে, তাহাতে নবদ্বীপকে যোজন বিস্তৃত জনপদ বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা পরবর্ত্তীকালের ভক্তলেখকের নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য বাড়াইবার চেষ্টাপ্রসূত অতিরঞ্জন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামকে নবদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নবদ্বীপের আয়তন বর্দ্ধিত করিয়াছেন। সে সকল গ্রাম এখনও বর্ত্তমান আছে; কিন্তু সেগুলি নবদ্বীপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং দূরে দূরে অবস্থিত। সম্ভবতঃ সে সময়েও এইরূপ ছিল, তবে প্রকৃত নবদ্বীপও সম্ভবতঃ সুবিস্তৃত ছিল। সেখানে বিভিন্ন জাতীয় বহু লোকের বাস ছিল এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে

পরিচিত ছিল। শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র যে অংশে বাস করিতেন, তাহা মায়াপুরী নামে অভিহিত ছিল। সম্ভবতঃ ইহা নগরের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীর নিকটে বল্লাল সাগর নামে একটী প্রশস্ত দীঘি ছিল। বোধ হয় ইহার অনতিদূরে বল্লালসেনের প্রাচীন রাজবাটী ছিল; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মকালে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের মাতা শচী দেবী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা; সম্ভবতঃ উনি স্থানীয় সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত ছিলেন। অনেক স্থলেই ইহার নামে চৈতন্যদেবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বোধ হয় শ্রীহট্টবাসী যুবক জগন্নাথ মিশ্র বিদ্যাশিক্ষার জন্য নবদ্বীপে আসিয়া নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া নবদ্বীপেই বাস করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের সময়ে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জীবিত ছিলেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, চৈতন্যদেবের জন্মের পর গণনা করিয়া তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের কথা বলিয়াছিলেন। বোধ হয় ইহার অল্প দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়, কেননা বৈষ্ণবগ্রন্থে আর তাঁহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। জগন্নাথ মিশ্র ধার্ম্মিক এবং উদারচরিত্র লোক ছিলেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা বোধ হয় স্বচ্ছল ছিল না। চৈতন্যভাগবতে একাধিক স্থানে জগন্নাথ মিশ্রের দারিদ্র্যের উল্লেখ আছে। গোবিন্দদাসের কড়চায় শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পূর্ব্বে তাঁহার বাড়ীর যে বর্ণনা আছে, তাহা নিতান্ত দারিদ্র্যের পরিচায়ক নহে।

"গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর।
পাঁচ খানি বড় ঘর দেখিতে সুন্দর॥" (কড়চা)

হইতে পারে, শ্রীচৈতন্যদেব বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থার কিছু উন্নতি-

সাধন করিয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্র সুপণ্ডিত ছিলেন এবং পুরন্দর আখ্যা পাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের মাতা শচী দেবী উচ্চশ্রেণীর রমণী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। চৈতন্য ভাগবতে তাঁহার এইরূপ বিবরণ আছে।

"তান পত্নী শচী-নাম মহা-পতিব্রতা।
মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা॥"

চৈতন্যদেবের অল্প বয়সেই জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর শচী দেবী বিশেষ দক্ষতার সহিত গৃহকার্য্য ও সন্তানের শিক্ষা সম্পন্ন করেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পর তিনি যেরূপ সহিষ্ণুতার সহিত পুত্রবিচ্ছেদ সহ্য করিয়াছিলেন তাহা অতি মহত্ত্বের পরিচায়ক। শচী দেবী দেখিতে অতি খর্ব্বকায় ছিলেন, কিন্তু অতি শান্ত ও গম্ভীর মূর্ত্তি।

"শান্তমূর্ত্তি শচী দেবী অতি খর্ব্বকায়" (গোবিন্দদাসের কড়চা)

চৈতন্যদেব তাঁহার পিতামাতার পরিণত বয়সের শেষ সন্তান। ইতিপূর্ব্বে শচী দেবীর অনেকগুলি সন্তান জন্মের অল্পকাল পরেই গতাসু হয়।

"বহু কন্যা-পুত্রের হইল তিরোভাব।
সবে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ খ ২য় অধ্যায়)

চৈতন্যচরিতামৃত ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণব গ্রন্থে আটটি কন্যার জন্ম ও অকালমৃত্যুর কথা লিখিত আছে; কিন্তু সম্ভবতঃ পুরাণোল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বে দেবকীর অষ্ট কন্যার জন্ম ও মৃত্যুর অনুকরণে এই প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের সময়ে বিশ্বরূপ নামে তাঁহার একমাত্র অগ্রজ জীবিত ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স

সাত আট বৎসর হইবে। চৈতন্যদেবের সাত আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নিরুদ্দেশ হন।

অন্যান্য মহাপুরুষদিগের ন্যায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম সময়ে নানা অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা বৈষ্ণবগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার জন্মদিনে চন্দ্রগ্রহণ ছিল। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ লিখিয়াছেন গ্রহণোপলক্ষে লোকে যখন হরিধ্বনি করিতেছিল সেই সময়ে শচীদেবী নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় এই পুত্র প্রসব করেন। ভক্তগ্রন্থকারগণ লিখিয়াছেন জন্মের সময় হইতে চৈতন্যদেবের হরিনামে অনুরাগ ছিল। শিশু যখন কাঁদিত, হরিনাম করিলেই তাহার ক্রন্দন থামিয়া যাইত। এ সমুদায় পরবর্ত্তী কবিকল্পনা মাত্র। বাল্যকালে চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী ধর্ম্মানুরাগ বা মহত্ত্বের কোন পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, বরং তাঁহার ঔদ্ধত্য ও দুর্ব্বৃত্ততারই বিবরণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তাঁহার জন্ম ও বাল্যকালে কোন বিশেষত্ব লক্ষিত হয় নাই। পিতামাতার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান বলিয়া এবং তাহার পূর্ব্বে অনেকগুলি সন্তানের মৃত্যু হওয়ার জন্য শৈশবে কিছু অতিমাত্র আদর পাইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য অল্প বয়সে চৈতন্যদেব কিছু উদ্ধত ছিলেন; কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহা চলিয়া গিয়াছিল। যথা সময়ে নামকরণ প্রভৃতি সংস্কার হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃত নাম বিশ্বম্ভর। বাল্যকালে রমণীরা তাঁহাকে নিমাই নামে ডাকিতেন। উত্তরকালেও এই ডাক নাম প্রচলিত ছিল। যে নামে তিনি সচরাচর প্রসিদ্ধ তাহা সন্ন্যাস কালে প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের অপভ্রংশ। এতদ্ভিন্ন দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন বলিয়া সম্ভবতঃ বাল্যকাল হইতেই অনেকে তাঁহাকে গৌরাঙ্গ বা গৌর বলিয়া ডাকিত। বৈষ্ণবজীবনচরিত লেখকগণ চৈতন্যদেবের বাল্যকালেও অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা লিখিয়াছেন

আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহার দুই একটী উল্লেখ করিতেছি। সময়ে সময়ে গৃহমধ্যে নূপুর ধ্বনি শোনা যাইত, কিন্তু শিশুর পায়ে নূপুর ছিল না। কোথা হইতে নূপুরের শব্দ আসিতেছে কেহ বুঝিতে পারিত না। ঘরের মেঝেতে ধ্বজ, বজ্রাঙ্কুশ সংযুক্ত পদ চিহ্ন দেখা যাইত। এবং শিশুর চারিমাস বয়ঃক্রম কালে একদিন তাহাকে গৃহমধ্যে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু সে উঠিয়া হাঁড়ী কলসী প্রভৃতি তৈজস দ্রব্য ভাঙ্গিয়াছিল। শচীদেবী ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শিশু যেমন শুইয়াছিল তেমনই শুইয়া আছে, লোকে মনে করিল কোন দানব আসিয়া এইরূপ করিয়াছে। এই সকল বিবরণের মূল্য কি, বর্ত্তমান সময়ে তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। বাল্যকালের আরও দুইটী ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিশু একদিন পথে বেড়াইতেছিল; তাহার অঙ্গে কিছু অলঙ্কার ছিল, তাহা দেখিয়া দুইটী চোর শিশুকে লইয়া চলিয়া যায়; উদ্দেশ্য এই যে, বাড়ী গিয়া তাহার অলঙ্কার অপহরণ করিবে; কিন্তু তাহারা বহু পথ ঘুরিয়া শিশুকে লইয়া পুনরায় জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে পিতামাতা শিশুর অদর্শনে অতিশয় শঙ্কিত হইয়াছিলেন। পুনরায় শিশুকে গৃহদ্বারে দেখিয়া বিস্মিত ও অতিহৃষ্ট হইলেন। আর একদিন একজন তৈর্থিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথি হন। মিশ্র পুরন্দর গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার আহারের আয়োজন করিলেন। ব্রাহ্মণ আহারে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিজ অভীষ্ট দেবতা গোপালকে অন্ন নিবেদন করিতেছেন, এমন সময়ে কোথা হইতে শিশু নিমাই আসিয়া সেই অন্ন ভোজন করিতে আরম্ভ করিল। অন্ন উচ্ছিষ্ট হওয়ায় ব্রাহ্মণের আর আহার হইল না। জগন্নাথ মিশ্র আসিয়া বালকের এই ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মারিতে গেলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিষেধ

করিলেন, বলিলেন, অবোধ বালক কিছু বোঝে না উহাকে মারিয়া কি হইবে। জগন্নাথ মিশ্র অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া পুনর্ব্বার রন্ধন করাইয়া ব্রাহ্মণের আহারের আয়োজন করিলেন। কিন্তু এবারেও ঠিক সেইরূপ হইল। জগন্নাথ মিশ্র মহা দুঃখিত হইলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইয়া থাকে; আজ বোধ হয় আমার ভাগ্যে আহার নাই; আপনি দুঃখিত হইবেন না, আমি পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই, সব দিন আহার হয় না, আজ ফলমূল খাইয়াই থাকি। জগন্নাথ মিশ্র তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি অনেক অনুনয় করিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণের আহারের আয়োজন করিলেন। এবার শিশুকে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া জগন্নাথ মিশ্র দ্বারে বসিয়া রহিলেন, ব্রাহ্মণ আহারে বসিলে সকলে মায়ানিদ্রায় অভিভূত হইল; তাঁহার নিকট গোপাল প্রকাশিত হইয়া সব রহস্য বলিলেন। ব্রাহ্মণ জানিলেন এই বালক স্বয়ং গোপাল। এই প্রকার বিবরণ সে উত্তর কালের ভক্ত কবিদিগের অন্ধ ভক্তিমূলক কল্পনাপ্রসূত তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। চৈতন্যভাগবতে এই প্রকার অলৌকিক ব্যাপারের বিবরণ অধিক। অন্যান্য গ্রন্থকারগণ সম্ভবতঃ চৈতন্যভাগবত হইতেই তার কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন। আরও দেখা যায় যে, শৈশবেই এই প্রকার বিবরণের বাহুল্য; কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইলে আর এরূপ দেখা যায় না। তখন বালকের দুর্দ্দান্ততারই বহু বিবরণ পাওয়া যায়। লোকের বাড়ী গিয়া ফলমূল এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য চুরি করিয়া খাওয়া, কনিষ্ঠ খেলার সঙ্গীদিগকে প্রহার করা; গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থী-দিগকে উত্ত্যক্ত করা, পূজার্থীদিগের শিবলিঙ্গ পুষ্পাদি চুরি করা প্রভৃতি বহু অন্যায় কার্য্যের বিবরণ আছে। কখন বা আকাশে পাখী উড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া বালক নিমাই বলিত আমাকে পাখী ধরিয়া দাও;

কখন বা আকাশের চাঁদ দেখিয়া বলিত আমাকে চাঁদ ধরিয়া দাও। একবার একাদশীর দিনে আবদার করিয়া বলিল যে, জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবত একাদশীর পারণ করিতেছেন তাঁহাদের গৃহে যে সব নৈবেদ্য প্রস্তুত হইয়াছে তাহাই আমাকে আনিয়া দিতে হইবে। পিতামাতা এই প্রস্তাবে মহাবিপদে পড়িলেন। সম্ভবতঃ কোন প্রতিবেশীর মুখে সেই কথা শুনিয়া বৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরা কিছু খাবার পাঠাইয়া দিলেন।

ভক্ত লেখকেরা অবশ্য তাহাতেই তাঁহার মহত্ত্ব দেখিয়াছেন, কিন্তু অনুমান হয় বাল্যে চৈতন্যদেব অতিশয় চপল ও উদ্ধত ছিলেন। পিতামাতাকেও বিশেষ ভয় করিতেন বলিয়া মনে হয় না, একমাত্র অগ্রজ বিশ্বরূপকে ভয় করিতেন। বিশ্বরূপ তখন অধ্যয়ন করিতে ছিলেন; অল্প বয়সেই তাঁহার গভীর ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। অদ্বৈত প্রমুখ বৈষ্ণবগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাকে ডাকিবার জন্য বালক নিমাই অদ্বৈতগৃহে যাইত। এই সূত্রে নবদ্বীপের বৈষ্ণবগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তৎকালীন প্রথানুসারে বিশ্বরূপের বিবাহের বয়স হইলে, পিতামাতা তাঁহার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই বিশ্বরূপের অন্তরে সংসারে বিরাগ জন্মিয়াছিল, তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় গৃহসুখে লিপ্ত হইবেন না, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, পিতামাতা তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন জানিতে পারিয়া কাহাকে কিছু না বলিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তৎপরে তাঁহার আর কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় না; সম্ভবতঃ তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এইরূপ জনশ্রুতি ছিল যে, তিনি সন্ন্যাসের পর শঙ্করারণ্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় স্বভাবতঃই জগন্নাথ

মিশ্র ও তাঁহার পত্নী দারুণ ব্যথা পাইয়াছিলেন; তাঁহারা অনেক সময়ে পুত্রের বিরহে খেদ করিতেন। বালক বিশ্বম্ভরের জীবনেও এই ঘটনায় পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। এখন হইতে তাঁহার পূর্ব্ব চাঞ্চল্য দূর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, সম্ভবতঃ পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নিজের ব্যবহার সংযত করিতেন। এই সময়ে বিশ্বম্ভরের বয়স কত হইয়াছিল ঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ সাত আট বৎসর হইবে। এই ঘটনায় যে তাঁহার চরিত্রের স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশ্বম্ভর সঙ্কল্প করিলেন যে, তিনি পিতামাতার নিকট থাকিয়া নিজ ব্যবহারের দ্বারা পিতামাতাকে সুখী করিবেন, কিন্তু সে সঙ্কল্প রক্ষা হয় নাই।

ইতিপূর্ব্বেই বিশ্বম্ভরের শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। চঞ্চল হইলেও বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্যভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন।

"দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি যায়।
পরম বিস্মিত হই সর্ব্বগণে চায়॥
দিন-দুই-তিনে লিখিলেন সর্ব্বফলা।
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নাম মালা॥" (চতুর্থ অধ্যায়)

দুঃখের বিষয় তাঁহার শিক্ষার ইচ্ছানুরূপ বিবরণ পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ যদি এ বিষয়ে অধিকতর তথ্য সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেন তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের বিবরণ অতি অসম্পূর্ণ। উত্তর জীবনে চৈতন্যদেবের যে গভীর এবং বিস্তৃত জ্ঞানের আভাষ পাওয়া যায়, অল্প বয়সে নবদ্বীপে তাহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমান জীবনচরিতসমূহে কিন্তু তাহার যথেষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রচলিত প্রথানুসারে

ন্যূনাধিক পঞ্চম বর্ষে হাতে খড়ি দিয়া কোন শিক্ষকের নিকট পাঠান হইয়া থাকিবে। কয়েক বৎসর বিবিধ চপলাতার মধ্যে যথাসম্ভব অধ্যয়নাদি করিয়াছিলেন। অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের পর হইতে শিক্ষায় বেশী মনোযোগ দিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

"যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
তদবধি প্রভু কিছু হইলা সুস্থির॥
নিরবধি থাকে পিতা-মাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরিয়ে যেন জননী-জনকে॥
খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করিবারে।
তিলার্দ্ধেকো পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে॥"

(চৈ, ভা, আ, খ, ৫ম)

সে সময়ে নবদ্বীপে অনেক টোল ছিল। এই সকল টোলে বিদ্বান পণ্ডিতগণ এক এক বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেন। সাধারণ শিক্ষায় কিছু অগ্রসর হইলে জগন্নাথ মিশ্র বিশ্বম্ভরকে গঙ্গাদাস কবিরাজের টোলে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। গঙ্গাদাস কবিরাজ ব্যাকরণ শাস্ত্রে মহা পণ্ডিত ছিলেন। বিশ্বম্ভর ইহার নিকটে অধ্যয়ন করিয়া ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। অল্পদিনে গঙ্গাদাসের ছাত্রগণের মধ্যেও তিনি প্রধান স্থান অধিকার করিলেন,—এতদ্ভিন্ন নবদ্বীপের সকল ছাত্রের মধ্যে বিশ্বম্ভর শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তখন ভিন্ন ভিন্ন টোলের ছাত্রদের মধ্যে সর্ব্বদাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত। দুই টোলের ছাত্রের সাক্ষাৎ হইলেই অধীত বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে প্রশ্নাদি চলিত; বিশেষতঃ গঙ্গার ঘাটে ছাত্রগণ যখন স্নান করিতে আসিত, তখন মহাতর্ক বাধিয়া যাইত। এক টোলের ছাত্র অপর টোলের ছাত্রদিগকে

প্রশ্ন করিত; তাহারা তাহার উত্তর দিত; অন্যেরা তাহার ভুল ধরিত। এইরূপে বাদানুবাদ চলিত; ক্রমে মুখের তর্ক হইতে গায়ে জল ছড়ান, বালি দেওয়া, অবশেষে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইত। এই প্রকার তর্কে বিশ্বম্ভরের সঙ্গে কেহই পারিয়া উঠিত না। অধ্যাপক গঙ্গাদাস কবিরাজ তাঁহার দ্রুত উন্নতি দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া বলিতেন, এইপ্রকার উন্নতি হইতে থাকিলে অচিরে তুমি ভট্টাচার্য্য হইবে। বিশ্বম্ভর অন্যত্র উদ্ধত হইলেও অধ্যাপকের নিকটে গভীর শ্রদ্ধাশীল ও বিনয়ী ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

"গুরু বলে "বাপ! তুমি মন দিয়া পড়।
ভট্টাচার্য্য হৈবা তুমি, বলিলাঙ দড়॥
প্রভু বোলে "তুমি আশীর্ব্বাদ কর যারে।
ভট্টাচার্য্য-পদ কোন্ দুর্ল্লভ তাহারে"॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৬ষ্ঠ)

ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। শ্রীচৈতন্যদেবের অসামান্য ধীশক্তি যখন যে দিকে নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহাতেই আশ্চর্য্য ফল প্রসব করিয়াছিল, সকলেই তাঁহার অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার অদ্ভুত উন্নতি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কথিত আছে, জগন্নাথ মিশ্র ইহাতে শঙ্কিত হইয়া কিছুদিন তাঁহার পাঠ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ভয় হইল অল্প বয়সে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া বিশ্বরূপ যেমন গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন এ পুত্রও বা তাই করে। এই ভাবিয়া, তিনি বলিলেন বিশ্বম্ভরের আর পড়িয়া কাজ নাই। শচীদেবী প্রথমে এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই, কিন্তু স্বামীর নির্ব্বান্ধাতিশয্যে শেষে সম্মত হইলেন, বিশ্বম্ভরের পাঠ বন্ধ হইল, কিন্তু ইহার ফলে তাহার পূর্ব্বের দুর্ব্বৃত্ততা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। বিশ্বম্ভর ঘরে বাহিরে নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল।

লোকেও জগন্নাথ মিশ্রের দোষ দিতে লাগিল তখন তিনি বিশ্বম্ভরকে পুনরায় অধ্যয়ন করিতে দিলেন। গঙ্গাদাস কবিরাজ ভিন্ন আর কোনও অধ্যাপকের নিকট বিশ্বম্ভর শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ নাই। গঙ্গাদাস কবিরাজ ব্যাকরণ শাস্ত্রেই বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আর কোনও বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেন কিনা জানা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেব ব্যাকরণ ভিন্ন দর্শন, বেদান্ত, ভাগবত আদিতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। এই সকল বিষয় তিনি কোথায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবগ্রন্থে তাহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্য তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভাই তাঁহার অদ্ভুত উন্নতির প্রধান কারণ। তথাপি নিশ্চয়ই প্রথমে কোথাও শিক্ষালাভ করিয়া থাকিবেন।

ক্রমে তিনি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। ঠিক কোন্ সময়ে জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যু, তাহা জানা যায় না। তবে মনে হয় চৈতন্যদেবের অল্প বয়সেই তিনি পরলোক গমন করেন। কেননা খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাত্মা ঈশার ন্যায় শ্রীচৈতন্যদেবও পিতা অপেক্ষা মাতার নামেই অধিক পরিচিত; সম্ভবতঃ বিশ্বম্ভরের টোলে ভর্ত্তি হওয়ার অল্পদিন পরেই জগন্নাথ মিশ্র পরলোকে গমন করেন। অন্ততঃ ইহার পরে আর তাঁহার উল্লেখ দেখা যায় না। পিতার মৃত্যুতে বিশ্বম্ভরের চরিত্রে আরও গাম্ভীর্য্য আসিয়াছিল। পতি বিয়োগে শচীদেবী শোকে অভিভূভ হইয়াছিলেন। মাতার দুঃখে বালক বিশ্বম্ভর বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং তাহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেন। এখন সংসার-সাগরে মাতা ও পুত্র মাত্র পরস্পরের সম্বল। গৃহস্থালীর ব্যয়ভারের চিন্তাও তাঁহাদিগকে নিপীড়িত করিয়া থাকিবে। কারণ তাঁহাদের নিয়মিত আয় ছিল বলিয়া মনে হয় না। ব্রাহ্মণ

পরিবার, লোকে যাহা দান করিত তাহারই উপরে নির্ভর ছিল। প্রথমে অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ন্যাস ও তৎপরে পিতার মৃত্যুতে বিশ্বম্ভরের বাল্যজীবনের ঔদ্ধত্য অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তথাপি পিতৃবিয়োগের পরেও সময়ে সময়ে তাঁহার গুরুতর ঔদ্ধত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। একটী ঘটনা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। একদিন বিশ্বম্ভর স্নানের সময়ে মায়ের নিকটে তৈল ও বিষ্ণুপূজার মালা প্রভৃতি চাহিলেন, শচীদেবী তৈল দিয়া বলিলেন একটু অপেক্ষা কর। মালা আনিয়া দিতেছি। এই কথায় বিশ্বম্ভর ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। এখনও মালা আনা হয় নাই বলিয়া লাঠি হস্তে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাঁড়ী, কলসী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিল। চাল, ডাল প্রভৃতি গৃহমধ্যে যে সমুদায় জিনিস ছিল, সমুদায় ছড়াইয়া ফেলিল। তাহাতেও ক্রোধের শান্তি হইল না। আর কোন জিনিস না পাইয়া মাটিতে লাঠি মারিতে লাগিল। অবশেষে ক্রোধে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। ইহা ঠিক কোন সময়ের কথা বলা যায় না। তবে তখন বেশ বয়স হইয়াছে মনে হয়। যাহা হউক ইহা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র। বোধ হয় এরূপ ঘটনা সচরাচর হইত না। ক্রোধ শান্ত হইলে আহারের পর অপরাহ্নে মাতা যখন বুঝাইয়া বলিলেন যে,এরূপ করিয়া জিনিস পত্র নষ্ট করিলে; কাল কি রন্ধন হইবে সে কথা ভাবিলে না। তখন বিশ্বম্ভর নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া বলিল "মা ভাবিও না, কৃষ্ণ সকলের পালনকর্ত্তা, তিনিই ব্যবস্থা করিবেন।" লিখিত আছে সন্ধ্যাকালে পাঠ সমাপন করিয়া বিশ্বম্ভর নির্জ্জনে গঙ্গাতীরে গিয়াছিল এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মায়ের হস্তে দুই তোলা স্বর্ণ দিয়া তাহার দ্বারা গৃহস্থালীর ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে বলিল। ইতিপূর্ব্বেও মধ্যে মধ্যে এই প্রকারে তিনি সোণা

আনিয়া মাকে দিতেন। শচী দেবী স্বভাবতঃ তাহাতে চিন্তিত হইতেন, ভাবিতেন নিমাই সোণা কোথা পায় এবং সাবধানে লোকের দ্বারা যাচাই করাইয়া তাহা ভাঙ্গাইতে দিতেন।

বিশ্বম্ভর যখন অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করিলেন তখন তাঁহার বয়স সপ্তদশ কি অষ্টাদশ—বৎসরের অধিক হইবে না। ঠিক সময় নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই,—আমাদিগকে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে। চব্বিশ বৎসর বয়সে শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন; একথা বৈষ্ণব গ্রন্থে নানা স্থানে উল্লেখ আছে। তৎপূর্ব্বে এক বৎসর নবদ্বীপে বৈষ্ণবগণের সঙ্গে কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে গয়া গমন করেন এবং তাহারও পূর্ব্বে দুইবার বিবাহ হয়। অপরদিকে ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালেও তিনি গঙ্গাদাস কবিরাজের নিকটে পড়িতে যাইতেন উল্লেখ আছে। সুতরাং সপ্তদশ বা অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি স্বাধীন ভাবে অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করেন, মনে করা যাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বেই গঙ্গাদাস কবিরাজের টোলে প্রধান ছাত্ররূপে তিনি কিছু কিছু অধ্যাপনা করিতেন। বোধ হয় তৎকালে এইরূপই প্রথা ছিল। টোলের ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা অগ্রগামী, তাঁহাদের উপরে অধস্তন কতকগুলি ছাত্রের শিক্ষার ভার দেওয়া হইত। বিশ্বম্ভরের উপরেও এইরূপ ভার দেওয়া হইয়া থাকিবে। বয়স অল্প বলিয়াই হউক; অথবা তাঁহার দাম্ভিকতার জন্যই হউক কোন কোন ছাত্র তাঁহার নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইত। মুরারী গুপ্ত নামে একজন ছাত্র গঙ্গাদাস কবিরাজের টোলে পড়িতেন। ইনি বয়সে বিশ্বম্ভরের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার নিকটে কোন শিক্ষা লইতে স্বভাবতঃই ইচ্ছা করিতেন না। বিশ্বম্ভর তাহাতে তাঁহাকে বিদ্রুপ করিয়া বিরক্ত করিতেন।

"প্রভুস্থানে পুঁথি নাহি চিন্তে যে যে জনে।
তাহারে সে প্রভু কদর্থেন অনুক্ষণে॥
পড়িয়া বৈসেন প্রভু পুঁথি চিন্তাইতে।
যার যত গণ লইয়া বৈসে নানা ভিতে॥
না চিন্তে মুরারীগুপ্ত পুঁথি প্রভু স্থানে।
অতএব প্রভু কিছু চালেন তাঁহানে॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৭ম অধ্যায়)

এই মুরারী গুপ্তের সঙ্গে অনেক সময়েই বিশ্বম্ভরের বাদপ্রতিবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। যখন তখনই বিশ্বম্ভর তাঁহাকে ব্যাকরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন এবং প্রকৃত উত্তর না পাইলে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেন। মুরারী গুপ্ত জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। সুতরাং তাঁহার জাতি উল্লেখ করিয়া বলিতেন; ব্যাকরণ পাঠ ছাড়িয়া গিয়া রোগী দেখ।

"প্রভু বলে বৈদ্য! তুমি ইহা কেনে পড়।
লতাপাতা নিঞা গিয়া রোগী কর দঢ়॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষয়ের অবধি।
কফ-পিত্ত-অজীর্ণ-ব্যবস্থা নাহি ইথি॥

(চৈঃ ভাঃ, আঃ ৭ম অধ্যায়)

অপর দুইজন বৈষ্ণব ভক্ত মুকুন্দ দত্ত ও পণ্ডিত গদাধরের সঙ্গেও প্রথম জীবনে এইরূপ ব্যবহারের উল্লেখ আছে। মুকুন্দ দত্তকেও ব্যাকরণের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন। মুকুন্দ সহজেই হারিয়া যাইতেন। একদিন মুকুন্দ ভাবিলেন ইনি ব্যাকরণের পণ্ডিত। ব্যাকরণে ইঁহার সঙ্গে পারিয়া উঠি না। এবার তর্ক করিতে আসিলে অলঙ্কারের প্রশ্ন করিব। কিন্তু অলঙ্কারের বিচারেও মুকুন্দ বিশ্বম্ভরের সঙ্গে পারিয়া

উঠিলেন না। এইরূপে ন্যায়শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত গদাধরকেও বিশ্বম্ভর ন্যায়ের প্রশ্নে পরাস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অন্যান্য ছাত্রদেরও বিশ্বম্ভর এই প্রকারে উত্যক্ত করিতেন। উত্তরকালে মুরারী গুপ্ত প্রভৃতি বৈষ্ণবমণ্ডলীতে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ তাঁহাদের বিষয়ে লিখিয়াছেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপনার সময়ে চৈতন্যদেব যে অতিশয় দাম্ভিক ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক ক্রমে তিনি স্বাধীনভাবে অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। মুকুন্দ সঞ্জয় নামে এক ব্যক্তির বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। সেখানে বিশ্বম্ভরের টোল হইল। বিশ্বম্ভর মুকুন্দ সঞ্জয়ের পুত্রকে পড়াইতেন এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য ছাত্রদিগকেও পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। সম্ভবতঃ অল্পদিনের মধ্যেই বহু ছাত্র জুটিয়া ছিল। শিক্ষা কার্য্যে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল বলিয়া মনে হয়। অধ্যয়নসময়ে সহাধ্যায়ী ছাত্রদের প্রতি যেরূপ কটাক্ষ করিতেন এখন সমসাময়িক অধ্যাপক-দিগের প্রতি সেই প্রকার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতেন।

"কথোরূপে ব্যাখা করে কথো বা খণ্ডন।
অধ্যাপক প্রতি সে আক্ষেপ সর্ব্বক্ষণ॥
প্রভু কহে সন্ধিকার্য্য জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার॥
হেনজন দেখি ফাঁকি বলুক আমার।
তবে জানি ভট্ট, মিশ্র পদবী সভার॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ খঃ ৭ম অধ্যায়)

চৈতন্যদেব যে সাধারণ অধ্যাপক অপেক্ষা অনেক উচ্চশ্রেণীর ছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কয়েক বৎসরকাল মাত্র তিনি অধ্যাপনা কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারই মধ্যে তিনি

ব্যাকরণের টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। এখন তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। কথিত আছে, উত্তরকালে তিনি নিজেই অহঙ্কারোদ্দীপক জ্ঞানে স্বরচিত সমুদায় পুস্তকাদি নষ্ট করিয়াছিলেন।

অধ্যাপনা আরম্ভের অল্পদিন পরেই বল্লভাচার্য্য নামক নবদ্বীপবাসী একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত চৈতন্যদেবের প্রথম বিবাহ হয়। তখনও প্রচলিত প্রথানুসারেও বিশ্বম্ভরের বিবাহে বয়স হয় নাই বলিয়া মনে হয়। যখন শচীদেবীর নিকট প্রথম এই প্রস্তাব উত্থাপিত করা হয়, তখন তিনি বলেন "এখন বিবাহের সময় হয় নাই। ছেলে আরও লেখাপড়া করুক পরে দেখা যাইবে।"

"আই বলে পিতৃহীন বালক আমার।
জীউক পড়ুক আগে তবে কার্য্য আর॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ খঃ ৭ম অধ্যায়)

কিন্তু বিশ্বম্ভর বোধ হয় পূর্ব্ব হইতে এই কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। মনে হয় গঙ্গার ঘাটে স্নানের সময় বালিকাকে দেখিয়াছিলেন ও তাহার রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মাতাকে প্রকারান্তরে স্বীয় মনোভাব জানাইলে শচীদেবী তৎপর হইয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। কন্যার পিতা রূপ, গুণ, কুল, শীলে এমন যোগ্য পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ প্রস্তাব আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সত্য সত্যই নিজের দারিদ্রের জন্য অথবা পাত্রের আগ্রহ দেখিয়া বলিলেন, আমি কিছু দিতে পারিব না। কেবলমাত্র পঞ্চ হরীতকী দিয়া কন্যা সম্প্রদান করিব। শচীদেবী তাহাতে সম্মত হইলেন। অল্প দিনের মধ্যে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। পুত্রের বিবাহে পতিহীনা শচীদেবী অতিশয় আনন্দিত হইলেন। জীবনে তিনি অনেক শোক ও আঘাত পাইয়াছিলেন। এই সময়ে অল্প কিছুদিন তাঁহার গৃহ

আনন্দময় হইয়াছিল। নববধূ অতি সুশীলা ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার নাম লক্ষ্মীদেবী। বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ তাঁহাকে লক্ষ্মীর অবতারই বলিয়াছিলেন।

"প্রভু পার্শ্বে লক্ষ্মী হইলেন বিদ্যমান।
শচীগৃহ হৈল পরম জ্যোতির্ধাম॥
নিরবধি দেখে শচী কি ঘর বাহিরে।
পরম অদ্ভুত জ্যোতি লখিতে নাজারে॥
কখন পুত্রের পাশে দেখে অগ্নিশিখা।
উটচিয়া চাহিতে না পায় আর দেখা॥
কমল পুষ্পের গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে পায়।
পরম বিস্মিত আই চিন্তেন সদায়॥
আই চিন্তে বুঝিলাঙ কারণ ইহার।
একন্যায় অধিষ্ঠান আছে কমলার॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ খঃ ৭ম অধ্যায়)

যাহা হউক এ সময়টী শচীদেবীর জীবনে পরম সুখের হইয়াছিল। এখন পূর্ব্বাপেক্ষা আর্থিক স্বচ্ছলতাও হইয়াছিল। "পূর্ব্বপ্রায় দরিদ্রতা দুঃখ নাঞি।" শচীদেবী সুলক্ষণা পুত্রবধূর গুণেই এই পরিবর্ত্তন হইয়াছে মনে করিলেন। সম্ভবতঃ অধ্যাপনায় বিশ্বম্ভরের খ্যাতি বিস্তৃত হওয়ায় এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দান ও দক্ষিণা পাইতেছিলেন। গৃহে স্নেহময়ী মাতা ও নব পরিণীতা বধূ, শিক্ষা স্থানে বহু অনুরক্ত শিষ্য, পণ্ডিত সমাজে সম্মান ও সুখ্যাতি এই সমুদায়ে চৈতন্যদেবের জীবনের এই সময়টী অতিশয় সুখেরই হইয়া থাকিবে। চৈতন্য-ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস তাঁহার এ সময়ের যে চিত্র দিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।

"এই মত গুপ্তভাবে আছে বিপ্ররাজ।
অধ্যয়ন বিনা আর নাহি কোন কাজ॥
জিনিঞা কন্দর্প কোটীরূপ মনোহর।
প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্য সুন্দর॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ান।
অধরে তাম্বুল দিব্যবাস পরিধান॥
সর্ব্বদাই পরিহাস মূর্ত্তি বিদ্যা বলে।
সহস্র পড়ুয়া সঙ্গে যবে প্রভু চলে॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে ত্রিভুবনের পতি।
পুস্তকের রূপে করে প্রিয়া সরস্বতী॥
নবদ্বীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নাম।
যে আসিয়া বুঝিবেক প্রভুর ব্যাখান॥
সবে এক গঙ্গাদাস মহা ভাগ্যবান।
যাঁর ঠাঁই করে প্রভু বিদ্যার আদান॥
সকল সংসারী লোক বোলে ধন্য ধন্য।
এনন্দন যাঁহার তাঁহার কোন দৈন্য॥
যতেক প্রকৃতি দেখে মদন সমান।
পাষণ্ডীরে দেখে যেন যম বিদ্যমান॥
পণ্ডিত সকল দেখে যেন বৃহস্পতি।
এই মত দেখে সবে যার যেনমতি॥"

(চৈঃ, ভাঃ, আঃ, খঃ, (৭ম অধ্যায়)

এই সময়ে শ্রীচৈতন্য প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া অধ্যাপনা করিতেন। তৎপরে ছাত্রদিগের

সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইতেন। স্নানান্তে বিষ্ণুপূজা করিয়া আহার করিতেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার অধ্যাপনা করিতে যাইতেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ছাত্রদের লইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া উন্মুক্ত আকাশতলে বসিতেন। বায়ু সেবন হইত এবং সেই সঙ্গে শাস্ত্রালাপও চলিত। সম্ভবতঃ অন্যান্য অধ্যাপকেরাও এই প্রকার করিতেন। নবদ্বীপে তৎকালে এইরূপ প্রথা ছিল। অধ্যাপক বিশ্বম্ভর এক একদিন বাজারে বাহির হইতেন। তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যবসায়ীদিগের দোকান হইতে জিনিষপত্র লইতেন,অনেক সময় মূল্য দিতেন না। দোকানদারেরা বলিত আপনার যখন সুবিধা হবে মূল্য দিবেন, না হয় দিবেন না। বৈষ্ণব গ্রন্থে যে প্রকার বর্ণনা আছে তাহা দোকানদারদিগের পক্ষে প্রশংসার বিষয় হইলেও বিশ্বম্ভরের পক্ষে অনিন্দনীয় মনে হয় না। শ্রীধর নামক এক দরিদ্র দোকানদারের সঙ্গে সর্ব্বদা কলহ হইত। সে থোড়, খোলা, কলা, মুলা বিক্রয় করিত। বিশ্বম্ভর প্রায়ই আসিয়া একপ্রকার জোর করিয়াই থোড়, কলা লইয়া যাইতেন।

"প্রভু বলে আমি তোমা না ছাড়ি এমনে।
কি আমারে দিবা তাহা বোলো এইক্ষণে॥
শ্রীধর বলেন আমি খোলা বেচি খাই।
ইহাতে কি দিব তাহা বলহ গোসাঁই॥
প্রভু বলে যে তোমার পোঁতা ধন আছে।
সে থাকুক এখনে পাইব তাহা পাছে॥
এবে কলা মুলা থোড় দেহো কড়ি বিনে।
দিলে আসি কন্দল না করি তোমা সনে॥
মনে গণে শ্রীধর উদ্ধত বিপ্রবর।
কোন দিন আমারে কিলায় পাছে দঢ়॥

মারিলেও ব্রাহ্মণের কি করিতে পারি।
কড়ি বিনে প্রতিদিন দিবারেও নারি॥
তথাপিহ বলে ছলে যে লয় ব্রাহ্মণে।।
সে আমার ভাগ্য সে দিবাঙ প্রতিদিনে॥
চিন্তিয়া শ্রীধর বলে শুনহ গোসাঞি।
কড়ি পাতি তোমার কিছুই দায় নাঞি॥
থোড় কলা মূলা খোলা দিব এই মনে।
সবে আর কন্দল না কর আমা সনে॥
প্রভু বলে ভাল ভাল আর দ্বন্দ্ব নাই।
সবে থোড় কলা মূলা ভাল যেন পাই॥"

(চৈঃ, ভাঃ, আঃ, খঃ, ৮ম অধ্যায়)

উত্তরকালে এই শ্রীধর শ্রীচৈতন্যদেবের একজন অতিশয় অনুরাগী হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবমণ্ডলীতে ইনি খোলা-বেচা শ্রীধর নামে প্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ সেসময়ে সকল অধ্যাপকেরা ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে এই প্রকার জোর জুলুম করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইতেন। তাহারাও কতকটা ভক্তিতে কতকটা বা ভয়ে বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাইতেন। নবদ্বীপে এবং দেশের সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যথেষ্ট সমাদর ছিল। বিশেষতঃ যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ছিলেন তাঁহাদিগকে সকলেই অতিশয় সম্মান করিতেন। অল্পদিনের মধ্যে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর এইপ্রকার শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এই প্রকারে অতি সুখে তাঁহাদের দিন অতিবাহিত হইতেছিল, কিন্তু সহসা এক অনর্থ উপস্থিত হইল। একদিন আচম্বিতে বিশ্বম্ভরের বায়ুরোগ দেখা দিল। তিনি অলৌকিক শব্দ করিতে লাগিলেন ; কখন

বা ভূমিতে গড়াগড়ি দেন কখন বা ঘর ভাঙ্গেন, থাকিয়া থাকিয়া হুহুঙ্কার করিয়া উঠেন। সম্মুখে যাহাকে দেখেন তাহাকেই মারিতে যান; এক একবার শরীর অবশ হইয়া স্তম্ভাকৃতি হয়, আবার এক একবার এমন মূর্চ্ছা যান যে দেখিয়া প্রাণবিয়োগ হইয়াছে বলিয়া ভয় হয়। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ আরও লিখিয়াছেন যে তিনি বলিতে লাগিলেন,"আমি সকল লোকের ঈশ্বর; আমি বিশ্ব ধারণ করি, সেইজন্য আমার নাম বিশ্বম্ভর। আমি সেই—আমাকে কেহ চিনিল না।" এই শেষ কথা কতদূর সত্য বলা যায় না। যাহা হউক অবস্থা দেখিয়া বন্ধুগণ অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। বুদ্ধিমন্তখাঁ, মুকুন্দসঞ্জয় প্রভৃতি পৃষ্ঠপোষকগণ আসিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। মস্তকে বিষ্ণুতৈল, নারায়ণতৈল প্রভৃতি মর্দ্দন করা হইতে লাগিল। তৈলদ্রোণে তাঁহাকে নিমজ্জিত করিয়া রাখা হইল। কতদিন এই অবস্থা ছিল জানা যায় না, বোধ হয় অল্প দিনেই আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব জীবন-চরিত-রচয়িতারা ইহাকে রোগ বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু এ সময়ে সত্য সত্যই তাঁহার রোগ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক সুস্থ হইয়া তিনি পূর্ব্বের মত অধ্যাপনাদি করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে নবদ্বীপে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিলেন। তিনি হাতী, ঘোড়া সঙ্গে লইয়া দোলায় চড়িয়া মহাসমারোহে দেশেদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। যেখানে যান পণ্ডিতগণকে বিচারে আহ্বান করেন এবং বিচারে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া জয়পত্র লিখাইয়া লন। অনেকস্থানে পণ্ডিতেরা তাঁর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেও সাহস করিতেন না। বিনা বিচারে জয়পত্র লিখিয়া দিতেন। লোকে বলিত তাঁহার জিহ্বায় সরস্বতী অধিষ্ঠান করিয়াছেন। বিচারে কেহ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে আসিয়া

মহাদম্ভসহকারে ঘোষণা করিলেন যে-কেহ সাহস করেন তাঁহার সঙ্গে বিচারে অগ্রসর হউন, নতুবা সকলে মিলিয়া জয়পত্র লিখিয়া দিন। অধ্যাপক-মণ্ডলীতে মহা ত্রাস পড়িয়া গেল। কেহ তাঁহার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতেছেন না। নবদ্বীপ দেশের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান। যদি অধ্যাপকেরা পরাস্ত হন নবদ্বীপের গৌরব অন্তর্হিত হইবে। এই ভয়ে সকলেই পশ্চাৎপদ। দিগ্বিজয়ী মহাদম্ভে নগরে বাস করিতেছেন। বিশ্বম্ভর অন্য দিনের ন্যায় সন্ধ্যাকালে ছাত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন। আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়াছে। চন্দ্রালোকে বিশ্বম্ভরের তরুণকান্তি আরো মনোমুগ্ধকর হইয়াছে। তাঁহার বিশাল দেহ, উন্নত ললাট, সিংহগ্রীব, চাঁচরকেশ, নয়নে প্রতিভার জ্যোতি; স্মিতমুখে অবলীলাক্রমে শিষ্য-গণের সঙ্গে শাস্ত্রালাপন করিতেছেন। এমন সময়ে দিগ্বিজয়ী সেই পথ দিয়া গঙ্গাদর্শনে যাইতেছিলেন। বিশ্বম্ভরকে দেখিয়া দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। নিকটস্থ কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ইনি নিমাই পণ্ডিত। গঙ্গাদর্শনান্তর বিশ্বম্ভর সমীপে আগমন করিলেন। তিনি সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। ভদ্রোচিত সাধারণ বাক্যালাপের পর বিশ্বম্ভর দিগ্বিজয়ীকে বলিলেন শুনিয়াছি আপনি মহাকবি। গঙ্গার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছু কবিতা পাঠ করুন। দিগ্বিজয়ী সগর্ব্বে দ্রুতবেগে একশত শ্লোক অনর্গল বলিয়া গেলেন। ছাত্রগণ শুনিয়া অবাক হইল। দিগ্বিজয়ী স্বীয়পাঠ সমাপন করিলে বিশ্বম্ভর শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী শ্লোকের ব্যাখা করিলে বিশ্বম্ভর প্রথমে তাঁহার রচনা কৌশল ও পাণ্ডিত্যের বহু প্রশংসা করিলেন, কিন্তু পরে রচনার অনেক ক্রটী দেখাইলেন দাম্ভিক দিগ্বিজয়ী সত্য সত্যই আপনার ভুল বুঝিতে পারিলেন এবং এই তরুণ যুবকের নিকটে পরাস্ত হইলেন

ভাবিয়া লজ্জায় ম্রিয়মান হইলেন। ছাত্রগণ দিগ্বিজয়ীর পরাভবে হাস্য করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু—বিশ্বম্ভর তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া দিগ্বিজয়ীকে আশ্বাস দিয়া মিষ্টবাক্যে বলিলেন অদ্য আপনি গৃহে গমন করুন, কল্য আবার বিচার হইবে। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ লিখিয়াছেন রাত্রিতে স্বপ্নযোগে সরস্বতী দিগ্বিজয়ীর নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি যাঁহার নিকটে পরাস্ত হইয়াছেন তিনি স্বয়ং ভগবান। কাহারও সাধ্য নাই যে, ইঁহার সম্মুখে দাঁড়ান। সুতরাং দিগ্বিজয়ীর দুঃখিত হইবার কারণ নাই। প্রভাতে উঠিয়া দিগ্বিজয়ী বিশ্বম্ভরের নিকটে গিয়া প্রণাম করিলেন। তিনিও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। দিগ্বিজয়ী রাত্রির স্বপ্নের কথা জানাইয়া বলিলেন আপনি স্বয়ং ঈশ্বর; আমায় কৃপা করুন। এসকল স্পষ্টই উত্তরকালের ভক্তদের কল্পনাপ্রসূত অত্যুক্তি। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনায় সম্পূর্ণ ঐক্যও দৃষ্ট হয় না। চৈতন্যভাগবতে পূর্ব্ববঙ্গ গমনের পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ী পরাভবের বিবরণ আছে; কিন্তু চরিতামৃতে পূর্ব্ববঙ্গগমনের পরে এই ঘটনা হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, এসকল বিষয়ে তাঁহাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল না। যাহা হউক মূল বিষয়টি সত্য বলিয়া মনে হয়। এই সময়ে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়াছিলেন এবং প্রাচীন অভিজ্ঞ অধ্যাপকেরা সন্ত্রস্ত হইলেও নবীন যুবক বিশ্বম্ভর তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় বিশ্বম্ভরের যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল এখন তিনি নবদ্বীপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

"সর্ব্ব নবদ্বীপে সর্ব্বলোকে হইল ধ্বনি।
নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি॥

বড় বড় বিষয়ী সকল দোলা হতে।
নামিয়া করেন নমস্কার বহুমতে॥
প্রভু দেখি মাত্র জন্মে সভার সাধ্বস।
নবদ্বীপে হেন নাহি যে না হয় বশ॥
নবদ্বীপে যারা যত ধর্ম্ম কর্ম্ম করে।
ভোজ্য বস্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভু ঘরে॥"

(চৈঃ, ভাঃ, আঃ, খঃ, ১০ম অধ্যায়)

এই সময়ে তিনি একবার পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। ঠিক কোন্ স্থানে গিয়াছিলেন এবং উদ্দেশ্যই বা কি ছিল ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ কেবলমাত্র লিখিয়াছেন যে তিনি বঙ্গদেশে পদ্মাবতী তীরে গমন করিয়াছিলেন। পদ্মার কোন্ অংশে গিয়াছিলেন এবং পদ্মা পার হইয়াছিলেন কি না তাহাও নির্দ্দেশ করা যায় না। মনে হয় পদ্মাপারও হন নাই, পশ্চিমপারে কোনও স্থানে ছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই পূর্ব্ববঙ্গেও তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের কোন্ কোন্ টোলে তাঁহার রচিত ব্যাকরণের টিপ্পনী পড়ান হইত। অধ্যাপক বিশ্বম্ভর আসিয়াছেন শুনিয়া অনেক ব্রাহ্মণ উপহার লইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এবং বলিলেন আমাদের বহুভাগ্যে আপনার এখানে আগমন হইয়াছে। অর্থব্যয় করিয়া নবদ্বীপে যাওয়া সম্ভব হয় না। আপনি যখন আসিয়াছেন অনুগ্রহ করিয়া আমাদের কিছু শিক্ষা দেন। আমরা আপনার টিপ্পনী পাঠ করিয়াছি এখন স্বয়ং আপনার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব। বিশ্বম্ভর এই প্রস্তাবে আনন্দিত হইলেন। সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্যেই তিনি আসিয়াছিলেন। পদ্মাতীরে কিছুকাল অবস্থান করিয়া সমাগত ছাত্রদিগকে

শিক্ষা দিলেন। ন্যূনাধিক দুই মাস এখানে ছিলেন বলিয়া মনে হয়। চৈতন্যভাগবতকার লিখিয়াছেন।

"হেন কৃপাদৃষ্টো প্রভু করেন ব্যাখান।
দুই মাসে সভেই হইলা বিদ্যাবান॥"

(চৈঃ, ভাঃ, আঃ, খঃ, ১০ম অধ্যায়)

ফিরিবার সময়ে ছাত্রগণ বহু উপহার প্রদান করেন। এ যাত্রায় তাঁহার বেশ লাভ হইয়াছিল মনে হয়। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে নবদ্বীপের গৃহে এক অনর্থ সংঘটিত হইয়াছিল তাঁহার পত্নী লক্ষ্মী-দেবীর সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া এই সংবাদে বিশ্বম্ভর দুঃখিত হইয়া থাকিবেন; কিন্তু শোক সংবরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ অধ্যাপনাদি করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে নবদ্বীপবাসী সনাতন পণ্ডিতের কন্যার সহিত বিশ্বম্ভরের দ্বিতীয় বিবাহ হয়। পূর্ব্বাপেক্ষা এই বিবাহে অনেক বেশী ধুমধাম হইয়াছিল। এখন বিশ্বম্ভরের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। অনেক ধনী, সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। বুদ্ধিমন্তখাঁ নামে এক ব্যক্তি বিশ্বম্ভরের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারই আগ্রহে ও উদ্যোগে বিশেষ সমারোহের সঙ্গে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। কন্যার পিতাও অপেক্ষাকৃত ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তিনি রাজপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ লিখিয়াছেন নবদ্বীপে এমন সমারোহের বিবাহ কখন হয় নাই। ইহা অবশ্য তাঁহাদের চিরাভ্যস্ত অত্যুক্তি। তবে বিশ্বম্ভরের দ্বিতীয় বিবাহ বেশ সমারোহের সহিত হইয়াছিল মনে করা যাইতে পারে।

গয়াগমন ও হৃদয় পরিবর্ত্তন।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে গয়াগমন অতীব কৌতূহলাবহ প্রয়োজনীয় ঘটনা। এই ঘটনা হইতে তাঁহার জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। গয়া হইতে যখন তিনি ফিরিলেন তখন লোকে তাঁহার জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইল। বৈষ্ণব জীবন চরিত রচয়িতাদের বর্ণনা অনুসারে গয়াগমনকালে চৈতন্যদেব বিদ্যামদে গর্ব্বিত, দাম্ভিক, ভক্তিলেশশূন্য; ধর্ম্মবিষয়ে কখন কোন চিন্তাই করেন নাই, কিন্তু তিনি যখন গয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন তখন ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল, বিনয়ে নম্র, ভক্তিতে পরিপূর্ণ। এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন কি প্রকারে সংঘটিত হইল বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করেন নাই। এই বিষয়ে তাঁহাদের কোন অনুসন্ধিৎসাই ছিল না। তাঁহারা তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান মনে করিতেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হইল তিনি আত্মপ্রকাশ করিলেন এই বলিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে কোন কার্য্যই কারণ বিনা হয় না। মানুষের ক্ষুদ্রবুদ্ধি সব জানিতে না পারে; কিন্তু সকল ঘটনার মূলেই অসংশয়িত কারণ থাকে। জগতের মহাপুরুষদিগের জীবনও এই নিয়মের অধীন। বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক-গণের জীবনরহস্য সম্পূর্ণ উদ্ঘাটন করিতে না পারিলেও একেবারে অবোধ্য নয়। তাঁহাদের অস্পষ্ট জীবনকাহিনীতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁহারা দীর্ঘকালের সাধনায় স্বীয় স্বীয় আধ্যাত্মিক জীবন ও বাণী লাভ করিয়াছিলেন। ঈশার প্রথম জীবনের কোন বিবরণ

না পাওয়া গেলেও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বাল্যকাল হইতে তিনি সত্যান্বেষণে নিযুক্ত ছিলেন। মহম্মদের ধর্ম্মজীবনের বিকাশের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বুদ্ধের দীর্ঘ অন্বেষণ ও গভীর তপস্যা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মজীবন বিকাশ বর্ত্তমান জীবনচরিতসমূহ অনুসারে আকস্মিক ঘটনার মত মনে হয়।' বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ গয়াগমনের পূর্ব্বে তাঁহাকে একেবারে ধর্ম্মভাববিহীন এবং বৈষ্ণবদিগের মহাবিরোধী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব দেখিলেই তিনি তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিতেন। তাঁহার ভয়ে বৈষ্ণবেরা শশব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহাদিগকে বলিতেন তোমরা যে হরি হরি বল তাহাতে তোমাদের কি লাভ হইল। হরি ভজন করিয়া তোমাদের অন্নবস্ত্র জুটে না।

"প্রভু বলে শ্রীধর তুমি যে অনুক্ষণ।
হরি হরি বল তবে দুঃখ কি কারণ॥
লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেনে তুমি।
অন্ন বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি॥"

(চৈঃ, ভাঃ, ৮ম অধ্যায়)

হঠাৎ গয়ার পথে তাঁহার এই ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। বাস্তবিকই গয়ার পথে শ্রীচৈতন্যদেবের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন গভীর রহস্যপূর্ণ! জগতের ধর্ম্ম ইতিহাসে এরূপ ঘটনা আছে বলিয়া জানি না। একমাত্র ডামোস্কাসের পথে সেণ্ট পলের পরিবর্ত্তন যৎকিঞ্চিৎ ইহার অনুরূপ। সম্ভবতঃ বৈষ্ণব-জীবন-চরিত-রচয়িতাগণ অজ্ঞাতসারে এই ব্যাপারটীকে অধিকতর দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম জীবন তাঁহারা যেরূপ ধর্ম্মভাববর্জ্জিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, বোধ হয় তাহা ছিল না। বৈষ্ণবগ্রন্থকারদের বিবরণও সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে

দেখিতে পাওয়া যাইবে গয়াগমনের পূর্ব্বেও শ্রীচৈতন্যদেব একেবারে ধর্ম্মভাববিহীন ছিলেন না। তাঁহারা তাঁহাকে যেরূপ বৈষ্ণববিরোধী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। সময়ে-সময়ে তিনি বৈষ্ণবদিগকে উপহাস করিয়া থাকিতে পারিতেন, কিন্তু প্রকৃত ভক্ত-দিগের প্রতি একেবারে শ্রদ্ধাবিহীন ছিলেন না। শ্রীবাস প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগকে দেখিলে সম্মানের সহিত ব্যবহার করিতেন।

"শ্রীবাসাদি দেখিলেই করেন নমস্কার॥
ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়।
ভক্ত আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥"

(চৈঃ, ভাঃ, আঃ, খঃ, ৮ম অধ্যায়)

তিনি প্রতিদিন গৃহদেবতা বিষ্ণুর পূজা করিতেন।

"পড়াইয়া প্রভু দুই প্রহর হইলে।
তবে শিষ্যগণ লইয়া গঙ্গাস্নানেতে চলে॥
গঙ্গাজলে বিহার করিয়া কতক্ষণ।
গৃহে আসি করে প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজন॥
তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনে বসেন গিয়া বলি হরি হরি॥"

(চৈঃ, ভাঃ, আঃ, খঃ, ৮ম অধ্যায়)

তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে কেহ সন্ধ্যা না করিলে তিনি তাঁহাকে বিশেষ তিরস্কার করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। সন্ধ্যা করিয়া আসিলে তবে তাঁহাকে পড়াইতেন।

"ইতিমধ্যে কদাচিৎ কেহ কোন দিনে।
কপালে তিলক না পরিয়া থাকে ভ্রমে॥

ধর্ম্ম সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব্ব ধর্ম্ম।
লোক রক্ষা লাগি কভু না লঙ্ঘেন কর্ম্ম॥
হেন লজ্জা তাহারে দেহেন সেই ক্ষণে।
সে আর না আইসে কভু সন্ধ্যা করি বিনে॥
প্রভু বোলে কেনে ভাই কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেনে কি যুক্তি ইহার॥
তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
তবে তাঁরে শ্মশান সদৃশ বেদে বলে॥
বুঝিলাম আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা।
আজি ভাই তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা॥
চল সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার।
সন্ধ্যা করি তবে সে আশহ পঢ়িবার॥"

(চৈঃ, ভাঃ, আঃ, খঃ, ১০ম অধ্যায়)

গয়ার পথে পীড়িত হইলে আরোগ্য লাভের জন্য ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করেন। ঈশ্বর সকলের পালনকর্ত্তা এই জ্ঞান অল্পবয়সেই বেশ উজ্জ্বল দেখা যায়। দারিদ্র্যের পেষণের মধ্যে মাতাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেন, ভগবান অভাব পূর্ণ করিবেন।

"প্রভু বোলে কৃষ্ণ পোষ্টা করিব পোষণ।"

(চৈঃ, ভাঃ, আঃ, খঃ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

সর্ব্বোপরি ঈশ্বরপুরীর সহিত প্রথম সাক্ষাতে চৈতন্যদেবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম-ভাব ও সাধু-ভক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্বম্ভর যখন পাঠ সমাপ্ত করিয়া অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই সময়ে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিয়া কিছু-কাল বাস করেন। একদিন পথে তাঁহার সঙ্গে বিশ্বম্ভরের সাক্ষাৎ হয়।

তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে লইয়া আসিলেন। সাধু, সন্ন্যাসী দেখিলেই সর্ব্বদাই বিশ্বম্ভর তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসিতেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেন। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গেও এইরূপ ধর্ম্মালাপ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন।

"দৈবে একদিন প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর:
পঢ়াইয়া আইসেন আপনার ঘর॥
পথে দেখা হইল ঈশ্বরপুরী সনে।
ভৃত্য দেখি প্রভু নমস্কারিলা আপনে॥

*　　*　　*

ভিক্ষা নিমন্ত্রণ প্রভু করিয়া তাঁহানে।
মহাদরে গৃহে লই চলিলা আপনে॥
কৃষ্ণের নৈবেদ্য শচী করিলেন গিয়া।
ভিক্ষা করি বিষ্ণুগৃহে বসিলা আসিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রস্তাব তবে কহিতে লাগিলা।
কহিতে কৃষ্ণের কথা বিহ্বল হইলা॥
দেখিয়া প্রেমের ধারা প্রভুর সন্তোষ।
না প্রকাশিয়া আপনে লোকের দিন দোষ॥"

(চৈঃ, ভাঃ, আঃ, খঃ, ৭ম অধ্যায়)

এখন হইতে ঈশ্বর পুরী যতদিন নবদ্বীপ ছিলেন, প্রায় দুই মাস কাল, প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে গিয়া তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিতেন।

"এইমত প্রতিদিন প্রভু তাঁর সঙ্গে।
বিচার করেন দুই চারিদণ্ড রঙ্গে॥"

(চৈঃ, ভাঃ, আঃ, খঃ, ৭ম অধ্যায়)

সেই ধর্ম্মালাপে গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে পণ্ডিত জানিয়া স্বরচিত 'কৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থের ভাষার সংশোধন করিয়া দিতে বলেন। তদুত্তরে বিশ্বম্ভর বলেন।

"প্রভু বোলে "ভক্তবাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দেখে দোষ সে-ই পাপী জন॥
ভক্তের কবিত্ব যে-তে মতে কেনে নয়!
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়॥
মূর্খে বোলে 'বিষ্ণায়,' 'বিষ্ণবে' বোলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর॥"

(চৈঃ, ভাঃ, আঃ, খঃ, ৭ম অধ্যায়)

এই ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহা হইতে তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের উন্মেষ আরম্ভ হয়। অবশ্য তাঁহার অন্তরে গূঢ়ভাবে ধর্ম্মভাব নিহিত ছিল; নতুবা কেবল বাহিরের কোন ঘটনাতে এমন ফল হয় না। কতজন তো ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু আর কাহারও এমন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ঈশ্বরপুরীর সংস্পর্শে আসিয়া বিশ্বম্ভরের চরিত্রে কেন এমন ভক্তির উৎস খুলিয়া গেল; সে রহস্য মানবের দুর্ব্বোধ্য। ইহা আদিম বিশ্ব রহস্যের অন্তর্ভুক্ত। এই বিশ্বের অন্তরালে কত গভীর রহস্য রহিয়াছে। মানব-বুদ্ধি তাহা অতি সামান্যই উদ্ঘাটিত করিতে পারিয়াছে। চৈতন্য জীবনের অদ্ভুত ভক্তির বিকাশ অতীব বিস্ময়-জনক। তবে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাতে তাঁহার জীবনে যে এক নূতন ধারা বহিয়া গিয়াছিল তাহা খুব সম্ভব। শ্রীচৈতন্যদেব নিজেও ইহা মনে করিতেন। দেখা যায় ঈশ্বরপুরীর প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

তিনি তাঁহার জন্ম স্থান কুমারহট্ট দেখিতে গিয়াছিলেন এবং ভক্তিভরে তথাকার মৃত্তিকা বহির্ব্বাসে বন্ধন করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন।

"আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান।
দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান॥
প্রভু বোলে কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরপুরীর যে গ্রামে অবতার॥
কাঁদিলেন বিস্তর চৈতন্য সেইস্থানে।
আর শব্দ কিছু নাই ঈশ্বরপুরী বিনে॥
সেই স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি এক ঝুলি॥
প্রভু বোলে "ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা মোহর জীবন ধন প্রাণ॥"

(চৈঃ, ভাঃ, আঃ, খঃ, ১২শ অধ্যায়)

গয়ায় ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ একেবারে অতর্কিত আকস্মিক ঘটনা বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যদেব জানিতেন যে, ঈশ্বরপুরী গয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্যই গয়ায় আগমন করেন। যাহা হউক গয়াক্ষেত্রে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ হইতেই শ্রীচৈতন্যদেবের অদ্ভুত ভক্তিবিকাশের আরম্ভ হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল এবং তখন হইতেই পরস্পরকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা করিতেন। এইবার শ্রীচৈতন্যদেব ঈশ্বরপুরীকে মন্ত্রদীক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ঈশ্বরপুরীও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

"তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে।
প্রভু বোলে "দেহ আমি দিলাম তোমারে ॥
হেন শুভদৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে ॥"

(চৈঃ, ভাঃ, আঃ, খঃ, ১২শ অধ্যায়)

দীক্ষার পরে কিছুদিন শ্রীচৈতন্যদেব গয়ায় ছিলেন। সম্ভবতঃ ঈশ্বর-পুরীর সঙ্গে থাকিয়া ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার আশ্চর্য্য ভক্তির উচ্ছ্বাস আরম্ভ হয়।

"একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভৃতে।
নিজ ইষ্ট মন্ত্র ধ্যান লাগিলা করিতে ॥
ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া ॥
'কৃষ্ণরে' 'বাপরে' মোর জীবন শ্রীহরি।
কোনদিকে গেলা মোর প্রাণ চুরি করি ॥
পাইলোঁ ঈশ্বর মোর কোনদিকে গেলা।
শ্লোক পড়ি পড়ি প্রভু কাঁদিতে লাগিলা ॥
প্রেম ভক্তিরসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হইল ধূলায় ধূসর ॥
আর্ত্তনাদ করি প্রভু ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া মোহরে" ॥
যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির ॥"

(চৈঃ, ভাঃ, আঃ, খঃ, ১২শ অধ্যায়)

এই তাঁহার প্রথম প্রেম বিকাশ। সঙ্গীদিগকে বলিলেন "তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও। আমি আর সংসারে ডুবিব না। আমি এখান হইতে মথুরায় যাইব। দেখি সেখানে আমার প্রাণনাথকে পাই কিনা।" সঙ্গীগণ তখন তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া কিছু শান্ত করিলেন; কিন্তু শেষরাত্রে উঠিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রেমাবেশে "কৃষ্ণরে, বাপরে মোর পাইমু কোথায়" বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মথুরার দিকে চলিলেন! এখন হইতে বার বার তিনি মথুরায় যাইবার জন্য বাহির হইয়াছেন, কিন্তু প্রতিবারেই কেন যেন যাওয়া হয় নাই। তাঁহার হৃদয়ের এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। বৈষ্ণব জীবনচরিতরচয়িতাগণ লিখিয়াছেন শ্রীচৈতন্যদেব এইভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইলে দৈববাণী শুনিতে পাইলেন, "এখন তুমি মথুরায় যাইও না। এখনও যাইবার সময় হয় নাই। এখন নবদ্বীপে ফিরিয়া যাও।" যে কারণেই হউক তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন।

বিশ্বম্ভর গয়াতীর্থ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া নবদ্বীপের লোকেরা সাগ্রহে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। সে সময়ে এরূপ দূরতীর্থ গমন অতি বিরল ছিল; সুতরাং কেহ দূরতীর্থ হইতে ফিরিলে বহুলোকের সমাগম স্বাভাবিক। কোন কোন বৈষ্ণব সেই সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর সকলকে বিনয়ে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। অনেকে তাঁহাকে দেখিয়া চলিয়া গেলেন। কেহ কেহ বা তীর্থের বিবরণ শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর তাঁহাদিগকে গয়ার বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বিষ্ণু পাদোদক তীর্থের কথা বলিতেই তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল। ক্রমে তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন আর কথা বলিতে পারিলেন না।

"পাদ-পদ্ম তীর্থের লইতে প্রভু নাম।
অঝরে ঝরয়ে দুই কমল নয়ান॥
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
কৃষ্ণ বলি কাঁদিতে লাগিলা বহুতর॥
ভরিল পুষ্পের বন মহা প্রেমজলে।
মহাশ্বাস ছাড়ি প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে॥
পুলকে পূর্ণিত হইল সর্ব্ব কলেবর।
স্থির নহে প্রভু কম্প হয়ে থর থর॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ খঃ ১ম অধ্যায়)

উপস্থিত লোকগণ ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। হইবারই ত কথা। ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা যাহাকে দাম্ভিক, বিদ্যামদে গর্ব্বিত, বৈষ্ণববিরোধী বলিয়া জানিতেন এখন তাঁহার কি পরিবর্ত্তন!

শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতি কোন কোন বৈষ্ণবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের এই অতর্কিত পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহারা স্বভাবতঃই অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং এ বিষয়ে আরও জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন; কিন্তু বিশ্বম্ভরের তখন আর কথা বলিবার সাধ্য বা প্রবৃত্তি নাই। তিনি অনুসন্ধিৎসু লোকদিগকে অনুনয় করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! আজ গৃহে গমন করুন, কল্য আপনাদিগকে সকল কথা বলিব।" স্থির হইল পরদিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে তাঁহার কথা শুনিবার জন্য সকলে মিলিত হইবেন। সকলকে বিদায় দিয়া বিশ্বম্ভর গৃহকার্য্যে মন দিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আর সেই বিশ্বম্ভর নাই।

"নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে।
মহা বিরক্তির প্রায় ব্যবহার করে॥

বুঝিতে না পারে আই পুত্রের চরিত।
তথাপিহ পুত্র দেখি মহা আনন্দিত॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রভু করেন ক্রন্দন।
আই দেখে পূর্ণ হয় সকল অঙ্গন॥
কোথা কোথা কৃষ্ণ বোলয়ে ঠাকুর।
বলিতে বলিতে প্রেম বাঢ়য়ে প্রচুর॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ খঃ ১ম অধ্যায়)

স্নেহময়ী শচীদেবী পুত্রের এই পরিবর্ত্তনে বিস্মিত ও ভীত হইলেন। তিনি কিছু বুঝিতে না পারিয়া করজোড়ে গৃহদেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ওদিকে শ্রীমান পণ্ডিত মহাহৃষ্ট হইয়া নবদ্বীপের বৈষ্ণবদিগের মধ্যে বিশ্বম্ভরের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংবাদ প্রচার করিলেন। বৈষ্ণব গোষ্ঠীতে মহা আনন্দ হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি, সদাশিব ও মুরারী পণ্ডিত শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত গদাধরও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেখানে আসিয়া গৃহাভ্যন্তরে লুকাইয়া রহিলেন। বিশ্বম্ভর আগমন করিলে তাঁহাকে পরমাদরে সম্ভাষণ করিলেন। বৈষ্ণবগণকে দেখিবামাত্র তাঁহার প্রেম জাগিয়া উঠিল। তিনি ভাগবত হইতে ভক্তির লক্ষণ বিষয়ক শ্লোক পড়িলেন। তৎপরে "পাইলুঁ ঈশ্বর মোর কোনদিগে গেলা" বলিয়া প্রেমাবেশে গৃহের স্তম্ভ কোলে করিয়া পড়িলেন। স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া বৈষ্ণবগণ ঢলিয়া পড়িলেন। গৃহাভ্যন্তরে গদাধর মূর্চ্ছিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা পাইয়া বিশ্বম্ভর 'কৃষ্ণরে, বাপরে' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গৃহের মধ্যে গদাধরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "গৃহের ভিতরে কে?"

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বলিলেন "তোমার গদাধর।" গদাধর তখন মস্তক নত করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। বিশ্বম্ভর তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "গদাধর তোমরা সুকৃতি। অল্প বয়স হইতে তোমাদের কৃষ্ণে দৃঢ়মতি হইয়াছে। আমার জন্ম বৃথা গেল। যদি বা অমূল্য নিধি পাইলাম, অদৃষ্ট দোষে হারাইয়া গেল।" এই বলিয়া আবার কাঁদিতে কাঁদিতে মাটিতে লুটাইতে লাগিলেন।

"এতবলি ভূমিতে পড়িলা বিশ্বম্ভর।
ধূলায় লোটায় সর্ব্বসেব্য কলেবর॥
পুনঃ পুনঃ হয় বাহ্য পুনঃ পুনঃ পড়ে।
দৈবে রক্ষা পায় নাক মুখ সে আছাড়ে॥
মেলিতে না পারে দুই চক্ষু প্রেমজলে।
সবে মাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ শ্রীবদনে বোলে॥
ধরিয়া সভার গলা কাঁন্দে বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণ কোথা বন্ধু সব বলহ সত্বর॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ খঃ ১ম অধ্যায়)

এইরূপ আর্ত্তি করিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রায় সারাদিন এইরূপে কাটিয়া গেল। অবশেষে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ গৃহে গমন করিলেন। গদাধর, শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভরের এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। বাস্তবিকই ইহা অতীব বিস্ময়ের কথা। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থে অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি ভক্তির বাহ্য লক্ষণের বর্ণনা ছিল। কোন কোন ভক্ত বৈষ্ণবের জীবনে ইতিপূর্ব্বেও তাহার প্রকাশ দেখা গিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বম্ভরের এত দ্রুত এমন ভক্তির উচ্ছ্বাস বাস্তবিকই অভূতপূর্ব্ব। অল্পদিন

পূর্ব্বে যিনি উদ্ধত, বিদ্যামদে গর্ব্বিত, ভোগ-সুখের মধ্যে মগ্ন ছিলেন, প্রকৃত ধর্ম্মভাবের কোন চিহ্নই দেখা যায় নাই এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করিয়া, তাহাতে এমন প্রমত্ত ভক্তির আবির্ভাব হইল তাহা কিছুতেই বুঝা যায় না। ইহার একমাত্র কারণ এই বলা যাইতে পারে যে, শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রে এমনই একাগ্রতা ও গভীরতা ছিল যে যখন যেদিকে তাঁহার চিত্ত ধাবিত হইয়াছিল, তাহাতেই চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। যখন জ্ঞানচর্চ্চায় মন নিয়োগ করিলেন, অল্প কয়েক বৎসরেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আবার শুভক্ষণে ভক্ত-সংস্পর্শে যখন ভক্তির উৎস খুলিয়া গেল, তখন তাহা প্রবল বন্যার মত বাঁধ ভাঙ্গিয়া একেবারে সমগ্র জীবন অধিকার করিল। এখন হইতে উত্তরোত্তর এই ভক্তির স্রোত প্রবলতর হইতে লাগিল। ক্রমে আমরা তাহার পরিচয় পাইব। এই ভক্তির উচ্ছ্বাস শ্রীচৈতন্যের জীবনের বিশেষ লক্ষণ। বৈষ্ণব-জীবন-চরিত লেখকগণের বর্ণনা কিছু অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা বাদ দিলেও শ্রীচৈতন্যের জীবনে এখন হইতে যে অদ্ভুত ভক্তির লক্ষণ দেখা দিয়া ছিল তাহা সুনিশ্চিত। সম্ভবতঃ সাধারণ লোক ইহা দ্বারাই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর দুই একদিন বিশ্রাম করিয়া বিশ্বম্ভর পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ছাত্রগণ হরিধ্বনি করিয়া পুঁথি খুলিল। তাহা শুনিয়া বিশ্বম্ভরের প্রেমাবেশ হইল। তিনি ব্যাকরণের কথা ভুলিয়া কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

"আবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখান।
সূত্র বৃত্তি টীকায় সকলে হরিনাম॥

প্রভু বোলে সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বোলয়ে আন॥
কর্ত্তা হর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ-ভব-আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে।
ব্যর্থ জন্ম যায় তার অকথ্য কথনে॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ খঃ ১ম অধ্যায়)

এই প্রকারে অবিরল তিনি কৃষ্ণকথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। ছাত্রগণ শুনিয়া বিস্মিত হইল। তাহারা ভাবিতে লাগিল, তাহাদের গুরুদেব এ কি বলিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিশ্বম্ভরের জ্ঞান হইল; তিনি কিছু লজ্জিত হইয়া বলিলেন "আজ আমি সূত্রের কি ব্যাখ্যা করিলাম?" ছাত্রগণ বলিল, "আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই, আপনি সকল শব্দের কৃষ্ণ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।" বিশ্বম্ভর তখন হাসিয়া বলিলেন "তবে আজকার মত পাঠ বন্ধ থাক। চল, এখন গঙ্গাস্নানে যাই।" এই বলিয়া ছাত্রগণের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গেলেন। স্নানান্তে গৃহে আসিয়া যথাবিধি গৃহদেবতার পূজা করিয়া আহারে বসিলেন। শচীদেবী পূর্ব্বের মত আহারের সময় পুত্রের নিকটে বসিয়া কথা বলিতে গেলেন। বিশ্বম্ভর তাঁহার সঙ্গেও আবিষ্টের মত কৃষ্ণকথা বলিতে লাগিলেন। একেবারে কৃষ্ণাবেশে মগ্ন। বিদ্যালয়ে, গৃহে, শয়নে, ভোজনে, ধ্যানে, জ্ঞানে আর কোন চিন্তাই নাই। এই খানেই চৈতন্য চরিত্রের বিশেষত্ব। পরদিন আবার ছাত্রদিগকে পড়াইতে গেলেন। কিন্তু আবার সেই দশা ঘটিল। ব্যাকরণের সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কৃষ্ণতত্ত্ব আসিয়া পড়িল। ছাত্রগণ বলিল, "এসব কি বলিতেছেন? আমরা ত ইহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না।" বিশ্বম্ভর

বলিলেন "তবে এখন থাক, বিকালে সব বুঝাইব।" ছাত্রগণ অধ্যাপকের এই ভাব দেখিয়া তাঁহার গুরু গঙ্গাদাস কবিরাজের নিকট গিয়া অভিযোগ করিল। বলিল, "গয়া হইতে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত নিমাই পণ্ডিত কেবল কৃষ্ণের কথাই বলিতেছেন। সূত্র, বৃত্তি, টীকা সবেতেই কৃষ্ণের ব্যাখা করিতেছেন। আবার কখনও বা হাসান; কখনও বা হুঙ্কার করেন। আমরা ইহার কিছুই ভাব বুঝিতে পারি না। এখন আমরা কি করি।" বিজ্ঞ অধ্যাপক গঙ্গাদাস কবিরাজ বলিলেন, "তোমরা এখন গৃহে যাও। কাল সকালে পড়িতে আসিও। আমি বিকালে বিশ্বম্ভরকে বুঝাইয়া বলিব যেন ভাল করিয়া পড়ান।" অপরাহ্নে বিশ্বম্ভরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন "বাপ বিশ্বম্ভর, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ কার্য্য অধ্যয়ন, অধ্যাপনা। তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, পিতা জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর, তোমাদের উভয়কুলেই কেহ মূর্খ নাই। তাঁহাদের কথা স্মরণ করিয়া তুমি ভাল করিয়া পড়াও।" গুরুর এই সপ্রেম তিরস্কারে পূর্ব্বের বিদ্যার অহঙ্কার আবার জাগিয়া উঠিল। বিশ্বম্ভর বলিলেন, "আপনার চরণ-প্রসাদে নবদ্বীপে কোনও ব্যক্তি নাই যে, আমার ব্যাখার ভুল ধরিতে পারে। আমি নগরে বসিয়া পড়াইব দেখি কে কি বলে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" গঙ্গাদাস কবিরাজকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া বিশ্বম্ভর ছাত্রদিগকে লইয়া গঙ্গাতীরে গেলেন এবং তাহাদের কাছেও পূর্ব্বের মত কিছু অহঙ্কারের কথা বলিলেন। ঘটনাক্রমে নিকটবর্ত্তী একটী বাড়ীতে রত্নগর্ভ আচার্য্য নামে শ্রীহট্ট নিবাসী একজন ব্রাহ্মণ ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। ভাগবতের একটী শ্লোক তাঁহার কর্ণে আসিতেই বিশ্বম্ভর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ছাত্রগণ ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইল। ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা পাইয়া "বোল, বোল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

তখন তাঁহার ভাবসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। মুহুর্মুহু অশ্রু, কম্প, পুলক, দেখা দিতেছে। নয়নের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। রত্নগর্ভ আচার্য্য ইহা দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। তিনি প্রেমে আবিষ্ট হইয়া "বোল, বোল অর্থাৎ আরো পড়, আরো পড়" বলিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন; সেখানে বহু লোক সমাগম হইল। লোকে বিশ্বম্ভরের এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে গদাধর পণ্ডিত আসিয়া রত্নগর্ভ আচার্য্যকে আর পাঠ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বিশ্বম্ভরকে ধরিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত করিলেন। তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন, "আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম।" যাহা হউক, সে দিনের মত গঙ্গা দর্শন করিয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন। পরদিন আবার মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে ছাত্রদিগকে পড়াইতে গেলেন। কিন্তু আবারও সেই অবস্থা হইল। আর অধ্যাপনা চলে না। উপর্য্যুপরি দশদিনের বৃথা চেষ্টার পর ছাত্রদিগকে বলিলেন "ভাই সব, তোমরা অন্য অধ্যাপকের নিকটে যাও, আমার দ্বারা আর অধ্যাপনা কার্য্য চলিবে না। আমি নিরন্তর যেন শুনি কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজাইতেছে। আমি সর্ব্বত্রেই কেবল কৃষ্ণ নাম শুনি।

"যত শুনি শ্রবণে সকল কৃষ্ণনাম।
সকল ভুবন দেখোঁ গোবিন্দের ধাম॥"

এইজন্য আমি আর পাঠে মন দিতে পারি না। তোমরা তোমাদের ইচ্ছামত অন্য অধ্যাপকের নিকট গিয়া অধ্যয়ন কর" এই বলিয়া তিনি পুঁথি বাঁধিলেন। এই নিমাই পণ্ডিতের শেষ অধ্যাপনা। ছাত্রগণ বলিল, "আপনার যে সঙ্কল্প, আমাদেরও সেই সঙ্কল্প। আপনার কাছে পড়িয়া আর অন্যের নিকট পড়িব না।" এই বলিয়া তাহারাও পুঁথি

বদ্ধ করিল। বিশ্বম্ভর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তবে তোমরা সকলে শ্রীকৃষ্ণের শরণ লও।

"দিবসেকো আমি যদি হই কৃষ্ণ দাস।
তবে সিদ্ধ হউ তোমা সভার অভিলাষ॥
তোমরা সকল লহ কৃষ্ণের শরণ।
কৃষ্ণনামে পূর্ণ হউ সভার বদন॥
নিরবধি শ্রবণে শুনহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ তোমা' সভাকার ধন প্রাণ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ খঃ ১ম অধ্যায়)

এই বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্ত্তনের আরম্ভ। এখন হইতে এক বৎসরকাল নবদ্বীপে থাকিয়া শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণবদের লইয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে এই এক বৎসর বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সময়। এই সময়ে তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এক বৎসরের মধ্যে কি করিয়া তিনি এত কাজ করিয়াছিলেন ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এখানেও তাঁহার অদ্ভুত একাগ্রতা ও অভিনিবেশের উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায়। নিঃসংশয়িত বিবরণ না থাকিলে বিশ্বাস করিতেই পারা যাইত না যে এক বৎসরে এই সমুদায় কাজ হইয়াছিল। কিন্তু বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, চব্বিশ বৎসর বয়সে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাহার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার ভক্তমণ্ডলী সংগ্রহ ও সংগঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি এই সময়েই সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে নাম সঙ্কীর্ত্তনে বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, যাহা সত্যই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া

পরিগণিত হইয়াছিল, এই সময়েই তাহার প্রবর্ত্তন ও পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগের কৃতকার্য্যতার মূল সঙ্কেত বিশ্বাসী অনুরাগী মণ্ডলী গঠন। বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এক একটী মণ্ডলী গঠন করিয়াছিলেন এবং সেই মণ্ডলীই তাঁহাদের জীবনের কার্য্য রক্ষা ও সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবও এই প্রকার একটি মণ্ডলী গঠন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই সেই মণ্ডলীর অনেককে পাইয়াছিলেন। ক্রমে আমরা তাঁহাদের কিছু পরিচয় দিব। চুম্বকে যেমন লৌহখণ্ড আকৃষ্ট হয় তেমনি শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে স্বীয় জীবনের কার্য্য আরম্ভ করিতেই নানা স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া তাঁহার সঙ্গে জুটিলেন। তাঁহার চরিত্রে অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ছিল। তিনি কি এক মোহন মন্ত্র জানিতেন যে লোকে তাঁহাকে একবার দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া যাইত। যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, জ্ঞানী, মূর্খ, প্রবীণ, বিজ্ঞ, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, পাপে চিরাভ্যস্ত দুর্দ্দান্ত দস্যু যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে সেই বহুদিনের অভ্যস্ত পূর্ব্বপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যের অনুরক্ত ভক্ত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে অপর কোনও কোনও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক অপেক্ষা তিনি সৌভাগ্যশালী ছিলেন। তাঁহার আহ্বান অরণ্যে রোদনের প্রায় হয় নাই। বহুদিন অপেক্ষা করিতেও হয় নাই এবং তাঁহার মণ্ডলীতে অবিশ্বস্ত কৃতঘ্নও দেখা যায় নাই। যাঁহারা একবার তাঁহার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, আমরণ কি গভীর ভক্তিতে তাঁহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের ভক্তদের প্রেম ও অনুরাগ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। একবার তাঁহাকে দেখিবার জন্য অশীতিপর বৃদ্ধ, কুলবধূ, যাঁহারা কখনও গৃহ-প্রাঙ্গণের বাহিরে যান নাই, অল্পবয়স্ক বালক দুর্গম পথ হাঁটিয়া সুদূর স্থানে যাইতেন।

পুঁথি বন্ধ করিয়া বিশ্বম্ভর ছাত্রদের লইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রথমে কেবল মাত্র হাতে তালি দিয়া "হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ, মাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন ॥" এই গান গাহিতেন—

"দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লইয়া ॥"

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কীর্ত্তনে অনেক উন্নতি সাধন করিয়া থাকিবেন। ঠিক কোন্ সময়ে খোল করতাল প্রভৃতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। তবে সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই যে খোল করতাল সহকারে কীর্ত্তনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা সুনিশ্চিত।

ছাত্রগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে গান গাহিতেন। এই এক গানেই তাঁহার ভক্তি উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। তিনি "বোল, বোল" বলিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন।

"গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় আবেশে ॥
"বোল, বোল, প্রভু চতুর্দ্দিগে পড়ে।
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে ॥"

নিকটস্থ বৈষ্ণবগণ এই শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রচার হইল নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপনা ছাড়িয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। স্বভাবতই বৈষ্ণবদলে মহা আনন্দ পড়িয়া গেল। যাঁহারা স্বচক্ষে সে কীর্ত্তন ও সে ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিলেন, তাঁহারা অবাক্ হইয়া গেলেন।

"প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
পরম অপূর্ব্ব সভে ভাবে মনে মন ॥

পরম সন্তোষ সভে হইলা অন্তরে ।
এবে যে কীর্ত্তন হইল নদীয়া নগরে ॥
এমত দুর্ল্লভ ভক্তি আছয়ে জগতে ।
নয়ন সফল হয় এ ভক্তি দেখিতে ॥
যত উদ্ধতের সীমা এই বিশ্বম্ভর ।
প্রেম দেখিলাঙ নারদাদির দুষ্কর ॥
হেন উদ্ধতের যদি হেন ভক্তি হয় ।
না বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছা এবে কিবা হয় ॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ খঃ ১ম অধ্যায়)

বৈষ্ণব সকলের মধ্যে এই প্রকার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এখন পর্য্যন্ত নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের অনেকের সঙ্গেই শ্রীচৈতন্যদেবের পরিচয় হয় নাই। মুরারী গুপ্ত, মুকুন্দ এবং পণ্ডিত গদাধরের সঙ্গে অধ্যয়ন সময় হইতেই তাঁহার পরিচয় ছিল। সম্ভবতঃ শ্রীমান্ পণ্ডিতের সঙ্গেও সেই সূত্রে পরিচয় হয়। সে সময়ে নবদ্বীপের অধ্যাপক এবং ছাত্রগণ অর্থাৎ শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্ম্মের প্রতি, বিশেষতঃ বৈষ্ণবদিগের প্রতি, উদাসীন বা অবজ্ঞাযুক্ত ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। চৈতন্যদেবের প্রকাশের পূর্ব্বেও নবদ্বীপে বৈষ্ণব মণ্ডলী ছিল; কিন্তু লোকে তাঁহাদিগকে বড় গ্রাহ্য করিত না। বিশেষতঃ পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা বা কৃপার দৃষ্টিতে দেখিতেন।

"এই নবদ্বীপে বাপ যত অধ্যাপক ।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে সবে হয় বক ॥
কি সন্ন্যাসী, কি তপস্বী, কিবা জ্ঞানী যত ।
বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত ॥

কেহ না বাখানে বাপ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
না করুক ব্যাখ্যা, আরো নিন্দে সর্ব্বক্ষণ॥
যতেক পাপিষ্ঠ শ্রোতা সেই বোল ধরে।
তৃণজ্ঞান কেহ আমা সভারে না করে॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ খঃ ২য় অধ্যায়)

এইজন্যই বিশ্বম্ভরের ভক্তিলক্ষণ প্রকাশে নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের এত আনন্দ হইয়াছিল। নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক বিশ্বম্ভর বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে বৈষ্ণবগণের আশা হইল যে এখন আর লোকে তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিতে পারিবে না।

"এখনে প্রসন্ন কৃষ্ণ হইল সভারে।
এ পথে প্রবিষ্ট করি দিলেন তোমারে॥
তোমা হইতে হইবেক পাষণ্ডের ক্ষয়।
মনেতে আমরা ইহা বুঝিব নিশ্চয়॥
চিরজীবী হও তুমি বলি কৃষ্ণনাম।
তোমা হইতে হউ কৃষ্ণগুণগ্রাম॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ খঃ ২য় অধ্যায়)

সাধারণ বৈষ্ণবগণের সঙ্গে বিশ্বম্ভরের পরিচয় ছিল না; এমন কি বৈষ্ণবগণের নেতা অদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল না। শ্রীবাসের সঙ্গে চাক্ষুষ সাক্ষাৎ ছিল। পথে সাক্ষাৎ হইলে নমস্কার করিতেন, এইমাত্র। মুরারী গুপ্ত প্রভৃতি সহাধ্যায়ী কয়েকজন বৈষ্ণবগণের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। গদাধর পণ্ডিত একদিন বিশ্বম্ভরকে সঙ্গে লইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের নিকটে গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইতিপূর্ব্বেই অদ্বৈতাচার্য্য বিশ্বম্ভরের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়াছিলেন; শৈশবাবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া থাকিতে পারেন। কথিত

আছে, বিশ্বম্ভরের বাল্যকালে তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপ অদ্বৈতের গৃহে পাঠ করিতে যাইতেন; সেইসময়ে বালক বিশ্বম্ভর কখন কখনও অগ্রজকে ডাকিতে, সেখানে আসিতেন। কিন্তু সে অনেকদিনের কথা। তারপরে তাঁহাদের আর সাক্ষাৎ হয় নাই। বিশ্বম্ভর যখন গদাধরের সঙ্গে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকটে আসিলেন, তখন তিনি তুলসী মঞ্চের নিকটে বসিয়া পূজা করিতেছিলেন, ক্ষণে ক্ষণে দুই হস্ত তুলিয়া হরি, হরি ধ্বনি করিতেছিলেন। কখন বা কাঁদিতেছিলেন, কখন বা হাসিতেছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যকে দেখিয়াই বিশ্বম্ভর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অদ্বৈতাচার্য্য ইহা দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দে মগ্ন হইয়া গেলেন। এই তরুণ যুবকের আশ্চর্য্যভক্তি স্বচক্ষে দেখিয়া তিনি শ্রদ্ধাতে পূর্ণ হইলেন এবং বোধ হয় সম্ভ্রমে তাঁহার পদধূলি লইয়াছিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থকারেরা এখানে এক রহস্য কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, অদ্বৈতাচার্য্য যোগবলে জানিতে পারিলেন যে, বিশ্বম্ভর স্বয়ং কৃষ্ণ।

"অদ্বৈত দেখিয়া মাত্র প্রভু বিশ্বম্ভর।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই পৃথিবী উপর॥
ভক্তিযোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
এই মোর প্রাণনাথ জানিলা সকল॥
কতি যাবে চোরা আজি ভাবে মনে মনে;
এতদিন চুরি করি বুল এই খানে॥
অদ্বৈতের ঠাই চোর না লাগে চোরাই।
চোরের উপরে চুরি করিব এথায়॥
চুরির সময় এবে বুঝিয়া আপনে।
সর্ব্ব পূজা সজ্জ লই নাম্বিলা তখনে॥

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী লই সেই ঠাঁই।
চৈতন্যচরণ পূজে আচার্য্য গোঁসাই॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ খঃ ২য় অধ্যায়)

আরও লিখিত আছে যে ইতিপূর্ব্বে এক রাত্রিতে অদ্বৈতাচার্য্য গীতার কোন অংশের অর্থ ভাল না বুঝিতে পারিয়া দুঃখিত অন্তরে অনাহারে নিদ্রা গিয়াছিলেন। কতক রাত্রিতে কে একজন স্বপ্নে তাঁহাকে শ্লোকের অর্থ বলিয়া দিয়া উঠিয়া আহার করিতে বলিলেন। আরও বলিলেন যে, আর দুঃখ করিও না। তুমি এতদিন যেজন্য ব্রত, উপবাস প্রভৃতি করিতেছিলে তাহা সার্থক হইয়াছে। যাঁহাকে আনিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তিনি আসিয়াছেন। চক্ষু মেলিয়া অদ্বৈতাচার্য্য দেখিলেন, সম্মুখে বিশ্বম্ভর। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তিনি অদৃশ্য হইলেন। এ সমুদায় উত্তরকালে ভক্ত কবিদের কল্পনা বলিয়া মনে হয়। অদ্বৈতাচার্য্য সত্য সত্যই যদি মূর্চ্ছিত বিশ্বম্ভরের চরণ পূজা করিয়া থাকেন, তাহার ব্যাখ্যার জন্য যোগবল স্বপ্ন প্রভৃতি কল্পনার প্রয়োজন নাই। অদ্বৈতাচার্য্যের বৈষ্ণবসুলভ ভক্তিতেই তাহার যথেষ্ট কারণ পাওয়া যায়। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদাই এইরূপে পরস্পরের পদধূলি গ্রহণ করিয়া থাকেন। মহা ভক্ত অদ্বৈতাচার্য্য তরুণ যুবক বিশ্বম্ভরের আশ্চর্য্য ভক্তি দেখিয়া তাঁহার চরণ পূজা করিয়া থাকিবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। যাহা হউক মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে বিশ্বম্ভর ভক্তিভরে জোড় হস্তে অদ্বৈতের স্তুতি বন্দনা করিলেন এবং পদধূলি লইয়া বলিলেন—

"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
তোমার আমি সে হেন জানিহ নিশ্চয়॥
ধন্য হইলাম আমি দেখিয়া তোমারে।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে॥

তুমি সে করিতে পার ভববন্ধ নাশ
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বথা প্রকাশ ॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ খঃ ২য় অধ্যায়)

অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে পরম আদরে প্রতি সম্ভাষণ করিলেন।

"হাসিয়া অদ্বৈত কিছু করিলা উত্তর।
সভা হইতে তুমি মোর বড় বিশ্বম্ভর ॥
কৃষ্ণকথা কৌতুকে থাকহ এই ঠাঁই।
নিরন্তর তোমা যেন দেখিবারে পাই ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
তোমার সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে ॥"

বিশ্বম্ভর বৃদ্ধ আচার্য্যের এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া গৃহে গমন করিলেন। এই ব্যবহার ও কথোপকথন অতি স্বাভাবিক; কিন্তু ইহার সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত স্বপ্নদর্শন বা যোগবললব্ধ অবতার জ্ঞানের সামঞ্জস্য হয় না।

ক্রমে অন্যান্য বৈষ্ণবগণের সঙ্গে বিশ্বম্ভরের পরিচয় হইল। তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করিতেন। সাক্ষাৎ হইলে ভক্তিতে অবনত হইয়া প্রণাম করিতেন। গঙ্গাস্নানের পথে দেখা হইলে তাঁহাদের স্নানের কাপড়, ফুলের সাজি প্রভৃতি বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। কুশ, গঙ্গামৃত্তিকা প্রভৃতি আনিয়া দিতেন। স্নানান্তে তাঁহাদের কাপড় নিঙ্‌ড়াইয়া দিতেন। বৈষ্ণবগণও প্রীত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন।

"শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্করে।
প্রীত হইয়া ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করে ॥

তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণে।
মুখে কৃষ্ণবোল কৃষ্ণ শুনহ শ্রবণে॥
কৃষ্ণ ভজিলে সে বাপ সব সত্য হয়।
না ভজিলে কৃষ্ণ, রূপ বিদ্যা কিছু নয়॥
কৃষ্ণ সে জগতপিতা কৃষ্ণ সে জীবন।
দৃঢ় করি ভজ বাপ কৃষ্ণের চরণ॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ খঃ,২য় অধ্যায়)

বৈষ্ণবদের আশীর্ব্বাদে বিশ্বম্ভর আনন্দিত হইয়া তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিতেন।

"আশীর্ব্বাদ শুনিঞা প্রভুর বড় সুখ।
সভারে চাহেন প্রভু তুলিয়া শ্রীমুখ॥
তোমরা সে কর সত্য করি আশীর্ব্বাদ।
তোমরা বা কেনে অন্য করিবা প্রসাদ॥
তোমরা সে পার কৃষ্ণ ভজন দিবারে।
দাসে সেবিলে সে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥
তোমরা যে আমারে শিখাও বিষ্ণুধর্ম্ম।
তেঁঞি বুঝি আমার উত্তম আছে কর্ম্ম॥
তোমা সভা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।
এত বলি কারো পায়ে ধরে সেই ঠাঁই॥
নিঙ্গাড়াইয়া বস্ত্র কারো করিয়া যতনে।
ধুতি বস্ত্র তুলি কারো দেন ত আপনে॥
কুশ গঙ্গামৃত্তিকা কাহারো দেন করে।
সাজি বহি কোন দিন চলে কারো ঘরে॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ খঃ ২য় অধ্যায়

এ ঠিক নূতন বৈষ্ণবোচিত ব্যবহার। এখানে অলৌকিকতার কোন চিহ্ন নাই।

ক্রমে ক্রমে ভক্তগণ সন্ধ্যাকালে বিশ্বম্ভরের গৃহে মিলিত হইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ সেখানে বোধ হয় কেবল ভক্তিগ্রন্থ পাঠ হইত। সাধারণতঃ বিশ্বম্ভরের পূর্ব্ব সহাধ্যায়ী মুকুন্দ দত্ত পাঠ করিতেন। তিনি অতি সুকণ্ঠ ছিলেন। তাঁহার পাঠ শুনিয়া বিশ্বম্ভর প্রেমাবেশে মত্ত হইয়া উঠিতেন।

"পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য ধ্বনি।
শুনিলেই আবিষ্ট হয়েন দ্বিজমনি ॥
হরি বোল বলি প্রভু লাগিলা গর্জ্জিতে।
চতুর্দ্দিকে পড়ে কেহ না পারে ধরিতে ॥
ত্রাস, হাস, কম্প, স্বেদ, পুলক, গর্জ্জন।
একবারে সর্ব্বভাব দিল দরশন ॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ খঃ, ২য় অধ্যায়)

ক্রমে পাঠ হইতে বোধ হয় সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের মাত্রা আরও বাড়িয়া চলিল। কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া দীর্ঘকাল ভাবাবেশে মগ্ন থাকিতেন। কখন হাসিতেন, কখন কাঁদিতেন, কখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। এক প্রহরেও সে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইত না, শ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইত, মৃতের মত পড়িয়া থাকিতেন। যখন কম্প আরম্ভ হইত তখন ধরিয়া রাখিতে পারা যাইত না।

"যখন প্রভুর হয় আনন্দ আবেশ।
কে কহিব তাহা সবে পারে প্রভুশেষ ॥
শতেক জনেও কম্প ধরিবারে নারে।
লোচনে বহয়ে শত শত নদী ধারে ॥

কণক পনশ যেন পুলকিত অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে বহু রঙ্গ॥
ক্ষণে হয় আনন্দ, মূর্চ্ছিত প্রহরেক।
বাহ্য হৈলে না বোলয়ে কৃষ্ণ ব্যতিরেক॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ খঃ ২য় অধ্যায়)

এই সকল বর্ণনায় কিছু অতিরঞ্জন থাকিতে পারে; কিন্তু এই সময় হইতে বিশ্বম্ভরের যে আশ্চর্য্য ভাবোদয় হইয়াছিল তাহা অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। বহুস্থানে তাহার বিবরণ আছে এবং তাহা দেখিয়াই বহুলোকের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রথম প্রথম লোকে ইহা দেখিয়া মনে করিয়াছিল এবুঝি পূর্ব্বের বায়ুরোগ। শচীদেবীরও মনে সেই ভয় হইয়াছিল। প্রতিবেশীরা তাঁহাকে আরও ভীত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা বলিতে লাগিল "ঠাকুরাণী! তুমি বুঝিতেছ না এ সেই পূর্ব্বের বায়ুরোগ" কেহবা হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে বলিল, কেহ বা ডাবনারিকেলজল, খাওয়াইতে উপদেশ দিল, কেহ বা শিবাঘৃত প্রভৃতি ঔষধের ব্যবস্থা করিল। সৌভাগ্যক্রমে একদিন প্রবীণ বৈষ্ণব শ্রীবাস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বোধ হয় শচীদেবী তাঁহার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীবাস আসিলে বিশ্বম্ভর উঠিয়া সম্ভ্রমে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন; কিন্তু ভক্ত দেখিয়া তাঁহার ভক্তি ভাব উছলিয়া উঠিল। লোমহর্ষ, অশ্রুপাত, কম্প প্রভৃতি হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জ্ঞান হইলে কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীবাস এসব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন এ ত মহাভক্তিযোগ, ইহাকে বায়ুরোগ কে বলে? এমন বায়ুরোগ পাইলে আমি ধন্য হইয়া যাইতাম। শ্রীবাসের কথায় শচীদেবী

আশ্বস্ত হইলেন। বিশ্বম্ভরও মনে বল পাইলেন। মনে হয় তাঁহার চিত্তে ও সময়ে সময়ে সংশয় আসিয়াছিল। বিশ্বম্ভর শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন আজ আপনি আমার বড় উপকার করিলেন। সকলেই বলিতেছে আমার বায়ুরোগ হইয়াছে। আপনিও যদি বায়ুরোগ বলিতেন তাহা হইলে গঙ্গায় ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতাম।

ক্রমে কীর্ত্তনের স্রোত বাড়িতে লাগিল সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির উচ্ছাস ও অদ্ভুত হইতে অদ্ভুততর হইতে লাগিল। এতদিন নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণ সাধারণের অবজ্ঞার পাত্র ছিলেন; তাঁহারা ছিন্ন বিছিন্নভাবে ভয়ে ভয়ে গোপনে সঙ্কীর্ত্তনাদি করিতেন। এখন মহাপণ্ডিত, সকলের সম্মানের পাত্র অধ্যাপক বিশ্বম্ভরের সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রকাশ্যে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে এ প্রকার সঙ্কীর্ত্তন এই নূতন আরম্ভ হইল বলিয়া মনে হয়। কেননা নগরে ইহা লইয়া মহা আন্দোলন উঠিয়াছিল। কেহ বলিতে লাগিল ইহাদের জ্বালায় রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, কেহ বলিতে লাগিল এগুলা কি পাগল হইল, কেহ বলিতে লাগিল জ্ঞানযোগ ছাড়িয়া এ কি কীর্ত্তন আরম্ভ করিল; কেহ বলিতে লাগিল মনে মনে ডাকিলে কি ভগবান শুনিতে পান না। বিরোধীদিগের প্রধান আক্রোশ শ্রীবাস পণ্ডিতের উপর পড়িয়াছিল; বোধহয় তাঁহার বাড়ীতে কীর্ত্তন হইত বলিয়া লোকে তাঁহাকেই প্রধান দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিল। তাহারা বলিতে লাগিল এই শ্রীবাসই সকল অনর্থের মূল। ক্রমে নগরে জনরব উঠিল যে রাজা নবদ্বীপে কীর্ত্তনের কথা শুনিয়া মহা ক্রুদ্ধ হইয়া যাহারা কীর্ত্তন করে তাহাদের ধরিয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন এবং সেইজন্য দুইখানা নৌকা আসিতেছে। নবদ্বীপে তখন মহাহুলস্থুল পড়িয়া গেল। বিরোধীরা বলিতে লাগিল "আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম মহা অনর্থ ঘটিবে। ইহাদের দোষে আমরা

সকলেই মারা যাইব। ইহারা তো কে কোথায় পলাইবে; রাজার লোকেরা আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবে"। কেহ বা বলিল "আমাদের কি দায়; আমরা শ্রীবাস পণ্ডিতকে বাঁধিয়া দিব"। কেহ বা বলিল "শ্রীবাসের ঘর ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দাও"। এই সকল কথায় বৈষ্ণবের মধ্যেও মহা ত্রাস উঠিল। সরল শ্রীবাস পণ্ডিতও ভীত হইলেন; কিন্তু বিশ্বম্ভর অবিচলিত রহিলেন। বৈষ্ণবদের ভয় দেখিয়া তিনি আরও অধিকতর দম্ভ করিয়া নগরে বেড়াইতে লাগিলেন।

"নির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন সুন্দর॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়াছেন সুগন্ধি চন্দন।
অরুণ অধরে শোভে কমল নয়ন॥
চাঁচর চিকুর শোভে পূর্ণচন্দ্রমুখ।
স্কন্ধে উপবীত শোভে মনোহর রূপ॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান অধরে তাম্বুল।
কৌতুকে কৌতুকে গেলা ভাগরথীকুল॥"

এই খানেই সাধারণ বৈষ্ণব ও শ্রীচৈতন্যদেবের পার্থক্য প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। প্রাচীন বৈষ্ণবগণ যখন ভয়ে ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন নবীন সাধক বিশ্বম্ভর তখন নির্ভীক। কেহ ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল এ কি আশ্চর্য্য!

"এত ভয় শুনিয়াও ভয় নাহি পায়।
রাজার কুমার যেন নগরে বেড়ায়॥"

আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিল ওসব লোক দেখান; পলাইবার ছল করিতেছে। বিশ্বম্ভর কোন কথা গ্রাহ্য না করিয়া নির্ভয়ে গঙ্গা-

পুলীনে বেড়াইতেছিলেন। এই সময়ে একপাল গরু ঊর্দ্ধপুচ্ছে হাম্বারব করিয়া জলপান করিতে গঙ্গায় নামিতে ছিল তাহা দেখিয়া বিশ্বম্ভরের বৃন্দাবন লীলার কথা মনে পড়িল। তিনি প্রেমাবেশে পূর্ণ হইয়া শ্রীবাসের গৃহ অভিমুখে চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন শ্রীবাস গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া রহিয়াছেন। বৈষ্ণবগ্রন্থকার লিখিয়াছেন তিনি নৃসিংহ পুজা করিতেছিলেন। তাহাও হইতে পারে অথবা তিনি ভয়ে দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীবাস যে ভীত হইয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশ্বম্ভর সবলে দ্বারে পুনঃপুন পদাঘাত করিয়া শ্রীবাসকে দ্বার খুলিতে বলিলেন। বৈষ্ণবজীবনচরিতরচয়িতা লিখিয়াছেন বিশ্বম্ভর শ্রীবাসকে বলিয়াছিলেন যে তুমি কাহার পূজা কর? তুমি যাহার পূজা করিতেছ আমি সেই কৃষ্ণ। এই বলিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে ষড়ভুজ, চতুর্ভুজ, দ্বিভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। এসকল অতি অসম্ভব কথা। স্পষ্টই পরবর্ত্তী কালের ভক্ত কল্পনা। প্রকৃত কথা এই মনে হয় শ্রীবাসকে মহা ভীত জানিয়া বিশ্বম্ভর তাঁহাকে আশ্বাস দিতে আসিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিয়াছিলেন তোমার কোনও ভয় নাই। যদি সত্য সত্যই রাজার লোক তোমাকে ধরিতে আসে, আমি সর্ব্বাগ্রে নৌকায় গিয়া বসিব এবং রাজাকে হরিনামে মাতাইব। রাজা কখন স্থির থাকিতে পারিবে না। পাত্রমিত্রসহ রাজা এমন কি রাজার সভার পশুপক্ষী পর্য্যন্তকে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে কাঁদাইব। ইহাতে কি তোমার বিশ্বাস হইতেছে না? যদি বিশ্বাস না হয় এই প্রত্যক্ষ দেখ। এই বলিয়া নিকটস্থ চারি বৎসরের বালিকা, শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণীকে বলিলেন "নারায়ণী! কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদ"! বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল। যদি পূর্ব্বেই ষড়ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়া থাকিবেন তাহা হইলে এত কথা বলিবার প্রয়োজন কি? হরিনাম

সঙ্কীর্ত্তনে রাজসভা বিগলিত করিবার কথাই বা কেন উঠে? নারায়ণীকে কাঁদাইয়া শ্রীবাসের বিশ্বাস উৎপাদনেরই বা প্রয়োজন কি?

অতঃপর বৈষ্ণবজীবনচরিতরচয়িতাগণ কতকগুলি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যবহারে ও কথায় তাঁহাকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ প্রমাণ করিতে চেষ্টাকরিয়াছেন। ক্রমে সেই সকল ঘটনার উল্লেখ করা যাইবে। এখানে সাধারণভাবে দুই একটি কথা বলা যাইতে পারে। দেখা যায় এইরূপ ঘটনা নবদ্বীপ অবস্থিতি কালেই বর্ণিত আছে পরবর্ত্তীজীবনে এইরূপ ঘটনার উল্লেখ অতি অল্প। এইরূপ হওয়ার কারণ কি বুঝিতে পারা যায় না। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ বলেন যে এখন হইতে শ্রীচৈতন্যদেব আত্ম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, অর্থাৎ তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণের অবতার তাহা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে ক্রমে এই আত্ম প্রকাশ আরও অধিক হইত কিন্তু সন্যাস গ্রহণের পরে এই প্রকার ব্যাপার আর বড় দেখা যায় না। নবদ্বীপ অবস্থান কালের বিবরণ চৈতন্য ভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনদাস বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থেই এইরূপ ঘটনার বাহুল্য দেখা যায়। সম্ভবতঃ ইহা গ্রন্থকারেরই বিশেষত্ব। বৃন্দাবনদাস অনেকস্থলে লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য দেব আপনাকে বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। 'মুঞি সেই মুঞি সেই' এই কথা চৈতন্য ভাগবতে অনেক স্থলে তাঁহার মুখে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন সাধারণতঃ এই ভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী তিনি সর্ব্বদাই আপনাকে দীনদাস মনে করিয়াছেন এবং কেহ যদি ভক্তিতে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন তিনি কর্ণে অঙ্গুলি দিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যভ্রমণ কালে একজন অন্ধ তাঁহাকে ঈশ্বর অবতার বলিয়া স্তুতি করিলে চৈতন্যদেব তাহাকে বলিয়াছিলেন এইরূপ কথা

বলিলে পাপ হয় এইরূপ কথা বলিয়া আমাকে অপরাধী করিবেন না।

"অন্ধের শুনিয়া বাণী চৈতন্য গোঁসাই।
বলে অপরাধী মোরে কেন কর ভাই॥
সকল হৃদয়ে হরি করেন বসতি।
জিজ্ঞাসিয়া দেখহ বলিবে ভগবতি॥
উচ্চারিলে যে কথা শুনিতে তাহা নাই।
মিছে কেন অপরাধী কর মোরে ভাই॥
সামান্য মনুষ্য আমি অধম পামর।
ভ্রান্তিকূপে পড়িয়াছে তোমার অন্তর॥

পরে আমরা আরও ইহার দৃষ্টান্ত পাইব সুতরাং এখানে আর অধিক দৃষ্টান্ত দেবার প্রয়োজন নাই। খুব সম্ভবতঃ বৈষ্ণব গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব বিষয়ে যে সকল বিবরণ আছে তাহা পরবর্ত্তী কালের জনশ্রুতি ও ভক্তকল্পনা। যাহা হউক এ বিষয়ে পাঠকগণ নিজেরাই বিচার করিবেন আমরা যথা সম্ভব ঘটনাগুলি উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীবাসকে ষড়্ভুজমূর্ত্তি দেখানর পর চৈতন্য ভাগবতে আর একটি তদনুরূপ ব্যাপার বর্ণিত আছে। একদিন বরাহাবতার বর্ণনা বিষয়ে একটি শ্লোক শুনিয়া বিশ্বম্ভর প্রেমাবেশে গর্জ্জন করিতে করিতে মুরারি গুপ্তের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শূকর শূকর বলিয়া গুপ্তের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তৎপরে পূজার গৃহে প্রবেশ করিয়া মাটিতে হাঁটু ও পাতিয়া চতুষ্পদ জন্তুর মত চলিতে এবং শূকরের মত গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সম্মুখে একটি গাড়ু দেখিয়া দাঁত দিয়া কামড়াইয়া তাহা তুলিলেন। মুরারি গুপ্ত এই সব দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

বৈষ্ণব জীবনচরিতরচয়িতা লিখিয়াছেন যে সেই সময়ে শূকরের মত তাঁহার চারিটী খুর বাহির হইয়াছিল। স্পষ্টই ইহা ভক্তকল্পনা। প্রকৃত ব্যাপারটি কি বৃন্দাবন দাসের নিজের কথাতেই বুঝিতে পারা যায়। শ্রীচৈতন্যদেব অসাধারণ ভাবপ্রধান মানুষ ছিলেন; যখন যে ভাবের কথা শুনিতেন সেই ভাবেই একেবারে ডুবিয়া যাইতেন এবং অনেক সময়ে তদনুরূপ ব্যবহারও করিতেন। তাঁহার জীবনে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। বৃন্দাবন দাস নিজেও তাহা লিখিয়াছেন।

"যখন যেরূপ শোনে সেইমত হয়।
দাস্যভাবে প্রভু যবে করেন ক্রন্দন॥
হইল প্রহর দুই গঙ্গা আগমন।
যবে হাসে তবে প্রভু প্রহরেক হাসে॥
মূর্চ্ছিত হইলে প্রহরেক নাহি শ্বাসে।
ক্ষণে হয় সানুভাব দম্ভ করি বৈসে॥
মুঁই সেই মুঁই সেই ইহা বলি হাসে॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য খণ্ড ৩য় অধ্যায়)

যখন যে ভাব প্রবল হইত তখন সেই ভাবে কথা বলিতেন ও ব্যবহার করিতেন। কখনও দাস্য ভাবে স্তুতি করিতেন, কখনও রাধাভাবে ক্রন্দন করিতেন, কখন অক্রূর ভাবে কথা বলিতেন, সম্ভবতঃ এইরূপে উপনিষদের'ব্রহ্মাস্মি'ভাবের শ্লোক শুনিয়া 'মুঁই সেই, মুঁই সেই', এইরূপ কথা বলিয়া থাকিতে পারেন; ভক্তেরা তাহা হইতেই তাঁহার অবতারত্ব কল্পনা করিয়াছেন। মুরারি গুপ্তের গৃহে বরাহ বিষয়ক ব্যাপার ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। সেদিন বরাহভাবের শ্লোক শুনিয়া

বরাহভাব জাগিয়া উঠিল, হাতে পায়ে ভর দিয়া বরাহের মত চলিতে ও গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এইরূপ আর একদিন শ্রীবাসের গৃহে বলরামভাবের আবেশ হইয়াছিল। তখন সবে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া বিশ্বম্ভরের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন শ্রীবাসের গৃহে নিত্যানন্দের ব্যাস পূজার আয়োজন হইয়াছে হঠাৎ বিশ্বম্ভর বিষ্ণুখট্টার উপর বসিয়া 'মদ আন, মদ আন' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দকে বলিলেন শীঘ্র আমার মুষল দেহ; তাঁহার মনে তখন বলরাম ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে তাই মুষল চাহিতেছেন এবং বলরাম যেমন মদ্য পান করিতেন সেইরূপ মদ্য চাহিতেছেন। ভক্তেরা যুক্তি করিয়া ঘটপূর্ণ করিয়া গঙ্গাজল দিলেন; তিনি নিঃশেষে তাহা পান করিলেন। এই প্রকার আবেশ তাঁহার প্রায়ই হইত; আবেশ চলিয়া গেলে নিজেই লজ্জিত হইতেন এবং বলিতেন 'আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম।' ইহা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব; কেহ কেহ ইহাকে দুর্ব্বলতা মনে করিতে পারেন, কেহ বা ইহাতে তাঁহার মহত্ত্বই দেখেন। দুর্ব্বলতাই হউক আর মহত্ত্বই হউক, ইহাতে তাঁহার অবতারত্ব সপ্রমাণ হয় না। কেন না কখনও যেমন বলরাম ভাব পাইয়াছেন, বা কখনও 'মুঁই সেই' বলিয়াছেন, অন্য সময়ে আপনাকে অক্রূর, শ্রীদাম, রুক্মিনী প্রভৃতিও মনে করিয়াছেন।

এইরূপে নবদ্বীপে দিনে দিনে ভাবতরঙ্গ উছলিত হইতে লাগিল। ভাবের সাগর বিশ্বম্ভর নিত্যনূতন ভাবের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার চরিত্রে অসাধারণ মৌলিকতা ছিল। ভক্তগণ তাঁহার নূতন নূতন ভাব বিকাশ দেখিয়া একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। নানাস্থান হইতে ব্যাকুলাত্মাগণ আসিতে লাগিলেন। এদিকে প্রবীণ বৈষ্ণব

অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুরে গিয়া বসিয়া থাকিলেন। শান্তিপুর এবং নবদ্বীপ উভয় স্থানেই তাঁহার বাসগৃহ ছিল। ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে তিনি কখনও শান্তিপুর, কখনও নবদ্বীপে অবস্থান করিতেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে পরিচয়ের পরেই কোন কারণে তিনি শান্তিপুর চলিয়া গিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ বলেন যে তিনি চৈতন্যদেবকে পরীক্ষা করিবার জন্য শান্তিপুর গিয়াছিলেন। তাহাই যদি হইল তবে ষড়ভুজ দর্শনেব কি ফল হইল? স্বপ্ন ও যোগবল ষড়ভুজ দর্শনেও যদি বিশ্বাস না হয়, তবে আর কিসে হইবে? যাহা হউক বিশ্বম্ভর অদ্বৈতাচার্য্যকে আনিবার জন্য শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা রামাইকে শান্তিপুর প্রেরণ কবিলেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। প্রেমিক বিশ্বম্ভর প্রবীণ বৈষ্ণব অদ্বৈতাচার্য্যকে নিকটে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তাই রামাই পণ্ডিতের মুখে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, যে তিনি যেন অবিলম্বে নবদ্বীপে আসেন। তাঁহাকে নিত্যানন্দের নবদ্বীপ আগমনের কথা জানাইতে বলিয়া দিলেন। রামাই পণ্ডিতের নিকট নবদ্বীপের সকল বিবরণ শুনিয়া অদ্বৈতাচার্য্য নবদ্বীপে আগমন করিয়া ভক্তিতরঙ্গে মাতিয়া উঠিলেন। ইহাই প্রকৃত কথা বলিয়া মনে হয় কিন্তু বৈষ্ণব গ্রন্থকাবেরা ইহাতে অনেক অস্বাভাবিক কথা যোগ করিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন, যে, অদ্বৈতাচার্য্য, বিশ্বম্ভর সত্যই কৃষ্ণের অবতার কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য নবদ্বীপ ছাড়িয়া শান্তিপুর চলিয়া গেলেন; বিশ্বম্ভর ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন 'নাড়া আমাকে বৈকুণ্ঠ হইতে আনিয়া শান্তিপুরে বসিয়া রহিল!' (সম্ভবতঃ বৃদ্ধ অদ্বৈতের মস্তকে কেশ ছিল না। এইজন্য কেহ কেহ তাঁহাকে 'নাড়া' বলিতেন। কেহ কেহ মনে করেন শ্রীহট্টের নাড়িয়াল পরগণায় তাহার জন্মস্থান বলিয়া

চৈতন্যদেব তাঁহাকে নাড়া বলিতেন!) যাহা হউক বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত আছে তিনি রামাই পণ্ডিতকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে তুমি অদ্বৈতের নিকটে গিয়া বল, 'যে যার জন্য বিস্তর ক্রন্দন, উপবাস ও আরাধনা করিলে, সেই প্রভু ভক্তিযোগ বিলাইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তুমি পূজার উপকরণ লইয়া অবিলম্বে সস্ত্রীক নবদ্বীপে আইস।' শ্রীচৈতন্যদেব কখনও এমন দাম্ভিক কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক রামাই পণ্ডিত বিশ্বম্ভরের কথা যথাযথ তাঁহাকে বলিলে অদ্বৈতাচার্য্য দুই বাহু তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে সস্ত্রীক নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন কিন্তু রামাইকে বলিয়া দিলেন যে 'আমি নবদ্বীপে গিয়া নন্দনাচার্য্যের ঘরে লুকাইয়া থাকিব, তুমি গিয়া বিশ্বম্ভরকে বলিও যে আচার্য্য আসিল না।' রামাই পণ্ডিত তাহাই করিলেন। কিন্তু সকল হৃদয়বাসী বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের সঙ্কল্প জানিতে পারিলেন; রামাইকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, আমাকে পরিক্ষা করিবার জন্য নাড়া নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া থাকিয়া তোমাকে পাঠাইয়াছে। শীঘ্র তাহাকে এখানে আসিতে বল। রামাই তাহাই করিল। তখন সস্ত্রীক অদ্বৈতাচার্য্য দূর হইতে দণ্ডবৎ করিতে করিতে বিশ্বম্ভরের নিকটে আসিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে বিশ্বম্ভর জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধরিয়া বসিয়া আছেন।

"দুই বাহু কোটি কনকের স্তম্ভ যিনি।
তঁহি দিব্য অলঙ্কার রত্নের খেঁচুনি॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মহামণি শোভে বক্ষে।
মকর কুণ্ডল বৈজয়ন্তীমালা দেখে॥
কোটি মহাসূর্য্য জিনি তেজে নাহি অন্ত।
পাদ পদ্মে রমা ছত্র ধরয়ে অনন্ত॥"

আরও দেখিলেন যে চারিদিকে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ স্তুতি করিতেছে। অন্তরীক্ষে অসংখ্য দেবগণের রথ, গজ, হংস, অশ্বে আকাশ পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অদ্বৈতাচার্য্য এই সব দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন; তাঁহার মুখে আর কথা বাহির হইল না। বিশ্বম্ভর তখন বলিলেন, "যে তোমার আরাধনায় আমি অবতীর্ণ হইয়াছি; ক্ষীরসমুদ্রে আমি ঘুমাইয়া ছিলাম, তোমার হুঙ্কারে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল"। এই কথা শুনিয়া সস্ত্রীক অদ্বৈতাচার্য্য উর্দ্ধবাহু হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "আজ আমার জন্ম সার্থক হইল।" বিশ্বম্ভর বলিলেন, "আমাকে পূজা কর।" অদ্বৈতাচার্য্য সুবাসিত জলে বিশ্বম্ভরের পদ ধৌত করিয়া চন্দন, তুলসীমঞ্জরী, গন্ধ পুষ্প, ধূপ দিয়া তাঁহার পূজা করিলেন এবং তাঁহার স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। বিশ্বম্ভর বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যের মস্তকে স্বীয় চরণ স্থাপন করিলেন। ভক্তগণ ইহা দেখিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। এই সকল স্পষ্টই পরবর্ত্তীকালের ভক্তগণের অন্ধ বিশ্বাসের কল্পনা। ইহাতে চৈতন্য দেবের মাহাত্ম্য কিছু বাড়ে না বরং তাঁহাকে হীন করা হয়।

এই সময়ে আর একজন ভক্ত নবদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁহার নাম পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, চট্টগ্রামে জন্মস্থান। চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব্ব হইতে তাঁহার ধর্ম্মে অতিশয় অনুরাগ ছিল; ভগবানের নামে অশ্রু, কম্প, পুলক দেখা দিত, কিন্তু বাহিরে বিষয়ীর ন্যায় ছিলেন। তিনি বেশ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। নবদ্বীপে যখন আগমন করেন তখন সঙ্গে বহুলোকজন আসিয়াছিল এবং তাঁহার বাড়ীতে বহু মূল্য আসবাব—বাদির বর্ণনা আছে। ইতিপূর্ব্বে তিনি চৈতন্যদেবের নাম শুনিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না; সম্ভবতঃ তিনি গঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্য

নবদ্বীপে আগমন করেন। গঙ্গার প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তি ছিল। লিখিত আছে গঙ্গায় পাদস্পর্শের ভয়ে তিনি গঙ্গায় স্নান করিতেন না; কেবল গঙ্গাজল তুলিয়া মস্তকে দিতেন; লোকে গঙ্গায় দন্তধাবন, কেশ সংস্কারাদি করে বলিয়া তিনি বড় দুঃখিত হইতেন। শ্রীচৈতন্যদেবও যে সাক্ষাতের পূর্ব্বে তাঁহাকে জানিতেন তাহা মনে হয় না তবে বৈষ্ণব গ্রন্থকার এখানেও কিছু অলৌকিক ব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে পুণ্ডরীকের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার নাম ধরিয়া কবে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া ক্রন্দন করিতেন। মুকুন্দদত্তের সঙ্গে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পরিচয় ছিল; তাঁহাদের উভয়েরই জন্মস্থান চট্টগ্রামে সম্ভবতঃ মুকুন্দই বৈষ্ণব মণ্ডলীতে তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া দেন। পুণ্ডরীক নবদ্বীপ আসিয়া স্বভাবতই মুকুন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া থাকিবেন। মুকুন্দও স্বগ্রামবাসী বৈষ্ণবের আগমনে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া থাকিবেন। গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে মুকুন্দের অতি ঘনিষ্ট সদ্ভাব ছিল, সম্ভবতঃ গদাধরকেই সর্ব্বপ্রথমে তিনি পুণ্ডরীকের আগমন সংবাদ জানাইয়াছিলেন। গদাধর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মুকুন্দের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে যান; কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া গদাধরের মনে অশ্রদ্ধার ভাবই প্রবল হইয়াছিল। কেননা তিনি দেখিলেন পুণ্ডরীক নানাবর্ণে শোভিত সুন্দর খট্টার উপরে বসিয়াআছেন, সুকোমল শয্যা, পরিধানে সূক্ষ্মবস্ত্র, নিকটে ৫।৭টী ছোট বড় জলপাত্র; পিত্তলের বাটায় পান; দুইজন লোক দুইপাশে দাঁড়াইয়া ময়ূরপুচ্ছের পাখায় বাতাস করিতেছে, গাত্রে বস্ত্রে বহুবিধ সুগন্ধি দ্রব্যের আভ্রাণ বাহির হইতেছে; গদাধর দেখিয়া মনে করিলেন, "এত বেশ বৈষ্ণব দেখিতেছি!" মুকুন্দ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া স্বীয় স্বাভাবিক সুকণ্ঠে একটি

ভক্তিবিষয়কশ্লোক পাঠ করিলেন। শ্লোক শুনিবামাত্রই বিদ্যানিধি ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন এক কালে অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক হুঙ্কার দেখা দিল। তিনি 'বোল বোল' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির থাকিতে না পারিয়া ভূমিতে গড়াইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার পায়ের আছাড়ে পানের বাটা গন্ধাধার প্রভৃতি পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। তিনি 'কৃষ্ণরে, ঠাকুররে, আমাকে এমন পাষাণ করিয়া সৃষ্টি করিলে'! বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন আছাড় খাইতে লাগিলেন যে লোকের ভয় হইল যে সব হাড় ভাঙ্গিয়া যাইবে। গদাধর এই সব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; তিনি মনে করিলেন এমন বৈষ্ণবকে অবজ্ঞা করিয়া আমি মহাপাপ করিয়াছি এবং স্থির করিলেন যে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পুণ্ডরীকের নিকটে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। মুকুন্দ এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং পুণ্ডরীকও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। গদাধর শ্রীচৈতন্যের নিকটে পুণ্ডরীকের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন; তিনি এই সংবাদে অতিশয় আনন্দিত হইয়া পুণ্ডরীককে তাঁহার নিকটে আনিতে বলিয়া থাকিবেন, পুণ্ডরীক রাত্রিতে গোপনে একাকী আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় হইল এবং পুণ্ডরীক শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে পরিগণিত হইলেন।

এই সময়ের আর একটি ঘটনায় শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রের মহত্ত্ব ও আকর্ষণী শক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি যে অধ্যাপনার সময়ে তিনি শ্রীধর নামক একজন দরিদ্র কলা মূলা প্রভৃতি বিক্রেতার উপরে জোর করিয়া বিনামূল্যে বা অল্প মূল্যে থোড় কলা প্রভৃতি লইয়া যাইতেন। সে ব্যক্তি অতি দীন এবং ব্যাকুলাত্মা

ছিল। বিশ্বম্ভর তাহা বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন। এখন তাঁহার কথা মনে হইল এবং সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিবার জন্য তাঁহাকে আনিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। দরিদ্র নগণ্য তরকারী বিক্রেতা শ্রীধর ইহাতে অতিশয় সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবেন এবং সঙ্কীর্ত্তন প্রমত্ত চৈতন্যদেবও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন। ভক্ত গ্রন্থকারগণ এই সহজ কথার মধ্যে অনেক রহস্য কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন শ্রীধর আসিয়া দেখিলেন বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন :—

"মাথা তুলি চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর।
তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর॥
হাতে বংশীমোহন দক্ষিণে বলরাম।
মহাজ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান॥
কমলা তাম্বূল দেই হস্তের উপরে।
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আগে স্তুতি করে॥
মহা ফণা ছত্র দেখে শিরের উপরে।
সনক নারদ শুক দেখে জোড় করে॥
প্রকৃতি স্বরূপা সব জোড় হস্ত করি।
স্তুতি করে চতুর্দ্দিকে পরমা সুন্দরী"॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য খণ্ড৯ম অধ্যায়)

পাঠকগণ সম্ভবতঃ এই প্রকার বিবরণে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন এবং ইহার প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিয়াছেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে ভূরি ভূরি এইরূপ বিবরণ আছে; আর তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীধর এখন হইতে শ্রীচৈতন্যের ভক্তদলের একজন হইলেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিতেন।

মণ্ডলীগঠন ও ধর্ম্মপ্রচার।

এখন প্রতিদিন দিবসে ও রাত্রিতে ভক্ত সঙ্গে মিলিয়া সঙ্কীর্ত্তন চলিতে লাগিল; শ্রীবাসের বাটীতে সাধারণতঃ সঙ্কীর্ত্তন হইত; আমরা দেখিয়াছি, প্রথম প্রথম শ্রীচৈতন্যদেবের নিজের গৃহেই ভক্তগণ আসিয়া ভক্তিগ্রন্থ পাঠ বা সঙ্কীর্ত্তনের জন্য মিলিত হইতেন; কিন্তু উত্তরকালে শ্রীবাসের গৃহপ্রাঙ্গনই সঙ্কীর্ত্তনের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল। কোন সময়ে বা কেন শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবাসের গৃহে সঙ্কীর্ত্তনের স্থান নির্দ্দেশ করেন তাহা ঠিক জানা যায় না। বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই কোন কোন বৈষ্ণব শ্রীবাসের গৃহে মিলিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। বিশ্বম্ভরের যখন বৈষ্ণবদলের সঙ্গে পরিচয় ও আত্মীয়তা হইল তখন আর নিজ গৃহে পৃথক আয়োজন না করিয়া শ্রীবাসের গৃহে বৈষ্ণবদের সঙ্গে মিলিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কখনও কখনও চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে মিলিত হওয়ার উল্লেখ দেখা যায় কিন্তু ক্রমে শ্রীবাসাচার্য্যের গৃহেই বৈষ্ণবদিগের মিলনের স্থান হইয়া উঠিয়াছিল।

এখন নবদ্বীপের বৈষ্ণবদল বেশ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রবীণ বৈষ্ণব অদ্বৈতাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীবাস ও তাঁহার তিন ভ্রাতা চন্দ্রশেখরাচার্য্য, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, মুরারীগুপ্ত, মুকুন্দদত্ত, গদাধর পণ্ডিত, অবধূত, নিত্যানন্দ, যবন ভক্ত হরিদাস, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, গঙ্গাদাস, হিরণ্য, বনমালী, নন্দনাচার্য্য, বুদ্ধিমন্ত খাঁ, শ্রীমান পণ্ডিত, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, বক্রেশ্বর, সদাশিব, পুরুষোত্তম সঞ্জয়, গোপিনাথ, শ্রীধর প্রভৃতি বহুভক্ত আসিয়া জুটিয়াছেন; সকলেই শ্রীচৈতন্যের প্রতি গভীর অনুরাগে যুক্ত। তিনি ও তাঁহাদিগকে প্রাণের সমান দেখিতেন। সকলের মধ্যে নিত্যানন্দের সঙ্গেই তাঁহার গভীরতম যোগ হইয়াছিল

বলিয়াই মনে হয়। দুইজন সহোদর ভ্রাতার অপেক্ষাও ঘনিষ্ঠ প্রেমে যুক্ত ছিলেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ ও বলরামের অবতার মনে করিতেন; ইহাতে বোঝা যায়, যে নিত্যানন্দের সঙ্গে বিশ্বম্ভরের অল্পদিনের মধ্যেই গভীর যোগ হইয়াছিল। কি কারণে সকল বৈষ্ণবের মধ্যে নিত্যানন্দের সঙ্গে বিশ্বম্ভরের এইরূপ আত্মীয়তা হইয়াছিল ঠিক বোঝা যায় না। যাহা হউক, নবদ্বীপের এই বৈষ্ণব মণ্ডলীতে যে প্রেমের সম্বন্ধ হইয়াছিল তাহা জগতে অতুলনীয়। শ্রীচৈতন্যদেব ইঁহাদের লইয়া নিত্য হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইতেন। সন্ধ্যা হইতেই ভক্তগণ শ্রীবাসের গৃহে আসিয়া মিলিত হইতেন এবং দলে দলে কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে মুকুন্দ অতি সুগায়ক ছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতও সুন্দর গান করিতে পারিতেন। আরও অনেকে সুগায়ক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কীর্ত্তনের সঙ্গে বোধ হয় এখন হইতে খোলের বাদ্য হইত। শ্রীচৈতন্য, নিতানন্দ প্রেমে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন; ভাবে মত্ত হইয়া একে অপরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেন। সঙ্কীর্ত্তনের রবে আকৃষ্ট হইয়া বহুলোক আসিয়া জনতা করিত, জনতার ভয়ে অবশেষে বহির্দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে হইত; সম্ভবতঃ বিরোধী লোকের আগমন বন্ধ করাও আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। বৈষ্ণবেরা মনে করিতেন, বিরোধী লোক উপস্থিত থাকিলে ভাবোদয় হয় না। এ সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ ঘটনা লিখিত আছে। শ্রীবাসের শাশুড়ী এই বৈষ্ণব দলের বিরোধী ছিলেন। সেই কারণে বোধ হয় তাঁহাকে কীর্ত্তনের স্থানে আসিতে দেওয়া হইত না। বৃদ্ধা একদিন সঙ্কীর্ত্তন দেখিবার জন্য নিতান্ত কৌতুহল পরবশ হইয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভের পূর্ব্বেই গৃহের মধ্যে একটি ডোলের নীচে লুকাইয়া থাকিলেন। যথা সময়ে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল; কিন্তু অন্যদিনের মত

কীর্ত্তন জমিল না। চৈতন্যদেব বারবার বলিতে লাগিলেন, "আজ কেন কীর্ত্তনে সুখ পাইতেছি না, বোধ হয় কোন বিরোধী উপস্থিত আছে; কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোন বিরোধীকে দেখিতে পাওয়া গেল না, পূর্ব্ব হইতেই বহির্দ্বার বন্ধ করা হইয়াছিল; ভক্তগণ বিশেষ আগ্রহের সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তথাপি ভাবোদয় হইল না; শ্রীচৈতন্যদেব অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, আজ কেন এমন হইতেছে, নিশ্চয় কোন বিরোধী আসিয়াছে, তখন আবার অনুসন্ধান করা হইল; শ্রীবাস গৃহমধ্যে গিয়া ডোলের নীচে লুক্কায়িত তাঁহার শাশুড়ীকে দেখিতে পাইলেন এবং চুল ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে গৃহের বাহির করিয়া দিলেন; তখন ভক্তগণ মহা উৎসাহে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন এবং ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইল। এইরূপে সঙ্কীর্ত্তনে এক এক দিন প্রায় রাত্রি শেষ হইয়া যাইত, একদিন সাত প্রহর ব্যাপী সঙ্কীর্ত্তনের বর্ণনা আছে, ভক্তগণ কীর্ত্তনে এমন মত্ত হইতেন, যে তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। লিখিত আছে, যে একরাত্রি এমনই কীর্ত্তন হইতেছে, এমন সময়ে শ্রীবাসের অষ্টম বর্ষীয় একটি পুত্রের মৃত্যু হয়; এই সংবাদে কীর্ত্তনের রস ভঙ্গ হইবে বলিয়া শ্রীবাস তাঁহার পত্নী ও অন্যান্য সকলকে চুপ করিয়া থাকিতে বলিলেন; তাঁহারাও শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া স্থির হইয়া থাকিলেন; যথা সময়ে সঙ্কীর্ত্তন ভঙ্গ হইলে শ্রীচৈতন্যদেব এই সংবাদ জানিতে পারিলেন; তিনি শ্রীবাস ও তাঁহাব পরিবারের এই আশ্চর্য্য সংযম ও ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, পণ্ডিত, তোমার এক পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। আমি ও নিত্যানন্দ তোমার দুই পুত্র হইলাম।

বৈষ্ণবমণ্ডলী হরিনাম সুধাপানে কৃতার্থ হইতেছেন; সেই নাম-সুধা জনসাধারণকেও দিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব ব্যগ্র হইলেন। তিনি

নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে ডাকিয়া নবদ্বীপের ঘরে ঘরে হরিনাম বিলাইতে আদেশ করিলেন।

"একদিন আচম্বিতে হইল হেন মতি।
আজ্ঞা কইল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি॥
শোন শোন নিত্যানন্দ, শোন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বল, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
ইহা বই আর বলি না বলাই বা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ১৬শঃ অঃ)

এখন হইতে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ হইল। এতদিন অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলীতে যে প্রেমের সাধনা চলিতেছিল, এখন তাহা পরিপূর্ণ নদীর ন্যায় দুই কূল ছাপাইয়া সমগ্রদেশে ব্যাপ্ত হইতে চলিল। মহা-প্রেমিক নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে উপযুক্ত পাত্র মানিয়া তাঁহাদিগের প্রতি আদেশ হইল যে তাঁহারা ঘরে ঘরে গিয়া হরিনাম প্রচার করুন। ইঁহাদের একজন হিন্দুবংশ সম্ভূত ও অপরে যবনবংশ সম্ভূত; যদিও শ্রীচৈতন্যদেব নিজে ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইলেন না কিন্তু তিনি এই প্রচার আয়োজনের তন্ত্রধারক। অনুচরদিগের প্রতি আদেশ করিলেন যে দিবসের কার্য্য সমাপনান্তে তাঁহার নিকটে আসিয়া সমুদয় বিবরণ দিবেন। শ্রীচৈতন্যদেব কেবল ভাবুক-মাত্র ছিলেন না। অতি বিচক্ষণ কর্ম্মীও ছিলেন, উত্তর জীবনে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এই প্রথম প্রচারোদ্যমেই তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; উপযুক্ত সময় যোগ্য পাত্র এবং প্রকৃত প্রণালী

নির্ব্বাচনে তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এতদিন বাহিরে যান নাই, একান্ত মনে অন্তরঙ্গ দলে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন। যখন ভক্তদল গঠিত হইল, ভগবদভক্তিতে এবং পরস্পরের প্রতি প্রেমে তাঁহারা শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন, তখন সময় বুঝিয়া চৈতন্যদেব প্রকাশ্যে জনসাধারণের মধ্যে ভক্তি ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি বলিলেন, ঘরে ঘরে গিয়া লোকের পায়ে ধরিয়া হরিনাম গ্রহণ করিতে অনুরোধ কর। নিত্যানন্দ, হরিদাস ভক্তি ধর্ম্মপ্রচারের যথার্থই উপযুক্ত পাত্র। উভয়েই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। ভগবদ্ ভক্তিতে আত্মহারা শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞা পাইয়া তাঁহারা নবদ্বীপের ঘরে ঘরে গিয়া বিনয়ে সকলকে ভগবদ অর্চ্চনা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

> "নিত্যানন্দ হরিদাস বোলে এই ভিক্ষা।
> কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ ভজ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
> বোল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে।
> কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
> হেন কৃষ্ণ বোলো ভাই হই এক মন॥"

ভিক্ষার স্বরূপ তাঁহারা লোকের নিকটে এই অনুগ্রহ চাহিলেন। কিন্তু উত্তরকালের বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ কেবল ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা ইহার সঙ্গে সুদর্শন চক্রের ভয় যোগ করিয়া দিয়াছেন।

> "তোমরা করিলে ভিক্ষা যেই না বলিব।
> তবে আমি চক্র হস্তে সভাকে কাটিব॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ১৩শ অঃ)

ইহাতেই বোঝা যায় তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃতি সম্বন্ধে কত

ভুল করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তরবারী বা সুদর্শন চক্রের ভয় দেখাইয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই। তিনি পায়ে ধরিয়া হরিনাম ভজাইতে বলিতেন। তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগকে দন্তে তৃণ করিয়া ভগবানের নাম করিতে বলিতেন।

শ্রীচৈতন্যদেব জানিতেন যিনি তৃণ হইতে দীন না হইয়াছেন, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু না হইয়াছেন, ধর্ম্মপ্রচার করিতে তাঁহার অধিকার নাই। তিনি যে সুদর্শন চক্রের ভয় দেখাইবেন তাহা কখনও সম্ভব নহে।

নিত্যানন্দ ও হরিদাস শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞানুসারে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে গিয়া হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। লোকে ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইল।

"অপরূপ শুনি লোক দুই যেন মুখে।
নানা জনে নানা কথা কহে নানামুখে॥"

এইরূপ ধর্ম্মপ্রচার নবদ্বীপে নূতন ব্যাপার, সুতরাং লোকে বিস্মিত হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের প্রচার চেষ্টার ন্যায় ইহারও ফল পাত্র-বিশেষে বিভিন্ন প্রকারের হইতে লাগিল; কেহ বলিতে লাগিল, "ইহা ভাল কথা, আমি পালন করিব।" কেহবা অসন্তুষ্ট হইল। কেহ বা তাহাদিগকে পাগল বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

"করিব করিব কেহ বলয়ে সন্তোষে।
কেহ বলে দুইজন ক্ষিপ্ত মন্ত্র দোষে॥
তোমরাহ পাগল হইয়া মন্ত্র দোষে।
আমা সবা পাগল করিতে আইল কিসে॥
যেগুলা চৈতন্য নিত্যে না পাইল দ্বার।
তার বাড়ি গেলে মাত্র বলে 'মার, মার'॥"

এমন কি কেহ তাঁহাদিগকে চোর মনে করিতে লাগিল; 'ছল করিয়া চুরি করিতে আসিতেছে। আবার আসিলে ধরিয়া রাজদ্বারে লইয়া যাইব।'

"কেহ বোলে দুই জন কিবা চোর চর।
ছলা করি চর্চ্চিয়া বুলয়ে ঘরে ঘর।
এ মত প্রকট কেনে করিব সুজনে॥"

নিত্যানন্দ হরিদাস এ সকল কথা গ্রাহ্য না করিয়া প্রতিদিন নবদ্বীপের ঘরে ঘরে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন এবং দিনান্তে বিশ্বম্ভরের নিকটে গিয়া দিনের কার্য্যের বিবরণ দিতেন। এইরূপে প্রচার করিতে করিতে একদিন পথে দুইজন মাতালকে দেখিতে পাইলেন। তাহাদের ভীষণ মূর্ত্তি মদের নেশায় নিরন্তর কুবাক্য বলিতেছে; তাহাদের দেখিয়া নিত্যানন্দের হৃদয়ে বড দয়া হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাহারা ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত কিন্তু কুসঙ্গে পড়িয়া তাহাদের এমন দুর্গতি হইয়াছে, তাহারা না করিয়াছে এমন পাপ নাই। তাহাদের ভয়ে সকলে দূরে পলায়।

"ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
টাকা চুরি পরগৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ॥
দেয়ানে নাহিক দেখা বোলায়ে কোটাল।
মদ্যপান বিনে আর নাহি যায় কাল॥
দুইজন পথে পড়ি গড়া গড়ি যায়।
যাহারে যে পায় সেই তাহারে কিলায়॥
দূরে থাকি লোক সব পথে দেখে রঙ্গ।"

জগাই মাধাইএর এই চিত্র সম্ভবতঃ কিছু অতিরঞ্জিত। তাহা হইলেও তাহারা যে অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। নিত্যানন্দ ও

হরিদাস ইহাদিগকে জানিতেন না। তাহারা যদি প্রসিদ্ধ দস্যু হইত, তাহা হইলে তাহাদের না জানা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক লোকমুখে তাহাদের পরিচয় পাইয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাহাদিগকে দুষ্কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ ভজিবার উপদেশ দিবার সংকল্প করিলেন। লোকে শুনিয়া তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিল, "উহাদের নিকটে যাইও না। লোকে উহাদের ভয়ে দূরে পলায়। উহাদের ধর্ম্মজ্ঞানের লেশমাত্র নাই, নিকটে পাইলে তোমাদের প্রাণে বধ করিতেও পারে।"

"সাধু লোকে মানা করে নিকটে না যাও।
নাগালি পাইলে পাছে পরাণ হারাও॥
আমরা অন্তরে থাকি পরম তরাসে।
তোমরা নিকটে যাহ কেমন সাহসে॥
কিসের সন্ন্যাসীজ্ঞান ও দুইর ঠাঁই।
ব্রহ্ম বধে গোবধে যাহার অন্ত নাই॥

নিত্যানন্দ ও হরিদাস সে কথা না শুনিয়া তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া ডাকিয়া বলিলেন—

"বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
তোমা সভা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছাড় অনাচার॥"

তাঁহাদের কথা শুনিয়া জগাই মাধাই ক্রোধে আরক্ত নয়নে তাঁহাদের দিকে তাকাইল এবং 'ধর, ধর' বলিয়া তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইল। নিত্যানন্দ ও হরিদাস ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

"ধর ধর বলি দোঁহে ধরিবারে যায়।
আথে ব্যাথে নিত্যানন্দ হরিদাস ধায়॥

ধাইয়া আইসে পাছে তর্জ্জ গর্জ্জ করে।
মহাভয় পাই দুই প্রভু ধায় ডরে॥"

নিকটবর্ত্তী লোকেরা বলিতে লাগিল 'আমরা তখন নিষেধ করিয়াছিমাম.' দুষ্ট লোকেরা বলিতে লাগিল, "এই ভণ্ডদের আজ উচিত শাস্তি হইবে। ভাল লোকেরা বলিতে লাগিল "কৃষ্ণ রক্ষা কর, কৃষ্ণ রক্ষা কর" সকলেই ভয়ে দূরে সরিয়া গেল। নিত্যানন্দ হরিদাস দৌড়িয়া পলাইতে লাগিলেন। জগাই মাধাই পাছে পাছে "এই ধরিলাম, এই ধরিলাম বলিয়া আসিতে লাগিল।" নিত্যানন্দ বলিলেন, "ভাল বৈষ্ণব হইল, আজ প্রাণে বাঁচিলে হয়।" হরিদাস বলিলেন, "তোমার দোষেই অপমৃত্যু ঘটিবে। যেমন মাতালকে কৃষ্ণ উপদেশ দিতে গেলে আজ তার উপযুক্ত শাস্তি হইল। এই বিবরণ কতটা সত্য তাহা বলা যায় না। নিত্যানন্দ ও হরিদাস এত সহজেই যে এরূপ ভীত হইবেন তাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু বৃন্দাবন দাস বার বার লিখিয়াছেন যে তাঁহারা ভয়ে পলাইয়াছিলেন।

"ত্রাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া।
রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ গোবিন্দ বলিয়া॥"

অপর দিকে দুই জনে পরস্পরের মধ্যে হাসি ঠাট্টা চলিতেছিল। যাহা হউক সে দিনের মত পলাইয়া রক্ষা পাইলেন। ছুটিয়া হরিদাস ও নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য যেখানে ভক্তগণের সঙ্গে বসিয়া ধর্ম্মালাপ করিতেছিলেন সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সকল কথা বলিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব জগাই মাধাইএর বিবরণ শুনিয়া বলিলেন, এখানে আসিলে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিব।

"প্রভু বলে জাঁনো জাঁনো সেই দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমুঁ আইলে মোর এথা॥"

জগাই মাধাই অনেকদূর নিত্যানন্দ ও হরিদাসের পশ্চাতে আসিয়া মদের ঝোঁকে পথে পড়িয়া মারামারি করিতে লাগিল। ইহার পরে তাহারা সময়ে সময়ে দূরে থাকিয়া বৈষ্ণবদের সঙ্কীর্ত্তন শুনিত, এরূপ বিবরণ আছে।

"প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশাভাগে।
সর্ব্বরাত্রি প্রভুর কীর্ত্তন শুনি জাগে॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্ত্তনের সঙ্গে।
মদ্যের বিক্ষেপে তারা শুনি নাচে রঙ্গে॥
দূরে থাকি সব ধ্বনি শুনিবারে পায়।
শুনিলেই নাচিয়া অধিক মদ্য খায়॥
যখন কীর্ত্তন রহে, সেই দুই রহে।
শুনিয়া কীর্ত্তন পুনঃ উঠিয়া নাচয়ে॥"

সম্ভবতঃ এখন তাহারা বৈষ্ণবদের কীর্ত্তন শুনিয়া কিছু আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে। অতঃপর একদিন রাত্রিতে নিত্যানন্দ নগর ভ্রমণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের নিকটে যাইতেছিলেন এমন সময়ে পথে জগাই মাধাইএর সম্মুখে পড়িলেন। জগাই মাধাই কে রে কে রে বলিয়া চীৎকার করিল। নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন 'আমি প্রভুর বাড়ি যাইতেছি।' তাহারা বলিল 'তোর নাম কি?' নিত্যানন্দ বলিলেন 'আমার নাম অবধূত।' এই কথা শুনিয়া মাধাই ক্রুদ্ধ হইয়া একটি ভাঙ্গা কলসির কাঁধা তুলিয়া নিত্যানন্দের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুড়িল। তাহা নিত্যানন্দের মস্তকে লাগিল এবং দর দর ধারে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। নিত্যানন্দ বেদনায় ঈশ্বর স্মরণ করিলেন। তাহার মস্তকের রক্ত দেখিয়া জগাইএর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। মাধাই আবার মারিতে যাইতেছিল, জগাই তাহার দুই হাত ধরিয়া বলিল, "কেন এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার কর, এই

সন্ন্যাসীকে মারিয়া কি লাভ হইবে ?” নিকটস্থ কোন লোক এই ব্যাপার দেখিয়া ছুটিয়া যেখানে শ্রীচৈতন্যদেব ভক্ত সঙ্গে বসিয়াছিলেন সেখানে সংবাদ দিলেন। তিনি সাঙ্গপাঙ্গে তৎক্ষণাৎ সেখানে আসিয়া দেখিলেন নিত্যানন্দের মস্তক হইতে রক্ত পড়িতেছে। কিন্তু তিনি সেই দুই দস্যুর মধ্যে দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। রক্ত দেখিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ক্রোধে অস্থির হইয়া ‘চক্র চক্র’ করিয়া চীৎকার করিলেন !

“রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি মানে।
চক্র, চক্র, চক্র প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
আথে ব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হইল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল॥

আবার সেই চক্রের ব্যাপার। ইহা বৈষ্ণব গ্রন্থকারের ভ্রান্ত কল্পনা। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, শ্রীচৈতন্যের ক্রোধ অপেক্ষা ক্ষমা ও করুণাই অধিক মূল্যবান এবং চক্রের ভয় অপেক্ষা প্রেমের দ্বারা জগাই মাধাইকে পরাস্ত করাই অধিক মহত্ত্ব। নিত্যানন্দের মস্তকে রক্তধারা দেখিয়া শ্রীচৈতন্যদেব প্রথমে বিরক্ত হইয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু নিত্যানন্দ যখন বলিলেন “মাধাই মারিতে জগাই আমাকে রক্ষা করিয়াছিল, আমার কিছু দুঃখ নাই, তুমি স্থির হও।” তখন শ্রীচৈতন্যদেব জগাইকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন “নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়া তুমি আমাকে কিনিয়াছ, তোমার কল্যাণ হউক ; আজ হইতে তোমার প্রেম ভক্তি লাভ হউক।” জগাই এই আশ্চর্য্য ক্ষমা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। জগায়ের হৃদয় পূর্ব্বেই কোমল হইয়াছিল, ভক্ত সংস্পর্শে এবং অদ্ভুত ক্ষমা দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে শ্রীচৈতন্যের চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ততক্ষণে মাধাইএর অন্তরেও অনুতাপের সঞ্চার হইল। সেও ব্যস্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যের

চরণে পড়িয়া বলিল, "আমরা দুইজন একসঙ্গে পাপকার্য্য করিয়াছি, এখন অনুগ্রহের সময়ে কেন বিভিন্ন বিচার হইবে? জগাইকে যদি অনুগ্রহ করিলে আমাকেও অনুগ্রহ করিতে হইবে।" শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "তোমাকে ক্ষমা করিবার অধিকার আমার নাই। তুমি নিত্যানন্দের শরীরে আঘাত করিয়াছ, তিনি যদি তোমাকে ক্ষমা করেন, তবে তোমার উদ্ধার হইতে পারে।" তখন মাধাই নিত্যানন্দের চরণে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বলিলেন, "এ তোমার চরণে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতেছে, ইহাকে ক্ষমা করা উচিত। নিত্যানন্দ যে উত্তর করিলেন তাহা জগতের ধর্ম্ম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য। তিনি বলিলেন—

"কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিনু মাধাইএরে শুনহ নিশ্চিত॥"

আমি যদি কোন জন্মে কোন পুণ্য করিয়া থাকি সে সমুদয় মাধাইকে দিলাম। এই বলিয়া নিত্যানন্দ মাধাইকে আলিঙ্গন করিলেন। মহাত্মা ঈশার "father, forgive them 'for they know not what they do—পিতা, ইহাদিগকে ক্ষমা কর কারণ ইহারা জনেনা যে কি করিতেছে।" এই কথা মহাত্মা ঈশার মহাবাক্যের পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য। জগাই মাধাই অনুতাপে দগ্ধ হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যদেব তাহাদিগকে বলিলেন 'তোমরা যদি আর পাপ কার্য্য না কর তাহা হইলে তোমাদের গত জীবনের সকল পাপের ভার আমি লইলাম। জগাই মাধাই এই কথা শুনিয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তদিগকে আদেশ করিলেন যে ইহাদিগকে লইয়া আমার বাড়ীতে চল, সেখানে ইহাদিগকে লইয়া কীর্ত্তন করিব। ভক্তগণ তাহাই করিলেন। বহির্দ্বার বন্ধ করিয়া প্রমত্ত কীর্ত্তন আরম্ভ

হইল। আনন্দে ভক্তগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন; অশ্রু কম্প পুলকের স্রোত বহিল, জগাই মাধাই গড়াগড়ি দিতে লাগিল; এবং প্রতিজ্ঞা করিল, আর কখনও পাপকার্য্য করিবে না। কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যদেব প্রস্তাব করিলেন, "চল সকলে মিলিয়া গঙ্গায় স্নান করিয়া আসি। গঙ্গার ঘাটে আবার মহানন্দ কোলাহল হইল। ভক্তগণ পরস্পরের অঙ্গে জল ছিটাইয়া আনন্দোৎসব করিলেন। এখন হইতে জগাই মাধাই শ্রীচৈতন্যের ভক্তদলের মধ্যে স্থান পাইলেন। তাঁহারা প্রতিদিন ঊষাকালে গঙ্গা স্নান করিয়া দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম জপ করিতেন, গত জীবনের পাপকার্য্য স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা ক্রন্দন করিতেন এবং আপনাদিগকে ধিক্কার দিতেন। অনুতাপের আবেশে আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাহাদিগকে আশ্বাস করিয়া স্বয়ং বসিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতেন, বিশেষতঃ মাধাইএর অনুতাপ অতিশয় তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। নিত্যানন্দের অঙ্গে আঘাত করিয়া রক্তপাত করিয়াছেন, এই কথা স্মরণ করিয়া তিনি ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতেন। একদিন নিত্যানন্দকে নির্জ্জনে পাইয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া বহু খেদ করিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তুমি আমার পুত্রের সমান, শিশুপুত্র মারিলে পিতার যেমন কোন দুঃখ হয় না, তেমনি তোমার আঘাতে আমার কোন দুঃখ নাই।" মাধাই এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "আমার আর এক নিবেদন আছে, গত জীবনে আমি কত লোকের অনিষ্ট করিয়াছি, এখন তাহাদিগের সন্ধান ও পাইব না; আমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে?" নিত্যানন্দ বলিলেন "ইহার এক উপায় আছে, তুমি গঙ্গার ঘাটের পথ পরিষ্কার করিয়া দাও, তাহাতে স্নানার্থীদের সুবিধা হইবে; তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে তোমার অপরাধ মার্জ্জনা হইবে।" মাধাই এই উপদেশ

শিরোধার্য্য করিয়া নিত্যানন্দকে প্রদক্ষিণ করিয়া গঙ্গার ঘাটে গেলেন এবং প্রতিদিন ঘাটের পথ পরিষ্কার করিয়া সকলের নিকট কাতরে বলিতেন,—

"জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত করিনু অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥"

মাধাইএর ক্রন্দন ও কাতরোক্তি শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইতেন এবং ঈশ্বর স্মরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের গুণ কীর্ত্তন করিতেন। যে ঘাট মাধাই প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা মাধায়ের ঘাট নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল; এখনও নবদ্বীপের একটি ঘাট মাধায়ের ঘাট নামে পরিচিত। জগাই মাধায়ের পরিবর্ত্তনে শ্রীচৈতন্যদেবের যশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল; সকলেই বলিতে লাগিল, "যিনি জগাই মাধায়ের মত দুর্ব্বৃত্তকে ফিরাইতে পারেন, তিনি সামান্য লোক নন।"

"নিমাই পণ্ডিত সত্য গোবিন্দের দাস।
নষ্ট হইব যে তাঁরে করিব পরিহাস॥
এদুয়ের বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে।
সেই বা ঈশ্বর, কি ঈশ্বর শক্তি ধরে॥
প্রকৃত মনুষ্য নহে নিমাই পণ্ডিত।
এ দেশে মহিমা তান হইল বিবৃত॥"

(চৈঃ ভাঃ ১৫শ অধ্যায়)

বাস্তবিকই জগাই মাধায়ের উদ্ধার শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপ অবস্থান কালের একটি মহতী কীর্ত্তি।

এখন নবদ্বীপে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুকরণে বৈষ্ণবগণ নানাস্থানে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। দিনে রাত্রিতে নবদ্বীপের বহুস্থানে মৃদঙ্গ মন্দিরা সহযোগে

নাম সঙ্কীর্ত্তন হইত। বিরোধীগণ ইহাতে বিরক্ত হইত। বিশেষতঃ মুসলমান রাজপুরুষগণ এই নূতন ধর্ম্মোদ্যমে প্রীত ছিলেন না বলিয়া মনে হয়। প্রথম হইতেই জনরব উঠিয়াছিল, যে মুসলমান শাসনকর্ত্তারা সঙ্কীর্ত্তনকারীদিগকে ধরিয়া লইবার জন্য লোক পাঠাইতেছে। এই জনরব বোধ হয় একেবারেই অমূলক ছিল না। ক্রমে যখন সঙ্কীর্ত্তনের বহুল প্রচার হইল তখন নবদ্বীপের মুসলমান শাসনকর্ত্তা বৈষ্ণবদিগের উপরে উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। একদিন তিনি নগরের মধ্য দিয়া যাইতে নিকটবর্ত্তী একটি গৃহে সঙ্কীর্ত্তনের শব্দ শুনিতে পাইলেন। খোল করতালের শব্দ শুনিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সঙ্কীর্ত্তনকারীদের ধরিবার আদেশ দিলেন। সঙ্কীর্ত্তনকারীগণ ভয়ে কে কোথায় পলাইল। কাজির অনুচরগণ যাহাকে পাইল তাহাকে মারিল। তাহাদের খোল করতাল ভাঙ্গিয়া দিল।

"কাজি বলে ধর ধর আজি কঁরো কার্য্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাই আচার্য্য॥
আথে ব্যথে পলাইল নগরিয়াগণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন॥
যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কইল দ্বারে॥
কাজি বলে "হিন্দুয়ানি হইল নদীয়ায়।
করিমুঁ ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া॥
ক্ষমা করি যান আজি দৈবে হৈল রাতি।
আর দিন লাগি পাইলে লইব জাতি॥"

কাজি এখানেই ক্ষান্ত হইলেন না। এখন হইতে প্রতিদিন নগরে ভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণবদিগের কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল। বিরোধী হিন্দুরাও

তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনে বাধা দিত। বৈষ্ণবগণ ইহাতে অতিশয় দুঃখিত ও ভীত হইলেন। ক্রমে শ্রীচৈতন্যের নিকটে এই সংবাদ পৌছিল। বৈষ্ণবেরা তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলেন, "কাজির ভয়ে আর কীর্ত্তন করিতে পারি না; সে প্রতিদিন বহু সহস্র লোক লইয়া নগরে ভ্রমণ করিয়া কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া দিতেছে। এখন আমরা কি করি। নয় হয় নবদ্বীপ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাই। শ্রীচৈতন্যদেব এই কথা শুনিয়া ক্রোধে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন; নিত্যানন্দকে বলিলেন, "নবদ্বীপের সকল বৈষ্ণবকে বল আজ নবদ্বীপের পথে পথে কীর্ত্তন হইবে, দেখি কে বাধা দেয়!" ভারতবর্ষে অন্ততঃ বঙ্গদেশে ধর্ম্মসাধনের স্বাধীনতায় রাজকীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বোধ হয় এই প্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদ; এখানে আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে এক নূতন মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। তিনি কেবল ভাবুক মাত্র নন, একদিকে তৃণের মত দীন অপর দিকে বজ্রের ন্যায় কঠিন। দেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তারা যখন হিন্দুদের স্বাধীন ধর্ম্মসাধনে হস্তক্ষেপ করিল, তখন অন্যেরা ভয়ে সন্ত্রস্ত হইল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব নির্ভয়ে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি কাজির অন্যায় ব্যবহারের বিরুদ্ধে ঘোষণা করিলেন যে আজ আমি সদলে নগরের পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন করিব। তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগের প্রতি আদেশ হইল, যে সকলে অপরাহ্নে প্রস্তুত হইয়া আসিবেন; দলে দলে সঙ্কীর্ত্তন হইবে; বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য প্রথম দলের অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিবেন। শ্রীবাস পণ্ডিত আর একদলের নেতা হইবেন; তিনি স্বয়ং অন্য এক দলের সঙ্গে নৃত্য করিবেন। সকলকে এক একটী প্রদীপ বা মশাল হাতে লইতে বলিলেন। নগরবাসীদিগকেও অনুরোধ করিলেন, যেন তাঁহারা স্ব স্ব গৃহদ্বার কদলীবৃক্ষ, মঙ্গল কলস ও প্রদীপাদিতে সজ্জিত করেন।

"প্রভু বলে নিত্যানন্দ হও সাবধান।
এইক্ষণে চল সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থান॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন।
দেখোঁ মোরে কোন কর্ম্ম করে কোন জন॥
দেখো আজি কাজির পোড়াঁও ঘরদ্বার।
কোন কর্ম্ম করে দেখোঁ রাজা বা তাহার॥"

নগরবাসিগণ চৈতন্যদেবের আশ্বাসে সাহস পাইয়া মহা সমারোহে কীর্ত্তনের আয়োজন করিল। ঘরে ঘরে দীপালোকের ব্যবস্থা হইল; সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দলে দলে লোক আসিয়া জুটিল।

"আনন্দে দেউটী বাঁধে প্রতি ঘরে ঘরে।
বাপে বাঁধিলেও পুত্র বাঁধে আপনারে॥

*　　　*　　　*

তা বড় তা বড় করি সবেই বাঁধেন॥
বড় বড় ভাণ্ডে তৈল করিয়া লয়েন।
অনন্ত অর্ব্বুদ লক্ষ লোক নদীয়ার॥
দেউটিয়া সংখ্যা করিবারে শক্তি কার।

(চৈঃ, ভাঃ, মধ্য খণ্ড, ২৩শ অধ্যায়)

হুঙ্কার করিয়া গোধূলি সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবও সদলে বহির্গত হইলেন; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনমণ্ডলী হুঙ্কার করিয়া উঠিল। সকলে আপন আপন হস্তের দীপ জ্বালাইল, চারিদিকে আলোকে আলোকময় হইয়া উঠিল। কীর্ত্তন আরম্ভ হইল; শ্রীচৈতন্যদেবকে ঘেরিয়া বৈষ্ণবগণ প্রেমে নৃত্য করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে অগণ্য লোক চলিল; এইরূপে সেই বিপুল জনসঙ্ঘ

নবদ্বীপের পথে পথে কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজির গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল।

"চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
লক্ষ কোটী লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে॥
কোটী কোটী মহাতাপ জ্বলিতে লাগিল।
চন্দ্রের কিরণ সর্ব্ব শরীর হইল॥
চতুর্দ্দিকে কোটী কোটী মহাদীপ জ্বলে।
কোটী কোটী লোক চতুর্দ্দিকে হরি বলে॥
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অপূর্ব্ব বিকার।
আনন্দে বিহ্বল লোক সব নদীয়ার॥
ক্ষণে হয় প্রভু অঙ্গ সহ ধূলালয়।
নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখলয়॥
সে কম্প সে ঘর্ম্ম সে পুলক দেখিতে।
পাষণ্ডের চিত্তবৃত্তি করয়ে নাচিতে॥
নগরে উঠিল মহা কৃষ্ণ কোলাহল।
হরি বলি ঠাঁই ঠাঁই নাচয়ে সকল॥
হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম রাম।
হরি বলে নাচয়ে সকল ভাগ্যবান॥
ঠাঁই ঠাঁই এই মত মেলি দশ পাঁচে।
কেহ গায় কেহ বায় কেহ মাঝে নাচে॥
লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী হইল সম্প্রদায়।
আনন্দে নাচিয়া সর্ব্ব নবদ্বীপে যায়।

* * *

আকাশ পুরিয়া সব মহাদীপ জ্বলে।

কদলক বৃক্ষ প্রতি দুয়ারে দুয়ারে।
পূর্ণ ঘট ধান্য দুর্ব্বা দীপ অগ্রসরে॥
নদীয়ার সম্পত্তি বর্ণিতে শক্তি কার।
অসংখ্য নগর ঘর চত্বর যাহার॥

এই বর্ণনা কিছু অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু সেদিন নবদ্বীপে যে এক অদ্ভুত ব্যাপার হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। শ্রীচৈতন্যের অনুপ্রাণনায় নগরবাসিগণ মুসলমান শাসনকর্ত্তার অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে মহা প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকেরাও সেই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন; কুলবধূগণ গৃহের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া জয়ধ্বনি করিয়াছিলেন।

স্ত্রীয়ে যত জয়কার দিয়া বলে হরি।

কাজি সম্ভবতঃ পূর্ব্ব হইতেই সংবাদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু বহুলোকের সমাবেশ দেখিয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিতে সাহস করেন নাই। চৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে, যে শ্রীচৈতন্যদেব সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে একেবারে কাজির বাড়ী উপস্থিত হইলেন; লোকেরা তাহার বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া ঘরের জিনিসপত্র এবং বাগানের বৃক্ষাদি ভাঙ্গিয়া দিল; শ্রীচৈতন্যদেব লোক পাঠাইয়া কাজিকে ডাকাইয়া আনিলেন। কাজি আসিলে তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন হইল। শ্রীচৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তোমার বাড়ীতে আসিলাম, তুমি লুকাইলে, এ কেমন ভদ্রতা? কাজি উত্তর করিল, "তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছ তাই আমি লুকাইয়াছিলাম। এখন তুমি শান্ত হইয়াছ তাই আসিলাম। গ্রাম সম্বন্ধে তুমি আমার ভাগিনেয় হও, সুতরাং তোমার ক্রোধ আমার সহ্য করা উচিত।" শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন যে, "তোমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি; গোদুগ্ধ খাও সুতরাং গাভী

তোমার মাতা। বৃষ অন্ন উপার্জ্জন করে সুতরাং বৃষ পিতা, তোমরা পিতামাতা মারিয়া খাও এই কোন ধর্ম্ম?" কাজি বলিল, "তোমাদের যেমন বেদ পুরাণ শাস্ত্র তেমনি আমাদের কোরাণ; কোরাণে গোবধ বিধি আছে।" তখন উভয়ের মধ্যে এই বিষয়ে বিচার হইল, বিচারে কাজি পরাজয় স্বীকার করিল। তৎপরে শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, "তোমাকে আর একটি কথা বলিবার আছে; তুমি হিন্দুদের সঙ্কীর্ত্তনে বাধা দিয়াছ; আজও ত সঙ্কীর্ত্তন হইল, আজ কেন কিছু বলিলে না?" কাজি উত্তর করিলেন, "আমি যেদিন মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিয়াছিলাম, সে রাত্রিতে এক মহা ভয়ঙ্কর সিংহ আসিয়া আমার উপরে লাফ দিয়া পড়িয়াছিল এবং নখ দিয়া আমার বুক চিরিয়া বলিয়াছিল, আবার কীর্ত্তন বন্ধ করিলে আমার প্রাণ নাশ করিবে। এই দেখ বুকে এখনও সিংহের নখ-চিহ্ন রহিয়াছে; আর আমি হিন্দুর কীর্ত্তন বন্ধ করিব না।" এই বলিয়া সে হরিনাম করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যদেব কাজির মুখে কৃষ্ণ নাম শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, "আমাকে একটি দান দেও; নবদ্বীপে কখনও যেন কীর্ত্তন বন্ধ না হয়।" কাজি বলিলেন, "আমার বংশে যত লোক হইবে তাহাদিগকে শপথ করিয়া কীর্ত্তনে বাধা দিতে নিষেধ করিব।" কিন্তু চৈতন্য ভাগবতের বিবরণ অন্যরূপ; তাহাতে কাজির সঙ্গে সাক্ষাতের কোন উল্লেখ নাই; কীর্ত্তনের দল কাজির বাড়ীতে আসিয়া ঘর দ্বার গাছ পালা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল; অধিকন্তু শ্রীচৈতন্যদেব কাজির ঘরে আগুন লাগাইয়া দিতে আদেশ করিলেন।

"ক্রোধে বলে প্রভু আরে কাজিবেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা॥

নির্ব্বংশ করোঁ আজ সকল ভুবন।
পূর্ব্বে যেন বধ করিলুঁ সে কাল যবন॥
প্রাণ লইয়া কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ প্রভু বলে বার বার॥
ভাঙ্গিলেন সব যত বাহিরের ঘর।
প্রভু বলে অগ্নি দেহ বাড়ির ভিতর॥
পুড়িয়া মরুক সর্ব্ব গণের সহিতে।
সর্ব্ব বাড়ি বেঢ়ি অগ্নি দেহ চারিদিকে॥

*　　*　　*　　*　　*

অগ্নি দেহ ঘরে তোরা না করহ ভয়।
আমি সব যবনের করিমুঁ প্রলয়॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩ শ অঃ)

এখন এই দুই বিবরণের মধ্যে কোনটী সত্য? চৈতন্য ভাগবত প্রথমে রচিত হইয়াছিল; কাজির সঙ্গে কথোপকথনের বিবরণ সে সময়ে প্রচলিত থাকিলে ভাগবত-রচয়িতা নিশ্চয়ই তাহা জানিতেন এবং লিপিবদ্ধ করিতেন। চরিতামৃত লিখিত গোবধ বিষয়ক বাদানুবাদ এবং কাজির কীর্ত্তন বন্ধ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা স্পষ্টই পরবর্ত্তী লেখকের কল্পনা। এইরূপ গুরুতর বিষয়ে লেখকগণের পার্থক্যে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে, যে বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ সকল সময়ে ঐতিহাসিক ঘটনায় আবদ্ধ থাকিতেন না; তাঁহাদের বিবরণের মধ্যে কল্পনা ও জনশ্রুতি অনেক স্থলে প্রবেশ করিয়াছে; নবদ্বীপের মহাসঙ্কীর্ত্তনের বিবরণ বৃন্দাবন দাসই সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাই অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাঁহার বিবরণও সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বলিয়া মনে হয় না। শ্রীচৈতন্যদেব যে কাজির বাড়ীতে অগ্নি দিয়া

সগণে কাজিকে পুড়াইয়া মারিতে আদেশ দিলেন ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ কাজি জনতা দেখিয়া লুকাইয়াছিলেন; সঙ্কীর্ত্তনের দল তাঁহার বাড়ীর নিকটে দাঁড়াইয়া প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে কোন কোন উদ্ধত লোক কাজির উদ্যানের গাছ পালাও কিছু নষ্ট করিয়াছিল। চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্য সফল হইল; মুসলমান শাসনকর্ত্তা হিন্দুদের ধর্ম্মসাধনে বাধা দিতে সাহস করিল না; প্রকাশ্যে খোল করতালের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করিবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল; ইহার পরে মুসলমানেরা আব সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ করিতে চেষ্টা করে নাই, হিন্দুরা অবাধে ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব ও খ্যাতি বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যাহারা এতদিন বিরোধী বা উদাসীন ছিল, তাহারাও এখন তাঁহার মহত্ত্ব স্বীকার করিতে লাগিল। নবদ্বীপে এখন তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি হইল। ভক্তগণ ইহাতে পরমানন্দিত হইলেন;

সন্ন্যাস গ্রহণ।

গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর মাত্র একবৎসর অতিবাহিত হইয়াছে; কিন্তু এই এক বৎসরের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব কি অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন! ছিন্ন বিচ্ছিন্ন নগণ্য অবজ্ঞাত বৈষ্ণবদলকে একত্র করিয়া মহাশক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন! এখন তাঁহাদের কীর্ত্তন শুনিতে ও কীর্ত্তনে যোগ দিতে সকলেই ব্যগ্র। নবদ্বীপের ঘরে ঘরে হরিসঙ্কীর্ত্তন হইতেছে; চট্টগ্রাম প্রভৃতি দূর দূর স্থান হইতে ধর্ম্মপিপাসু ভক্তগণ আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের দলে যোগ দিয়াছেন। ভক্তদলের সঙ্গে চৈতন্যদেবের গাঢ় প্রেমের সম্বন্ধ জন্মিয়াছে। তাঁহারা অকাতরে তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে পারেন। চৈতন্যদেবও তাঁহাদিগকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন। ঈশ্বরে অকপট ভক্তি এবং পরস্পরের প্রতি বিশুদ্ধ প্রীতি এই মধুর সম্বন্ধের ভিত্তি ছিল। ইহাদের মধ্যে ধন মান পদ জাতিকুলের কোন পার্থক্য ছিল না। চৈতন্যদেব যাহাতে অকপট ঈশ্বরভক্তি দেখিতেন তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। খোলা-বেচা শ্রীধরের সঙ্গে ব্যবহারে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। শ্রীধর নীচ শূদ্র জাতীয় ছিলেন এবং কলা মূলা বিক্রয় করিয়া কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধা করিতেন। মহাসঙ্কীর্ত্তনের রাত্রিতে দীর্ঘ শ্রমের পরে চৈতন্যদেব অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন যখন শ্রীধরের কুটীরের পাশ দিয়া যাইতেছিল সেই সময়ে শ্রীধরের প্রাঙ্গনে একটি ভাঙ্গা জলপাত্র দেখিয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাহা হইতে জল পান করিয়াছিলেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নামে নবদ্বীপে আর একজন ভক্ত ছিলেন, তিনি অতি দরিদ্র,

ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করিতেন, শ্রীচৈতন্যদেব একদিন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহার ভিক্ষালব্ধ অপরিষ্কৃত তণ্ডুল চর্ব্বণ করিয়াছিলেন। আর এক-দিন নিজে যাচিয়া শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে আহার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বহস্তে রাঁধা গর্ভ থোড় ও মোটা চাউলের অন্ন ভোজন করিয়া বলিয়াছিলেন, এমন সুস্বাদু খাদ্য কখনও খান নাই। এই সকল ভক্ত-গণের সঙ্গে মিলিত হইয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে আনন্দে তাঁহার দিন কাটিতেছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যাকুল চিত্ত ইহাতেও তৃপ্তি মানিল না; যখন বাহিরে প্রবল প্রভাব এবং অন্তরঙ্গ দলে মধুর প্রেমের যোগ, তখন শ্রীচৈতন্যদেব মনে মনে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করিতেছিলেন। কতদিন হইতে এবং কি কারণে তাঁহার অন্তরে এই সঙ্কল্প জাগিয়াছিল, ঠিক বুঝা যায় না। চৈতন্য ভাগবতকার লিখিয়াছেন, যে কোন কোন বিরোধিগণ তাঁহার নিন্দা ও অবমাননা করিত; সেই জন্য তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, তাঁহাকে অবমাননা করিয়া ইহাদের অপরাধ হইতেছে; সন্ন্যাসী হইলে প্রচলিত প্রথা অনুসারে সন্ন্যাসী জ্ঞানে বিরোধীরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবে, সুতরাং তাহারা তাঁহাকে অপমানের অপরাধে আর অপরাধী হইবে না। জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট ধর্ম্মানুরাগ জন্মিতেছে না এবং এখনও দুর্নীতি ও বিষয়াসক্তি বহুপ্রবল রহিয়াছে, ইহার প্রতিকারের জন্য অধিকতর ত্যাগ ও সাধনার আবশ্যক, এই চিন্তা চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের একটি কারণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ ন্যাই; কিন্তু প্রধানতঃ তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষাই খুব সম্ভবতঃ তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য প্রণোদিত করিয়াছিল। যে কারণেই হউক, তিনি অবিলম্বে গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন, স্থির করিলেন। সর্ব্বপ্রথমে নিত্যানন্দকে এই সঙ্কল্প জানাইয়াছিলেন এবং আপাততঃ সে সঙ্কল্প গোপন রাখিতে বলিলেন।

কেবল মাত্র তাঁহার জননী, মুকুন্দ ও গদাধর, ব্রহ্মানন্দ ও চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে এই সংবাদ জানাইবার অনুমতি দিলেন; সকলেই এই সংবাদে অতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন; বিশেষতঃ, শচীমাতার কি অবস্থা হইবে, ভাবিয়া সকলে অতিশয় চিন্তিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেবও সে চিন্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় একদিকে যেমন পুষ্পের মত কোমল, অপরদিকে তেমনি বজ্রের মত কঠিন ছিল। ভক্তগণ তাঁহাকে কিছুতেই স্বীয় সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না। শচীদেবী এই সংবাদ পাইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। চৈতন্যদেব গৃহে আসিলে, তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, "তোমার অগ্রজ আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, তোমার পিতা পরলোক গমন করিয়াছেন, একমাত্র তোমাকে লইয়া আমি জীবনধারণ করিতেছি। তুমি গেলে আমি কি লইয়া গৃহে থাকিব? তুমি গৃহে থাকিয়া কীর্ত্তন কর।" শ্রীচৈতন্যদেব মাতার এই বিলাপ শুনিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না; মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন। শচীদেবী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন, কয়েক দিনেই অস্থিচর্ম্ম-সার হইলেন।

চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন, যে জননীর এই অবস্থা দেখিয়া চৈতন্যদেব একদিন নিভৃতে তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, যে তাঁহাদের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই, জন্মে জন্মে তিনি তাঁহার মাতা। পূর্ব্বে এক জন্মে তিনি কৌশল্যা ছিলেন, আর চৈতন্য-দেব রাম ছিলেন। আর এক জন্মে তিনি দেবকী ছিলেন আর নিজে কৃষ্ণ ছিলেন। এই কথোপকথন কাল্পনিক, কিন্তু মনে হয় গৃহত্যাগের পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেব জননীকে কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বস্ত করিতে পারিয়া-ছিলেন। শচীদেবী সাধারণ রমণী ছিলেন না। পুত্রের অদ্ভুত

ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া তাঁহার পথে প্রতিবন্ধক হইলেন না। অমানুষিক বলে তিনি হৃদয় বাঁধিলেন। তিনি বাহিরে আর কোন শোক চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া গৃহকার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। পৌষ সংক্রান্তির রাত্রিতে চৈতন্যদেব গৃহত্যাগ স্থির করিয়াছিলেন; ক্রমে নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইল। যাত্রার দিন সারাদিন ভক্তসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করিলেন। সন্ধ্যাকালে গঙ্গা দর্শন করিয়া আসিয়া গৃহে বসিলেন। ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন; তিনি কতকক্ষণ তাঁহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়া একে একে সকলকে গৃহে যাইতে বলিলেন। তাঁহারা কেহই জানিতেন না যে সেই রাত্রিতেই তিনি গৃহত্যাগ করিবেন। অনেক রাত্রিতে খোলাবেচা শ্রীধর একটী লাউ উপহার লইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ভাবিলেন, যে লাউ না খাইয়া গেলে ভক্ত ব্যথিত হইবেন, সেইজন্য সেই রাত্রিতে জননীকে লাউ রন্ধন করিতে বলিলেন। সেই সময়ে আর একজন ভক্ত কিছু দুগ্ধ আনিলেন। চৈতন্যদেব বলিলেন, "বেশ হইল, দুগ্ধ লাউ রন্ধন হউক।" আহারাদি শেষ হইতে অনেক রাত্রি হইল; চৈতন্যদেব শয়ন করিতে গেলেন; সে রাত্রিতে নিশ্চয়ই আর নিদ্রা হয় নাই। শচীদেবীও জানিতেন যে রাত্রি শেষে নিমাই গৃহত্যাগ করিবেন। তাঁহারও চক্ষুতে নিদ্রা নাই; পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে কোন সংবাদই দেওয়া হয় নাই; তিনি অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিলেন; দণ্ডচারেক রাত্রি থাকিতে শ্রীচৈতন্যদেব শয্যা হইতে উঠিয়া বহির্গত হইলেন; শচীদেবী দুয়ারে বসিয়াছিলেন, জননীকে দেখিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "তুমি আমার জন্য অনেক করিয়াছ; তোমারই প্রসাদে এই শরীর পাইয়াছি, এই শরীর রক্ষা হইয়াছে। তোমারই প্রসাদে জ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমার জন্য তুমি যাহা করিয়াছ, কোটি জন্মেও সে ঋণ শোধ করিতে পারিব না। তুমি কোন

চিন্তা করিও না ; তোমার সকল ভার আমার উপর।" শচীমাতা নীরবে সকল কথা শুনিলেন ; তিনি একটি কথাও বলিলেন না ; চৈতন্যদেব তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া সত্বর বহির্গত হইলেন। তিনি সেইখানেই জড়ের মত বসিয়া রহিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে ভক্তগণ যখন শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন তখন তাঁহারা শচীদেবীকে এইরূপ ভাবে দ্বারে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলেন, তাঁহার নিকটে শ্রীচৈতন্যদেবের গৃহ-ত্যাগের সংবাদ পাইয়া সকলে মহা দুঃখ করিতে লাগিলেন। ততক্ষণে শ্রীচৈতন্যদেব দ্রুতবেগে গঙ্গা পার হইয়া কাটোয়া অভিমুখে চলিয়াছেন। চৈতন্যভাগবত অনুসারে তাঁহার সঙ্গে গদাধর ও হরিদাস ছিলেন। এই হরিদাস কে তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। গোবিন্দদাসের কড়চায় লিখিত আছে, যে গৃহত্যাগকালে একমাত্র গোবিন্দদাসই তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ব্বেই গোবিন্দদাসকে গৃহত্যাগের সঙ্কল্প জানাইয়া সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলিয়াছিলেন।

"দ্বিতীয় প্রহর নিশা অতীত হইলা।
ভোজন করিয়া প্রভু শয়ন করিলা॥
মুঁহি গিয়া নিজ স্থানে করিণু শয়ন।
প্রভুর আদেশে কিন্তু করি জাগরণ॥
রজনীর শেষভাগে প্রভু দয়াময়।
হঠাৎ বাহিরে আসি মোরে ডাকি কয়॥
বলে থাক প্রস্তুত হইয়া এই খানে।
বিদায় লইয়া আসি মায়ের চরণে॥"

(গোবিন্দদাসের কড়চা)

সম্ভবতঃ চৈতন্যভাগবতকার এই গোবিন্দদাসকেই হরিদাস নাম

দিয়াছেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীচৈতন্যদেব কাটোয়ায় পৌছিলেন। ক্রমে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। গোবিন্দদাসের কড়চায় এতদ্ভিন্ন গুরুদেব গঙ্গাদাস ও গাথক শিবাইএরও আগমনের উল্লেখ আছে। রাত্রিতে সকলে মিলিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া প্রেমে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন; বহুলোক সেই সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে চৈতন্যদেব কেশবভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে, যে ইতিপূর্ব্বে কেশবভারতী একবার নবদ্বীপে গিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গে চৈতন্যদেবের পরিচয় হয় এবং তখনই তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প জানাইয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যভাগবতে তাহার কোন উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ কেশবভারতীর সঙ্গে পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল এবং তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। গদাধর প্রমুখ সঙ্গীগণ সন্ন্যাসের সমুদয় আয়োজন করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ দেখিতে বহুলোকের সমাগম হইল। দীক্ষার্থীর নবীন বয়স, অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া লোকে, বিশেষতঃ, রমণীগণ হায় হায় করিতে লাগিলেন। এমন কি, যে নাপিত কেশমুণ্ডন করিবে চক্ষুর জলে সেও ভাসিতে লাগিল। প্রবল ব্যাকুলতায় শ্রীচৈতন্যদেব শীঘ্র শীঘ্র প্রয়োজনীয় কার্য্য সমাধা করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সকলেই শোকে ও দুঃখে অভিভূত। অবশেষে দিবসের শেষভাগে কার্য্য সমাধা হইল; মস্তক মুণ্ডন করিয়া চৈতন্যদেব সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করিলেন। কেশবভারতী তাঁহাকে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" এই নাম প্রদান করিলেন। মাঘমাসের শুক্লপক্ষে এই ঘটনা হয়। এই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের বয়স ২৪শ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

"যত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য কীর্ত্তন প্রকাশিয়া॥
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্ব্ব লোক তোমা হইতে যাতে হইল ধন্য॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ২৬শ অঃ)

সে রাত্রি তাঁহারা সেখানে অতিবাহিত করিলেন,সারা রাত্রি কীর্ত্তনে অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রভাতে কেশবভারতীর নিকটে বিদায় লইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি এখন অরণ্যে গমন করিব।"

"অরণ্যে প্রবিষ্ট মুই হইমু সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাও যথা॥"

(চৈঃ ভাঃ)

কেশবভারতী বলিলেন, "আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।" চৈতন্য-দেব তাঁহার সঙ্গীগণকে নবদ্বীপে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন; কিন্তু তাঁহারা তাহাতে সম্মত না হইয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। কেবল মাত্র চন্দ্রশেখর আচার্য্য শ্রীচৈতন্যের বিশেষ অনুরোধে নবদ্বীপে সংবাদ দিতে গিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব অগ্রে অগ্রে চলিলেন, পশ্চাতে কেশবভারতী ও অন্যান্য ভক্তগণ চলিলেন; চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণ কিছু বিভিন্ন। সেখানে কেশবভারতীর সঙ্গে গমনের উল্লেখ নাই, কেবলমাত্র নিত্যানন্দ, আচার্য্য রত্ন ও মুকুন্দ এই তিনজন সঙ্গে গিয়া-ছিলেন বলিয়া লিখিত আছে।

"নিত্যানন্দ আচার্য্য রত্ন মুকুন্দ তিনজন।
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন॥"

(চৈতন্য চরিতামৃত)

এতদ্ভিন্ন চৈতন্য চরিতামৃতকার মতে চৈতন্যদেব সন্ন্যাসের পর বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া বহির্গত হইয়াছিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ তাঁহাকে ভুলাইয়া শান্তিপুরে লইয়া যান। শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমে আত্মহারা হইয়া চলিতে-ছিলেন। দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না; নিত্যানন্দ পথে রাখাল বালক-দিগকে শিখাইয়া দিলেন যে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিলে তোমরা গঙ্গার পথ দেখাইয়া দিও। রাখাল বালকেরা তাহাই করিল, শ্রীচৈতন্য-দেব তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই নিত্যানন্দ আচার্য্য রত্নকে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, যে তিনি শ্রীচৈতন্য-দেবকে ভুলাইয়া শান্তিপুরে আনিবেন, অদ্বৈতাচার্য্য যেন নৌকা লইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত থাকেন। চৈতন্যদেব গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এ আমি কোথায় উপস্থিত হইলাম!" নিত্যানন্দ বলিলেন, "আমরা বৃন্দাবনে আসিয়াছি; এই যমুনা।" শ্রীচৈতন্যদেব যমুনা জ্ঞান করিয়া মহানন্দে গঙ্গায় স্নান করিলেন। কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্যকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন "তুমি কি করিয়া বৃন্দাবনে আসিলে?" অদ্বৈতাচার্য্য উত্তর করিলেন, "তুমি যেখানে থাক, সেই বৃন্দাবন।" তখন শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দের চাতুরী ও নিজের ভ্রম বুঝিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে শান্ত করিয়া বহু অনুরোধে শান্তিপুরে নিজ গৃহে আনিলেন। চরিতামৃতের এই বিবরণ অপেক্ষা চৈতন্য-ভাগবতের বিবরণ অধিক স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন, যে শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসের পর বক্রেশ্বর নামক অরণ্যে যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন কিন্তু দুই দিন পরে বক্রেশ্বর হইতে চারি-ক্রোশ দূরে থাকিতেই সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন এবং নীলাচল যাইবেন বলিয়া পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

"এই মত সর্ব্বপথে নাচিয়া নাচিয়া।
যায়েন পশ্চিম মুখে আনন্দিত হইয়া॥
ক্রোশচারি সবে আছেন বক্রেশ্বর।
সেইখানে ফিরিলেন শ্রীগৌর সুন্দর॥

*　　*　　*

বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু নিজ কুতূহলে।
বলিলেন "আমি চলিলাম নীলাচলে॥
জগন্নাথ প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে।
নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সত্বরে॥
এত বলি চলিলেন হই পূর্ব্ব মুখ।
ভক্তগণ পাইলেন পরানন্দ সুখ॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যখণ্ড ১ম অঃ)

তৎপরে নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি শ্রীবাসাদি ভাগবতগণকে লইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে এস; আমি ফুলিয়া নগরে হরিদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া শান্তিপুরে গিয়া অপেক্ষা করিব। নিত্যানন্দ তদনুসারে নবদ্বীপে আসিয়া প্রথমেই শচীদেবীর নিকটে গিয়া দেখিলেন, শচীমাতা চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের পর দ্বাদশ দিন উপবাস করিয়া আছেন। নিত্যানন্দকে দেখিয়া "বাপ, বাপ" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, ভক্তগণও তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। নিত্যানন্দ তাহাদিগকে শ্রীচৈতন্য-দেবের শান্তিপুরে আগমনের সংবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অনুরোধ জানাইলেন। শচীমাতাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া রন্ধন করিতে বলিলেন এবং তাঁহাকে আহার করাইলেন। তৎপরে ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরে আগমন

করিলেন। গোবিন্দদাসের কড়চার বিবরণও ভাগবতের অনুরূপ এবং অপেক্ষাকৃত সরল ও স্বাভাবিক।

"রজনীতে প্রভু মোর করি জাগরণ।
হরি নামে মাতি রাত্রি করিলা যাপন॥
প্রভাতে শেখরে প্রভু বলিলা বচন।
তোমরা সকলে যাও নদীয়া ভবন॥
ব্রহ্মানন্দ সহ যাও জননীর কাছে।
বল গিয়া নিমাই সন্ন্যাস করিয়াছে॥
রোদন করেন যদি আমার জননী।
আশ্বাস বাক্যেতে তাঁরে বুঝাবে অমনি॥
তার পর নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে।
ভারতীকে লয়ে চলিলেন নানা রঙ্গে॥
পেছনে পেছনে আমি খড়ি লয়ে যাই।
নাম মদে মাতোয়ারা চৈতন্য গোঁসাই॥

*　　*　　*

প্রেমে মত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চলে রঙ্গে।
নৃত্য পরায়ণ প্রভু আগে আগে ধায়।
কখন ধাবন লম্ফ পতন ধরায়॥
ধারা বহি অশ্রুবারি বহিছে নয়নে।
ভারতী গোঁসাই কাঁদে প্রেম আস্বাদনে॥
তার পর পূর্ব্বদিকে চলে আবেশেতে।
আচার্য্যের গৃহে ধায় মাতিয়া ভাবেতে॥
কিছুকাল আচার্য্যের গৃহেতে রহিলা।
এর মধ্যে শচীমাতা আসি দেখা দিলা॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু মাতার চরণে।
প্রণাম করিয়া কথা ক'ন সন্তর্পণে॥
দুই চারি বাত কহি মায়া কাটাইয়া।
দক্ষিণে করিলা যাত্রা সকলে ছাড়িয়া॥

(গোবিন্দদাসের করচা)

অপর দিকে চৈতন্য ভাগবতে শচীমাতার শান্তিপুরে আগমনের উল্লেখ নাই, কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত ও গোবিন্দদাসের কড়চা উভয়েই লিখিত আছে যে শচীমাতাকে শান্তিপুরে আনা হইয়াছিল এবং তাহা খুব সম্ভব ও স্বাভাবিক মনে হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে অতি স্থূল এবং সহজ জ্ঞাতব্য বিষয়ে বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের মধ্যে বহুল পার্থক্য দৃষ্ট হয়; তাহাতে প্রমাণ হইতেছে, যে লিখিত বিষয়ে ইঁহাদের সুনিশ্চিত অভিজ্ঞতা ছিল না। যাহা হউক, শান্তিপুরে কয়েকদিন ভক্তগণের সঙ্গে বাস করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল যাত্রা করেন। এই কয়দিন ভক্তগণ মহানন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শচীমাতা স্বহস্তে নানা প্রকার সুখাদ্য রন্ধন করিয়া প্রিয় সন্তানকে ভোজন করাইতেন। দুঃখিনী শচীর জীবনে সূর্য্যাস্তকালের কিরণের ন্যায় এই কয়টী শেষ সুখের দিন! ইহার পরে একমাত্র সন্তানের সঙ্গে একত্রবাসের সুযোগ তাঁহার আর হয় নাই। যতদিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব লোক পাঠাইয়া তাঁহার সংবাদ লইতেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার মতে শচীদেবীর জন্যই শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন।

কয়েকদিন শান্তিপুরে অবস্থানের পর শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তগণকে বলিলেন, "সন্ন্যাস করিয়া গৃহে থাকা বিধেয় নহে; অথচ জননীর দুঃখও অগ্রাহ্য করিতে পারি না; এখন ইহার উপায় কি?" ভক্তগণ শচী-

মাতাকে এই কথা জানাইলেন। তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে নিমাই নীলাচলে গিয়া বাস করুন; লোক-মুখে সর্ব্বদা তাঁহার সংবাদ পাইব। গঙ্গাস্নান উপলক্ষে তিনি মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশে আসিতে পারিবেন। এই যুক্তি প্রশস্ত বলিয়া গৃহীত হইল। চৈতন্যভাগবতে কিন্তু দেখিয়াছি, চৈতন্যদেব পূর্ব্বেই নীলাচলে বাস স্থির করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, এখন শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। ভক্তগণ বলিলেন, "এখন উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে; পথ অতি বিপদসঙ্কুল। কিছুদিন পরে যাইবেন। যতদিন যুদ্ধ শান্তি না হয় এখানে বিশ্রাম করুন।" কিন্তু শ্রীচৈতন্যের ব্যাকুল হৃদয় কোন প্রতিবন্ধক মানিল না।

"প্রভু বলে যে সে কেনে উৎপাত না হয়।
অবশ্য চলিব আমি করিল নিশ্চয়॥"

সংকল্পিত পথ হইতে শ্রীচৈতন্যদেব কখনও নিবৃত্ত হন নাই। সকল প্রতিবন্ধক অগ্রাহ্য করিয়া তিনি বাহির হইলেন। সঙ্গে নিত্যানন্দ, পণ্ডিত জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত এবং মুকুন্দ দত্ত চলিলেন। চৈতন্য-ভাগবতে ব্রহ্মানন্দ এবং গোবিন্দ নামে আর একজন সঙ্গীর উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এই গোবিন্দ কড়চা-লেখক গোবিন্দ দাস। পথে চৈতন্যদেব সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা কে কি সঙ্গে লইয়াছেন। সঙ্গীরা বলিলেন "তোমার আজ্ঞা ব্যতীত কোন কিছু সঙ্গে লইতে কার শক্তি আছে?" শ্রীচৈতন্যদেব এই কথায় সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, "এই ঠিক হইয়াছে, ভগবানের যেদিন ইচ্ছা হইবে সেদিন আহার অবশ্যই জুটিবে। আর তাঁহার ইচ্ছা না হইলে অনেক সম্বল থাকিলেও অন্ন জোটে না।" ভক্তগণ সঙ্গে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন এবং তত্ত্বকথা বলিতে বলিতে তিনি দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর

হইলেন। ঠিক কোন পথ দিয়া গিয়াছিলেন ভালরূপ নির্দ্দেশ করা যায় না; প্রথমে আটিসারা নামক একটী স্থানের উল্লেখ আছে। সেখানে অনন্ত নামক একজন সাধু ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। সারারাত্রি তাঁহার গৃহে কীর্ত্তন করিয়া প্রভাতে সেখান হইতে যাত্রা করেন; তৎপরে ছত্রভোগ নামক স্থানে উপস্থিত হন। সেখানে গঙ্গা বহুধারায় বিভক্ত ছিল।

"সেই ছত্রভোগ গঙ্গা হই শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্ব্বলোকে করি সুখী॥"

সেখানে অম্বুলিঙ্গ শিবের মন্দির ছিল; শ্রীচৈতন্যদেব গঙ্গাস্নান করিয়া ভক্তিভরে শিবের পূজা করিলেন। এবং ভক্তগণ সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য করিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার বস্ত্র ভিজিয়া যাইতে লাগিল। সঙ্গীগণ সিক্তবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া দিলেন আবার তাহাও ভিজিয়া গেল। রামচন্দ্র খান নামে এখানকার জমীদার সেই সময়ে দোলায় চড়িয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন; সন্ন্যাসীর তেজঃপুঞ্জ কলেবর এবং অদ্ভুত প্রেমাবেশ দেখিয়া তিনি সম্ভ্রমে দোলা হইতে নামিলেন এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তখন প্রেমে আত্মহারা; হা হা জগন্নাথ বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভূমিতে পড়িয়া যাইতেছেন। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান হইলে রামচন্দ্র খানকে দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকে বলিল, "ইনি দক্ষিণরাজ্যের অধিকারী।" শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, "তুমি অধিকারী। বড় ভাল হইল তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। আমি শীঘ্র যাহাতে নীলাচল যাইতে পারি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দাও।" রামচন্দ্র খান বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য; কিন্তু এখন বড় বিষম সময় হইয়াছে। সে দেশে আর এ দেশে লোক যাতায়াত বন্ধ; রাজারা

স্থানে স্থানে ত্রিশূল পুঁতিয়াছে, পথিক দেখিলেই তাহাদের প্রাণ বধ করে।" এখানকার ভার আমার উপর আছে; আমি পথিক ছাড়িয়া দিয়াছি এই কথা জানিতে পারিলে আমার প্রাণ সংশয়; তথাপি আমি কোন মতে আপনার যাইবার ব্যবস্থা করিব; আপনি নিশ্চিন্ত হউন। আমাকে যদি ভৃত্য জ্ঞান করেন, তবে আজ এখানে ভিক্ষা গ্রহণ করুণ; আমার যদি জাতি,প্রাণ,ধন যায় তথাপি আজ রাত্রিতেই আপনার দক্ষিণ যাত্রার ব্যবস্থা করিব।" এই আশ্বাস বাক্যে চৈতন্যদেব অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, রামচন্দ্র খানের আদেশে ব্রাহ্মণ তাঁহাদের জন্য অন্নাদি প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব নাম মাত্র আহার করিলেন। জগন্নাথ দর্শনের ব্যগ্রতায় এখন তাঁহার আহার নিদ্রা একপ্রকার তিরোহিত হইয়াছে। অল্পমাত্র আহারের পর"কতদূর জগন্নাথ" বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। তখন মুকুন্দ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমাবেগে নৃত্য করিতে লাগিলেন; অশ্রু, কম্প ও পুলকের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইল, এমন সময়ে রামচন্দ্র খাঁন আসিয়া বলিলেন, "ঘাটে নৌকা আসিয়াছে।" শ্রীচৈতন্যদেব তৎক্ষণাৎ হরি বলিয়া উঠিয়া ভক্তগণ সঙ্গে নৌকায় চড়িলেন। মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া দিল; ভক্তগণ নৌকায় কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইহাতে মাঝিরা ভীত হইল। তাহারা বলিল, "এ বড় সঙ্কট পথ; জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ এবং তদুপরি সর্ব্বত্র জল-দস্যু। সন্ধান পাইলে তাহারা প্রাণবধ করিবে; যতক্ষণ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার সীমায় না পৌঁছি, ততক্ষণ স্থির হউন।"

নিরন্তর এ পানিতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধনপ্রাণ দুই নাশ করে॥
এতেকে যাবত উড়িয়ার দেশ পাই।
তাবত নীরব হও সকল গোঁসাই॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য খণ্ড ২য় অঃ)

কিন্তু সে কথা শোনে কে? যাহা হউক, তাঁহারা নিরাপদে উৎকল দেশে পৌঁছিলেন। নৌকা আসিয়া প্রয়াগ ঘাট নামক স্থানে লাগিল। এখান হইতে উৎকল রাজ্যের আরম্ভ হইল। এটি কোন্ স্থান এবং কতদিনে তাঁহারা এখানে পৌঁছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এখান হইতে তাঁহারা নিরাপদে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পথও নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। এখান হইতে পদব্রজে যাত্রা করিয়া কয়েকদিনে তাঁহারা সুবর্ণরেখার তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন; সুবর্ণরেখা পার হইয়া জলেশ্বরে পৌঁছেন এবং তৎপরে রেমুনা গ্রামে উপস্থিত হন; এই রেমুনা বর্ত্তমান বালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী। রেমুনায় গোপিনাথের মন্দির ছিল; সে সময়ে ইহা একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ছিল। কথিত আছে, মাধবেন্দ্র পুরী সেখানে আসিয়াছিলেন। রেমুনার পরে তাঁহারা জাজপুর গিয়াছিলেন এবং ক্রমে বৈতরণী পার হইয়া কটকে উপস্থিত হন; সেই সময়ে কটকে সাক্ষী-গোপালের মন্দির ছিল; সাক্ষী-গোপাল দর্শন করিয়া তাঁহারা ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে পুরী পৌঁছেন। পথে উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যের দণ্ড ভঙ্গ। চৈতন্যভাগবত মতে সুবর্ণরেখার তীরে এই ঘটনা হয়। সাধারণতঃ জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের দণ্ড ও কমণ্ডলু বহন করিতেন। সে দিন তিনি নিত্যানন্দের নিকটে দণ্ড কমণ্ডলু রাখিয়া ভিক্ষার জন্য গ্রামে গমন করেন। জগদানন্দ চলিয়া গেলে নিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গিয়া নদীর জলে নিক্ষেপ করেন।

দণ্ড হাতে করি হাসে নিত্যানন্দ রায়।
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায়॥
কহে দণ্ড, আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এত যুক্ত নহে॥

এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড।
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য খণ্ড ২য় অঃ)

চরিতামৃতেও এ ঘটনার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা পুরীর নিকটে কমলপুরে ভার্গী নদীতীরে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। নিত্যানন্দ কেন যে দণ্ড ভাঙ্গিয়াছিলেন বৈষ্ণব গ্রন্থকারেরা তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। তাঁহারা কেবলমাত্র বলিয়াছেন,

"ঈশ্বরের ইচ্ছা মাত্র ঈশ্বর সে জানে।
কেন ভাঙ্গিলেন দণ্ড জানিব কেমনে॥"

ইতিপূর্ব্বে নবদ্বীপে আগমনের অব্যবহিত পরেই নিত্যানন্দ আপনার দণ্ডও এইরূপে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয়, সন্ন্যাসের প্রতি তাঁহার স্থায়ী অনাস্থা জন্মিয়াছিল। দণ্ড ভঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন এই সংবাদ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দণ্ড ভাঙ্গিল কি করিয়া?"

চরিতামৃত মতে তদুত্তরে নিত্যানন্দ একটী মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি প্রেমাবেশে পড়িয়া যাইতেছিলে, আমি তোমাকে ধরিতে গেলাম; তোমার সঙ্গে আমিও দণ্ডের উপর পড়িয়াছিলাম, তাহাতে দণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।" শ্রীচৈতন্যদেব এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন', "আমার একমাত্র দণ্ড ছিল তাহাও ভাঙ্গিয়া দিলে, এখন আমি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ; আমি একাকী যাইব। হয় তোমরা আগে যও, নয় আমি আগে যাইব।" মুকুন্দ বলিলেন, "তবে তুমিই আগে যাও।" তখন সঙ্গীদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া চৈতন্যদেব একাকী পুরীর দিকে অগ্রসর হইলেন। জগন্নাথের মন্দিরে তিনি যখন পৌছিলেন তখন তিনি একাকী। জগন্নাথ দেখিয়া

তিনি হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন; তাঁহার ইচ্ছা হইল জগন্নাথকে কোলে করেন। তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া লাফ দিয়া জগন্নাথকে ধরিতে গেলেন। নিকটবর্ত্তী পাণ্ডারা তাঁহাকে বাধা দিল ও মারিতে উদ্যত হইল। সৌভাগ্য ক্রমে সেই সময়ে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একজন বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত; নবদ্বীপের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। এই সময়ে পুরীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি পাণ্ডাগণকে নিরস্ত করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন; সন্ন্যাসীর এই প্রকার প্রেমাবেশ দেখিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিস্মিত হইলেন। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও সন্ন্যাসীর মূর্চ্ছা অপনোদন করিতে সক্ষম হইলেন না; তখন অগত্যা তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া যাওয়া স্থির করিলেন। তাঁহার অনুরোধে পাণ্ডাগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে স্কন্ধে করিয়া সার্ব্বভৌমের গৃহে লইয়া গেল। সিংহদ্বারে চৈতন্যদেবের সঙ্গীগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা লোক মুখে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে সার্ব্বভৌমের গৃহে গেলেন। পথে গোপিনাথ আচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল; ইনিও বঙ্গদেশবাসী ব্রাহ্মণ; নবদ্বীপবাসী বিশারদের জামাতা। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে জানিতেন এবং মুকুন্দের সঙ্গে পরিচয় ছিল। মুকুন্দকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। মুকুন্দ বলিলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব পুরী আসিয়াছেন এবং তাঁহারা তাঁহারই সঙ্গে আসিয়াছেন। গোপিনাথ আচার্য্য নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে লইয়া সার্ব্বভৌমের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। গোপিনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি। সার্ব্বভৌম চৈতন্যদেবকে গৃহে আনিয়া অনেক শুশ্রূষা করিলেন, তথাপি তাঁহার জ্ঞান হইল না। তখন তাঁহার ভয় হইল, বুঝি প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। কিন্তু নাসিকার নিকটে তূলা ধরিয়া দেখিলেন, যে ক্ষীণ নিশ্বাস

বহিতেছে। তৃতীয় প্রহরে চৈতন্যদেবের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। ভক্তগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সংজ্ঞা পাইয়া শ্রীচৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোথায় এবং কিরূপে এখানে আসিলাম ?" নিত্যানন্দ তাঁহাকে প্রাতঃকালের সকল বিবরণ জানাইয়া বলিলেন, "এই সার্ব্বভৌম, তোমাকে নমস্কার করিতেছেন।" শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, জগন্নাথ বড় দয়াময়, তাই আমাকে সার্ব্বভৌমের গৃহে আনিয়াছেন। আমি ভাবিতেছিলাম কিরূপে ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। প্রভু সহজেই আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। তৎপরে সার্ব্বভৌমের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "জগন্নাথ দেখিয়া তাঁহাকে বক্ষমাঝে রাখিতে ইচ্ছা হইল, আমি তাঁহাকে ধরিতে গেলাম; তাহার পরে কি হইয়াছিল আমার তা জ্ঞান নাই। ভাগ্যে আপনি নিকটে ছিলেন, নতুবা কি অনর্থই হইত। আর আমি জগন্নাথ দেখিতে ভিতরে প্রবেশ করিব না; বাহিরে গরুড়স্তম্ভের নিকটে থাকিয়া জগন্নাথ দর্শন করিব।" সেদিন সার্ব্বভৌমের গৃহে তাঁহাদের আহারাদি হইল; পরে তাঁহার মাতৃস্বসার গৃহে শ্রীচৈতন্যদেবের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া গোপিনাথ আচার্য্যের উপরে তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন। সর্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক পণ্ডিত। শ্রীচৈতন্যকে ভক্তিমার্গাবলম্বী দেখিয়া তাঁহার তেমন সন্তোষ হইল না। সার্ব্বভৌম প্রতিদিন বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতেন, তিনি চৈতন্যদেবকে তাঁহার বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনিতে বলিলেন। বিনয়ী শ্রীচৈতন্য তাহাই করিলেন; প্রতিদিন নিবিষ্ট চিত্তে সার্ব্বভৌমের বেদান্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। সাত দিন এইরূপ চলিলে সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনি ত কোন কথাই বলেন না; কিছু বুঝিতে পারিতেছেন কিনা কিছু জানিতে পারিতেছি না।" শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, "আমি মূর্খ, শাস্ত্রজ্ঞান নাই,

তুমি বলিয়াছ, বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, সেই জন্য তোমার আজ্ঞায় শুনিয়া যাইতেছি, কিন্তু তোমার কথা কিছু বুঝিতে পারি না।" সার্ব্বভৌমও কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যে বুঝিতে পারে না, তাহার ত বুঝিবার জন্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করা উচিত; তুমি কেন চুপ করিয়া থাক? তোমার মনের ভাব আমি কিছু বুঝিতে পারি না।" শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, "সূত্রের অর্থ বেশ সহজ; আমি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি কিন্তু তুমি যে ব্যাখ্যা কর তাহা বিপরীত মনে হয়। আমি তাহা বুঝিতে পারি না। আমার মনে হয়, সূত্রের প্রকৃত অর্থ ছাড়িয়া তুমি কাল্পনিক ব্যাখ্যা করিতেছ।" তখন উভয়ের মধ্যে বিচার আরম্ভ হইল; শ্রীচৈতন্যদেব ব্রহ্মসূত্রের অদ্বৈতবাদ সূচক ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া ভক্তিপথ সঙ্গত ব্যাখ্যা করিলেন। সার্ব্বভৌম মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলেন এবং এখন হইতে তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত হইলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন। সে কথা কতদূর সত্য বা তাহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য অধিক প্রকাশ পায় অথবা তাঁহার অদ্ভুত ধর্ম্মভাব এবং স্বাভাবিক প্রতিভায় সার্ব্বভৌমের মত অসাধারণ পণ্ডিতকে বৈদান্তিক মায়াবাদ হইতে ভক্তি ধর্ম্মে আনয়ন করায় অধিক মাহাত্ম্য, সে বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হইব না। সার্ব্বভৌমকে ষড়ভুজ মূর্ত্তি দেখান আর না দেখান তাঁহাকে মায়াবাদ হইতে ভক্তি মার্গে আনয়ন করিয়াছিলেন ইহা নিশ্চিত। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের সেই বিচারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না। কথিত আছে, এই বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল; কিন্তু এখন তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যদেব যে সকল যুক্তিতে মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া সার্ব্বভৌমকে ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষিত

করিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম রক্ষিত হইলে ভারতের ধর্ম্ম-সাহিত্যে একটি অমূল্য সম্পদ হইত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এখন হইতে বাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তদলের মধ্যে পরিগণিত হইলেন।

দাক্ষিণাত্য পর্য্যটন।

সন্ন্যাস গ্রহণান্তর নীলাচল আগমনের অল্পদিন পরেই শ্রীচৈতন্যদেব তীর্থদর্শন উদ্দেশে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হন। কিন্তু চৈতন্য-ভাগবতে এই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কোন উল্লেখ নাই। চৈতন্যভাগবত-কার লিখিয়াছেন :—

"ঠাকুর থাকিয়া কথোদিন নীলাচলে।
পুনঃ গৌড়দেশে আইলেন কুতূহলে॥"

(চৈতন্য ভাঃ অন্ত্যখণ্ড ৩য় অঃ)

চৈতন্যভাগবতের এই বিবরণ ঠিক বলিয়া মনে হয় না। চৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যলীলা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্ত্তী জীবনী অতিশয় অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমপূর্ণ। পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া চৈতন্য-ভাগবতরচয়িতা বৃন্দাবন দাস কি প্রকারে শেষ জীবনের এমন অসম্পূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। যাহা হউক, এই অংশের ইতিহাসের জন্য আমাদিগকে অন্যান্য গ্রন্থের উপরে নির্ভর করিতে হইবে। চৈতন্যচরিতামৃতে দাক্ষিণাত্য পর্য্যটনের এক প্রকার বিস্তৃত বিবরণ আছে। কিন্তু গোবিন্দদাসের করচায় দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও সুসঙ্গত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের মতে গোবিন্দদাসের কড়চাই অধিকতর প্রামাণিক। উভয় গ্রন্থ অনুসারে সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্ত্তী বৈশাখ মাসে শ্রীচৈতন্যদেব পুরী হইতে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হন। চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিতেছেন :—

"মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥
ফাল্গুনের শেষ দোল যাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্যগীত কৈল॥
চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌম বিমোচন।
বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন॥"

(চৈঃ চরি, মঃ লীঃ সপ্তম পরিঃ)

এই বিবরণের সঙ্গে গোবিন্দদাসের কড়চার বিবরণের এক প্রকার ঐক্য আছে। কড়চায় লিখিত আছে:—

"তিন মাস কাল মোর চৈতন্য গোঁসাই।
পুরীতে রহিল সঙ্গে করিয়া নিতাই॥
তারপরে বৈশাখের সপ্তম দিবসে।
দক্ষিণে করিলা যাত্রা ভাসি প্রেমরসে॥"

দিন গণনানুসারে নীলাচলে তিন মাস বাস পূর্ণ হয় না। তবে ফাল্গুনের কিয়দংশ, পূর্ণ চৈত্র এবং বৈশাখের সাতদিন এই হিসাবে নীলাচলে তিনমাস বাস ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মাঘের প্রথমেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাসের কড়চানুসারে মনে হয়, পৌষ সংক্রান্তির রাত্রিতে শ্রীচৈতন্যদেব কাটোয়ায় যাত্রা করেন। মাঘমাসের প্রথম দিবসে কাটোয়ায় উপনীত হন এবং তৎপর দিবস সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কয়েক দিবস রাঢ়ে ভ্রমণ করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেইখানে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া নীলাচলে যাত্রা করেন। তখনকার দিনে পদব্রজে পুরী পৌঁছিতে কতদিন লাগিয়াছিল ঠিক জানা যায় না।

ফাল্গুন মাসের শেষভাগে পুরীতে দোলযাত্রা দেখিয়াছিলেন;

সুতরাং সম্ভবতঃ ফাল্গুনের প্রথমার্দ্ধে তথায় পৌছিয়াছিলেন। শান্তিপুর হইতে যাত্রা করিতে মাঘের প্রথমার্দ্ধ কাটিয়া গিয়া থাকিবে। সুতরাং ন্যূনাধিক একমাসে পুরী আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। দুষ্কর হইলেও ইহা একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কেন না তখন শ্রীচৈতন্য-দেবের যেরূপ মনের আবেগ ছিল তাহাতে পথ দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল হইলেও দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা ও অসীম ক্লেশ-সহিষ্ণুতায় সকল বাধা অতিক্রম করিয়াছিলেন, মনে করিতে পারা যায়। যাহা হউক, বৈশাখের সপ্তম দিবসে অথবা প্রথম ভাগে শ্রীচৈতন্যদেব পুরী হইতে দক্ষিণাভিমুখে বহির্গত হন, এরূপ ধরা যাইতে পারে।

দক্ষিণ ভ্রমণে সঙ্গী কে ছিলেন সে প্রশ্নের আলোচনা গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতার নির্দ্ধারণ সময়ে বিস্তৃত ভাবে করা হইয়াছে। এখানে আর তাহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। আলালনাথ পর্য্যন্ত ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। সেদিন তাঁহারা সেখানে শ্রীচৈতন্য-দেবের সঙ্গে যাপন করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাঁর অঙ্গে পুলক, কম্প, স্বেদ দেখা দিল। নয়নে অবিরল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহু লোকের জনতা হইল। লোকের জনতা দেখিয়া নিত্যানন্দ কৌশলে তাঁহাকে মন্দিরের মধ্যে লইয়া গেলেন। কিন্তু তথাপি লোকে মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া হরি হরি বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। অবশেষে শ্রীচৈতন্যদেব দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতে বলিলেন। এইরূপ সারাদিন বহুলোকের যাতায়াত হইল। শ্রীচৈতন্যদেব সেই রাত্রি ভক্তসঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গে যাপন করিয়া প্রত্যূষে স্নান করিয়া ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া দ্রুতবেগে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। যাত্রাকালে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিদ্যা নগরীতে রামানন্দরায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন।

"রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী তীরে।
অধিকারী হয়েন তিহঁ বিদ্যানগরীতে॥
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানী উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিহঁ একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস দুঁহের তেঁহ সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥
অলৌকিক বাক্যচেষ্টা তাঁর না জানিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া॥
তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁহার যেমন মহত্ত্ব॥

(চৈঃ চঃ মঃ লীঃ সপ্তম অঃ)

ভক্তগণ মহাপ্রভুর বিচ্ছেদে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। কিন্তু মহাপ্রেমিক শ্রীচৈতন্যদেব আর সেদিকে ফিরিয়া চাহিলেন না। তিনি দৃঢ়সঙ্কল্পে হৃদয় বাঁধিয়া দ্রুতবেগে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সঙ্গী সামান্য কিছু জিনিস লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন :—

"পাছে কৃষ্ণদাস যায় মাত্র বস্ত্র লইয়া"

কিন্তু গোবিন্দদাসের করচায় লিখিত আছে :—

"তিনজনে বাহির হইনু দক্ষিণ যাত্রায়,"

এই কথা ঠিক হইলে আলালনাথ হইতে যাত্রার সময়ে কৃষ্ণদাস ও গোবিন্দদাস উভয়েই সঙ্গী হইয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু পরবর্ত্তী বিবরণে একজন মাত্র সঙ্গীর উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব

প্রেমাবেশে মত্ত হইয়া এইরূপে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন :—

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণহে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণহে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্।'

তিনি নাম-রসে মগ্ন। আর কোনও দিকে লক্ষ্য নাই; পথে লোক দেখিলে তাঁহাদিগকে বলেন 'হরি হরি' বল! তাহারা কি যেন মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া হরি ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপে সঙ্গে আসিলে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া গৃহে যাইতে বলিতেন। সম্ভবতঃ কাহারও কাহারও হৃদয়ে স্থায়ী পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত। অন্ততঃ অনেকের মনে কিছু সাময়িক উত্তেজনা আসার খুবই সম্ভব। চৈতন্ত-চরিতামৃতরচয়িতা লিখিয়াছেন, যে এইরূপে তিনি সমুদায় লোককে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন :—

"লোক দেখি পথে কহে বল হরি হরি॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরে কৃষ্ণ।
প্রভুর পাছে পাছে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ॥
কতক্ষণ রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
সেইজন নিজ গ্রামে করিয়া গমন।
কৃষ্ণ বলে হাসে কাঁদে নাচে অনুক্ষণ॥

যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণ নাম।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম॥
গ্রামান্তর হৈতে দেবে আইল যতজন।
তাঁর দর্শন কৃপায় হয় তাঁর সম॥
যেই যার গ্রামের লোক বৈষ্ণব করায়।
অন্য গ্রামই আসি তারে দেখি বৈষ্ণব হয়॥
সেই যায় অন্যগ্রামে করে উপদেশ।
এই মতে বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ দেশ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ লীঃ সপ্তম পরিচ্ছেদ)

এই বর্ণনা সম্ভবতঃ অতিরঞ্জিত। কিন্তু এই অদ্ভুত নবীন সন্ন্যাসীর আশ্চর্য্য প্রেমাবেশ দেখিয়া অন্ততঃ অনেক লোকের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল, ইহা খুবই সম্ভব। বিশেষতঃ যে সকল স্থানে রাত্রিবাস অথবা আহারাদির জন্য কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়াছিলেন সে-খানে তাঁর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকিতে পারে। ঠিক কোন্ কোন্ স্থান দিয়া তিনি গমন করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিতে না পারিলেও মোটামুটি তাঁহার গমনের পথ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে সর্ব্বপ্রথমে কূর্ম্ম স্থান বলিয়া একটী স্থানের উল্লেখ করা হইয়াছে। "এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্ম স্থানে।" বর্ত্তমান সময়ে সেটী কোন স্থান তাহা বোধ হয় নির্দ্দেশ করা যায় না। সেখানে কূর্ম্ম অবতারের মন্দির ছিল। চৈতন্যদেব কূর্ম্ম মূর্ত্তি দেখিয়া স্তবন, প্রণামাদি করিলেন এবং প্রেমাবেগে হাসিয়া কাঁদিয়া নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। স্বভাবতঃই তাহা দেখিয়া বহু লোকের জনতা হইয়াছিল এবং লোকে তাঁহার অদ্ভুত ভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। গ্রামবাসী একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাপূর্ণ হইয়া আহারের জন্য আপনার বাড়ীতে

তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং গভীর ভক্তির সহিত তাঁহার সেবা করেন।

"ঘরে আনি প্রভুর কৈল পদ প্রক্ষালন।
সেইজল সবংশ সহিত করিল ভক্ষণ॥
অনেক প্রকারে স্নেহে ভিক্ষা করাইল।
গোঁসাঞির শেষ অন্ন সবংশে খাইল॥"
(চৈঃ চঃ, মঃ লীঃ, সপ্তম পরিঃ)

তথা হইতে যাত্রাকালে ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর সঙ্গে যাইতে চাহিল। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া তাহাকে গৃহে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন ও উপদেশ করিতে বলিলেন।—

"গৃহে রহি কৃষ্ণ নাম নিরন্তর নিবা॥"
* * *
"যারে দেখ তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ॥"

এইরূপে শ্রীচৈতন্যদেব সমস্ত পথ জীবন্ত ধর্ম্ম প্রভাব সঞ্চার করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

এই সময়ে চৈতন্যচরিতামৃতে একটী অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা আছে। কূর্ম্ম নগরে বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনস্থানে বাসুদেব নামে এক দ্বিজ বাস করিতেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ অতি ধাম্মিক ও দয়ালু ছিলেন। ক্ষতস্থানে পোকা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি এমনই দয়ালু ছিলেন যে ক্ষতস্থান হইতে পোকা খসিয়া পড়িলে তাহা উঠাইয়া পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া দিতেন। রাত্রিতে তিনি চৈতন্যদেবের আগমন সংবাদ পাইয়াছিলেন। প্রভাতে উঠিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য ব্রাহ্মণের বাটীতে আসিয়া শুনিলেন যে তৎপূর্ব্বে চৈতন্যদেব চলিয়া গিয়াছেন। তখন বাসুদেব মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে

পড়িলেন এবং অনেক প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই চৈতন্যদেব কোথা হইতে আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার স্পর্শে ব্রাহ্মণের কুষ্ঠ দূর হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞতা ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া ঈশ্বর জ্ঞানে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, লোকে আমাকে দেখিয়া আমার গন্ধে দূরে পলায়ন করে, আর তুমি আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলে, ইহা ঈশ্বরে ভিন্ন অন্যে সম্ভব নহে। কিন্তু ভাল ছিল আমি কুষ্ঠরোগী অস্পৃশ্য ছিলাম, কেন না এখন মনে অহঙ্কার জন্মিবে। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম লইতে ও কৃষ্ণোপদেশ করিতে বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। গোবিন্দদাসের করচায় এই ঘটনার কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহার প্রামাণিকতা বিশেষ সন্দেহযোগ্য। কৃষ্ণদাসকবিরাজ মহাশয় স্পষ্টই লিখিয়াছেন, যে তিনি লোকমুখে শুনিয়া ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

"সেই লিখি মহান্তের মুখে যেই শুনি"।

(চৈঃ চঃ, মঃ লীঃ, সপ্তম পরিচ্ছেদ)

কূর্ম্ম নগরী হইতে বহির্গত হইয়া পূর্ব্বমত হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে কয়েক দিনে শ্রীচৈতন্যদেব জিয়ড়নৃসিংহ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। বর্ত্তমান সময়ে এই স্থানটীরও উদ্দেশ পাওয়া যায় না। এই স্থানে নৃসিংহ অবতারের মূর্ত্তি ছিল, তাহার সম্মুখে মহাপ্রভু প্রেমাবেশে অনেক নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। এখানেও এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন এবং একরাত্রি সেখানে কাটাইয়া পরদিন দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হন। তৎপরে কয়েক দিনে গোদাবরী তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দদাসের করচায় কূর্ম্মস্থান ও জীয়ড়নৃসিংহ ক্ষেত্রের কোন উল্লেখ নাই। গ্রন্থকার আলালনাথের পরে একেবারে গোদাবরী তীরে আগমনের কথা লিখিয়াছেন। তিনি পরবর্ত্তী স্থান সমূহের যেরূপ

পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন তাহার তুলনায় ইহা কিছু বিস্ময়জনক। হইতে পারে যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা না ঘটায় তিনি একেবারে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ দিয়াছেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম বিদ্যানগরে রামানন্দরায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই বিদ্যানগরী ঠিক কোন স্থানে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। গোদাবরী তীরে রাজমহিন্দ্রী নামক প্রাচীন নগরী রাজধানী ছিল। ইহার একদিকে বিস্তৃত গোদাবরী নদী প্রবাহিত। অপর দিকে অর্দ্ধচক্রাকার অনুন্নত পর্ব্বত শ্রেণী। সুতরাং শত্রু আক্রমণ হইতে সহজেই রক্ষা করা সম্ভব। তজ্জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতে এইখানে বিভিন্ন রাজবংশীয়গণের রাজধানী ছিল। উৎকল রাজপ্রতিনিধির রাজধানীও এইখানেই থাকা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে যে বিবরণ আছে তাহাতে গোদাবরীর অপর তীরে বিদ্যানগরীর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিতেছেন, শ্রীচৈতন্যদেব গোদাবরী তীরে উপস্থিত হইয়া যমুনাস্মরণে তীরে অনেকক্ষণ নৃত্য করিলেন, তৎপরে নদী পার হইয়া অপর পারে স্নান করিলেন এবং ঘাট ছাড়িয়া কিছু দূরে নদীর নিকটে বসিয়া নাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রামানন্দরায় প্রচলিত প্রথানুসারে দোলায় চড়িয়া বহুসংখ্যক অনুচরের সঙ্গে স্নান করিতে আসিলেন। বাদ্যকরেরা রাজপ্রতিনিধির অগ্রে অগ্রে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছিল। নদীতীরে আসিয়া দোলা হইতে নামিয়া তিনি স্নান তর্পণ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বুঝিতে পারিলেন, ইনিই রামানন্দরায় এবং তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপের জন্য ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলেন। স্নানান্তে রামানন্দরায় অনতিদূরে বিশাল-দেহ উজ্জ্বলকান্তি সন্ন্যাসী দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং নিকটে

আসিয়া দণ্ডবৎ নমস্কার করিলেন। সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া তাঁহাকে উঠিতে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনিই কি রায় রামানন্দ। আগন্তুক বলিলেন "আমিই সেই অধম শূদ্র।" তখন চৈতন্যদেব তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তখন উভয়েই প্রেমাবেশে ক্ষণকাল অচৈতন্যপ্রায় রহিলেন। তাঁহাদের গাত্রে স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি ভক্তি-লক্ষণ প্রকাশ পাইল। রামানন্দরায় উচ্চপদস্থ রাজপ্রতিনিধি, জ্ঞানী এবং স্বভাবতঃ গম্ভীর। তাঁহার এই বিকার দেখিয়া সঙ্গের লোকেরা কিছু বিস্মিত হইল, অপরদিকে ব্রহ্মসম তেজোময় সন্ন্যাসীই বা কেন শূদ্রজাতীয় রামানন্দরায়কে আলিঙ্গন করিলেন। উপস্থিত লোকেদের এই প্রকার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া উভয়েই আত্ম সম্বরণ করিয়া সেইখানে বসিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আমাকে আপনার গুণের কথা বলিয়াছেন এবং আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যই আমার এখানে আগমন। বড়ই ভাল হইল, সহজেই আপনার দর্শন পাইলাম। রামানন্দরায় বলিলেন, আমার প্রতি সার্ব্বভৌমের বড় অনুগ্রহ। দূরে থাকিয়াও তিনি আমার কল্যাণ সাধন করেন। তাঁহার কৃপায় আপনার দর্শন পাইলাম। সার্ব্বভৌমের প্রতি আপনার কৃপার প্রমাণ এই দেখিতেছি, যে আমি রাজসেবী, বিষয়ী, অস্পৃশ্য শূদ্রাধম, তথাপি আপনি আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। বেদ বিহিত আচার অনুসারে আমি আপনার স্পর্শের অযোগ্য। আপনার অসীম করুণায় আপনি ঘৃণা বা বেদবিহিত প্রথার ভয় না করিয়া আমাকে আলিঙ্গন দিলেন। আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আমার উদ্ধারের জন্যই এখানে আসিয়াছেন। এত সহজেই রামানন্দরায়ের শ্রীচৈতন্যদেবকে ঈশ্বরের

অবতার বলিয়া বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই সময়ে তিনি তাঁহাকে যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। বলিয়া থাকিলেও তাহা কেবল সাধারণ স্তুতিবাদ মাত্র। রামানন্দ বলিলেন, আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি বহুলোক রহিয়াছেন, আপনার দর্শনে ইহাদের সকলেরই মন দ্রবীভূত দেখিতেছি। আপনার আকৃতি ও প্রকৃতিতে ঈশ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। মনুষ্যে এই প্রকার অপ্রাকৃত গুণ সম্ভব নয়। শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, আপনি মহাভাগবতোত্তম। আপনার দর্শনেই ইহাদের সকলের মন দ্রব হইয়াছে। অন্যের কি কথা, আমি যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আপনার স্পর্শে আমিই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিতেছি। এই জন্যই সার্ব্বভৌম আমাকে আপনার সঙ্গে মিলিত হইতে বলিয়াছিলেন। এইরূপে উভয়ে উভয়ের স্তুতি করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একজন বৈদিক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, সম্ভবতঃ রামানন্দরায়ের ইঙ্গিতে শ্রীচৈতন্যদেবকে ভিক্ষার জন্য নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া রামানন্দরায়কে কহিলেন, আপনার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিবার আকাঙ্ক্ষা, পুনরায় যেন সাক্ষাৎ পাই। রামানন্দরায়ও বলিলেন, একবার মাত্র দর্শনে আমার মন তৃপ্ত হইতেছে না। যদি কৃপা করিয়া এই অধমকে শুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছেন তাহা হইলে ৫।৭ দিন এখানে অবস্থান করিয়া আমাকে পবিত্র করুন। এই বলিয়া রামানন্দরায় স্বস্থানে গমন করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবও ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁহার গৃহে গেলেন। পরস্পরের সঙ্গে পুনর্ম্মিলনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উভয়েই দিন কাটাইলেন। সন্ধ্যাকালে রামানন্দরায় একজন মাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকটে আসিলেন এবং নিভৃতে বসিয়া সারারাত্রি গম্ভীর ধর্ম্ম আলোচনায় অতিবাহিত করিলেন। এইরূপে একে একে

দশরাত্রি অতিবাহিত হইল। তাঁহাদের মধ্যে যে ধর্ম্মালাপ হইয়াছিল চৈতন্যচরিতামৃতে তাহার সারমর্ম্ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গভীরতম তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

চৈতন্যরিতামৃতকার রামানন্দরায়ের মুখে এইসব তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব রামানন্দরায়কে 'সাধ্য' অর্থাৎ ধর্ম্মজীবনের লক্ষ্য কি, প্রশ্ন করেন এবং তাহার উত্তরে রামানন্দরায় ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর ধর্ম্মের বিবৃত্তি করিয়া যান, কিন্তু বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন, শ্রীচৈতন্যদেবের অনুপ্রাণনায় রামানন্দরায় এই গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতরচয়িতা রায়ের মুখেও এইরূপ কথা দিয়াছেন।

"রায় কহে ইহা আমি কিছুই নাহি জানি।
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকপাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বোঝে তোমার নাট॥
হৃদয়ে প্রেরণ করাও জিহ্বাও কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভালমন্দ কিছুই নাহি জানি॥"

(চৈঃ, চঃ, মঃ, লীঃ, অষ্টম পরিচ্ছেদ)

শুধু তাহাই নহে, পরিশেষে রামানন্দের সম্মুখে তাঁহার কৃষ্ণরূপ প্রকাশিতও করিয়াছেন। এসব উত্তরকালের ভক্তগণের কবিকল্পনা বলিয়া মনে হয়। রামানন্দরায় মহাজ্ঞানী এবং পরম ভক্ত ছিলেন, সার্ব্ব-ভৌমের মুখেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য শ্রীচৈতন্যদেবের সংস্পর্শে তাঁহার জ্ঞান ও ভক্তি গভীরতর হইয়া থাকিবে। তিনি যদি বলিয়া থাকেন, "আমি কিছুই জানি না; তুমি যাহা বলাও তাই বলি"—তাহা বৈষ্ণবসুলভ বিনয়। সম্ভবতঃ সেই বিনয় বাক্য লইয়া বৈষ্ণব গ্রন্থকার

স্ফুরণের মত খাড়া করিয়াছেন। যাহাহউক এই স্থলে এবিষয়ে আর আলোচনা করিব না। অন্যত্র পৃথকভাবে এবিষয়ে অবতারণা করিতে হইবে। আপাততঃ আমরা দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের ধারাবাহিক বৃত্তান্ত অনুসরণ করিব। রামানন্দরায় শ্রীচৈতন্যদেবকে পাঁচ সাত দিন বিদ্যানগরে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দশ দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। চৈতন্যদেব তখন আরও দক্ষিণে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু এই দশ দিনে উভয়ের মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল। রামানন্দরায় শ্রীচৈতন্যদেবকে আর ছাড়িতে চান না। তখন এই স্থির হইল, রামানন্দরায় রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে গিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গী হইয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন, যে শ্রীচৈতন্যদেব রামানন্দরায়কে এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন।

"আরদিন রায় পাশে বিদায় মাগিলা।
বিদায়ের কালে তাঁর এই আজ্ঞা দিলা॥
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি আসিব অল্পকালে॥
দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঁঞাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥"

(চৈঃ চঃ, মঃ লীঃ, অষ্টম পরিচ্ছেদ)

কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই প্রস্তাব রামানন্দরায়ের নিকট হইতে আসাই অধিকতর সম্ভব। শ্রীচৈতন্যদেবের মত বিনয়ী লোকের যে রাজপ্রতিনিধিকে উচ্চ রাজপদ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকটে থাকিতে বলা তাহা অপেক্ষা রামানন্দরায়েরই তাঁহার সহবাসের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করা অধিকতর স্বাভাবিক। যাহা হউক, দশ দিনের পরিচয়ে এইরূপ

যোগ বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। সে কি চুম্বকসম আকর্ষণ যাহাতে দশ দিনের পরিচয়ে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী চিরজীবনের মত উচ্চ রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিরাগী সন্ন্যাসীর সঙ্গী হইতে ব্যগ্র হইলেন। উত্তর জীবনে এই আকর্ষণী শক্তির আরও অনেক পরিচয় পাইব। দশ দিন পরে শ্রীচৈতন্যদেব রামানন্দরায়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আমরা চৈতন্যরামানন্দের মিলন বৃত্তান্ত প্রধানতঃ চৈতন্যচরিতামৃত হইতে গ্রহণ করিয়াছি। করচার বিবরণ ঠিক এইরূপ, কিন্তু অতি সংক্ষিপ্ত। সম্ভবতঃ গোবিন্দদাস এই গভীর তত্ত্ব ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি মোটা মুটি যতটুকু বুঝিয়াছিলেন ততটুকুই লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বরূপ দামোদরের করচা হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বলিয়াছি।

"দামোদর স্বরূপের করচানুসারে।
রামানন্দ মিলন লীলা করিলা প্রচারে॥"

(চৈঃ চঃ, মঃ লীঃ, অষ্টম পরিচ্ছেদ)

দামোদর হউন বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ হউন যিনি এই অপূর্ব্ব ভক্তি-তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ।

বিদ্যানগরের পরে চৈতন্যদেবের গোতমী গঙ্গায় যাইয়া স্নানের উল্লেখ আছে। তৎপরে মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে গমন করেন। সেখানে মহেশের মন্দির ছিল। মন্দির সমীপে বহুলোকের জনতা হইয়া থাকিবে এবং তাহাদিগকে অপর স্থানের মত কৃষ্ণনামে মাতাইয়া ছিলেন। তৎপরে দাসরাম মহাদেবদর্শনে গমন করেন। ইহার পরে আর একটী স্থানের উল্লেখ আছে। সেখানে নৃসিংহের মূর্ত্তি ছিল, তাহার সম্মুখে চৈতন্যদেব

অন্যত্র যেমন, প্রণতি ও স্তুতি করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাসের করচায় এইসকল স্থানের উল্লেখ নাই। তৎপরিবর্ত্তে ত্রিমন্দনগর নামক একটী স্থানের বিবরণ আছে। সেখানে বহু বৌদ্ধ বাস করিতেন। তাহা হইলে সম্ভবতঃ এই স্থানটী বর্ত্তমান বেজোয়াদা বা গুণ্টুরের নিকটে অবস্থিত ছিল। কেননা সেখানে বহু লুপ্ত বৌদ্ধ বিহারের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন সংবাদ পাইয়া বৌদ্ধগণ তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে অনেক স্থলেই পণ্ডিত ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতাগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে বিচারের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তিনি বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই অথচ ত্রিমন্দনগরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই হউক অথবা বৌদ্ধগণের আহ্বানেই হউক, উৎসাহের সহিত বিচার করিয়াছিলেন; বোধ হয় বৌদ্ধগণকে প্রকৃত জিজ্ঞাসু বলিয়া বুঝিয়াছিলেন সেইজন্য তাঁহাদের সঙ্গে বিচার করিয়াছিলেন। অন্যত্র বৃথা তর্কের ভাব দেখিয়া তর্কে প্রবৃত্ত হন নাই। করচায় লিখিত আছে, ত্রিমন্দের রাজা এই বিচারে মধ্যস্থ হন এবং বৌদ্ধগণ বিচারে পরাজয় স্বীকার করেন। বৌদ্ধগণের নেতা রামগিরিরায় বিচারে স্বীয় মতের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া ভক্তিপথ অবলম্বন করেন।

"বৌদ্ধ গণের পতি রামগিরিরায়।
প্রণমিয়া বলে পথ দেখাও আমায়॥
তুমিত মানুষ নহ নবীন সন্ন্যাসী।
থাকিতে তোমার সহ বড় ভালবাসি॥
পাষণ্ডের শিরোমণি ছিলাম সংসারে।
কৃপা করি ভক্তি মার্গ দেখাও আমারে॥

(গোবিন্দদাসের করচা)

বিনয়ী ভক্ত শ্রীচৈতন্যদেবও তাঁহার সরল জ্ঞানান্বেষণপ্রবৃত্তি দেখিয়া জয় পরাজয়ের কথা না ভাবিয়া রামগিরিরায়কে বহু সম্মান করিলেন।

"হাসিয়া চৈতন্য প্রভু কৃপা করি কয়।
মাথার ঠাকুর তুমি রামগিরিরায়॥
হরি বলি পুলকিত হয় যেই জন।
মাথার ঠাকুর সেই এই ত সাধন॥" (গবিন্দদাসের করচা)

প্রকৃত ভক্ত এবং সরল জিজ্ঞাসুর মিলন এই প্রকারই হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনায় রামগিরিরায় ভক্তিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিলেন এবং সশিষ্যে ভক্তিমার্গ গ্রহণ করিলেন।

"রামগিরি পাষণ্ডের ভক্তি উপজিল।
ইহা হেরি প্রভু মোর আনন্দে পূরিল॥
পণ্ডিতের শিরোমণি যত বৌদ্ধগণ।
রামগিরি পথে সবে করিলা গমন॥"

(গোবিন্দদাসের করচা)

ইহার পরে ঢুণ্ঢিরাম তীর্থ নামে এক ব্যক্তি চৈতন্যদেবের সঙ্গে তর্ক করিতে আসেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই। এই ঘটনা ত্রিমন্দ নগরেই হইয়াছিল, কি অন্যত্র, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। ঢুণ্ঢিরামকে তুঙ্গভদ্রাবাসী বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

"বিচার করিতে শেষে হয়ে অভিলাষী।
ঢুণ্ঢিরাম তীর্থ আসে তুঙ্গভদ্রাবাসী॥
অহঙ্কারে সদামত্ত পণ্ডিতাভিমানী।
নাহি বুঝে ভক্তিমার্গ শুষ্ক তর্কে জ্ঞানী॥"

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া বলিলেন, আমি তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া জয়পত্র লিখিয়া দিতেছি।

"প্রভু কহে শুন শুন ঢুণ্ডিরাম স্বামী।
তোমার সহিত তর্কে হারিলাম আমি॥
জয়পত্র লিখে আমি দেই সঙ্গোপনে।
হারিল চৈতন্য এবে তোমার সদনে॥"

সেকালে পণ্ডিতগণ এই প্রকার বৃথা তর্কে জয়লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন এবং বিচারে জয়লাভ করিলে বিজিত পণ্ডিতের নিকট হইতে জয়পত্র লিখাইয়া লইতেন। শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপ বিচারে আহূত হইলে সর্ব্বদাই বলিতেন, আমি পরাজয় স্বীকার করিয়া জয়পত্র লিখিয়া দিতেছি। এখানেও তাহাই করিলেন। ঢুণ্ডিরাম শ্রীচৈতন্যদেবের অকৃত্রিম বিনয় ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি চৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হইলেন।

"ইতি উতি চেয়ে ঢুণ্ডি প্রভুর চরণে।
লোটাইয়া পড়িলেন অতি শুদ্ধ মনে॥"

ঢুণ্ডিরাম হরিদাস নামে খ্যাত হন। শ্রীচৈতন্যদেবের যশ লোকমুখে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বিনয়াবতার শ্রীচৈতন্যদেব নিঃশব্দে সত্বর সেথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং সারাদিন দ্রুতবেগে গমন করিয়া বহুপথ অতিক্রম করতঃ বটেশ্বর তীর্থে উপনীত হইলেন। সেখানে অক্ষয়বট নামে একটী বটবৃক্ষ ছিল এবং বটেশ্বর নামে শিবমূর্ত্তি ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তি সহকারে সেখানে প্রণাম করিলেন এবং অনাহারে রাত্রি যাপন করিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের পৌছিতে সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছিল। তখন আর আহারের চেষ্টা না করিয়া চৈতন্যদেব অনাহারেই রাত্রি কাটাইতে সঙ্কল্প করিলেন। রাত্রি প্রভাতে তিনি স্নান করিতে গেলেন এবং তাহার সঙ্গী খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টায় গেলেন।

"প্রভাতে যাইলা প্রভু স্নান করিবারে।
ভিক্ষা করিবারে মুহি ফিরি দ্বারে দ্বারে॥
ভিক্ষা মাগি আইলাম মধ্যাহ্ন সময়ে।
পাক করি সেবা করে মোর গোরারায়ে॥
প্রসাদ পাইনু মুঞি অমৃত সমান।"

(গোবিন্দদাসের করচা)

অতঃপর তীর্থরাম নামে একজন ধনী দুইজন মন্দ স্ত্রীলোক লইয়া আগন্তুক সন্ন্যাসীকে পরীক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ-দাসের করচায় এই ঘটনার যে বিবরণ আছে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"হেন কালে আইলা সেথা তীর্থ ধনবান॥
দুইজন বেশ্যা সঙ্গে আইলা দেখিতে।
সন্ন্যাসীর ভারিভূরি পরীক্ষা করিতে॥
সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্যাদ্বয়।
প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয়॥
ধনীর শিক্ষায় সেই বেশ্যা দুইজন।
প্রভুরে বুঝিতে বহু করে আয়োজন॥
তীর্থরাম মনে মনে নানা কথা বলে।
সন্ন্যাসীর তেজ এবে হরে লব ছলে॥
কতরঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে।
সত্যবালা হাসি মুখে বসে প্রভু পাশে॥
কাঁচলি খুলিয়া সত্য দেখাইল স্তন।
সত্যরে করিলা প্রভু মাতৃ সম্বোধন॥

থর থরি কাঁপে সত্য প্রভুর বচনে।
ইহা দেখি লক্ষ্মী বড় ভয় পায় মনে ॥
কিছুই বিকার নাহি প্রভুর মনেতে।
ধেয়ে গিয়া সত্যবালা পড়ে চরণেতে ॥
"কেন অপরাধী কর আমারে জননী।
এই মাত্র বলি প্রভু পড়িলা ধরণী ॥
খসিল জটার ভার ধূলায় ধূসর।
অনুরাগে থর থর কাঁপে কলেবর ॥
সব এলো-থেলো হলো প্রভুর আমার।
কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখে আর ॥
নাচিতে লাগিলা প্রভু বলি হরি হরি।
লোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি ॥
গিয়াছে কৌপীন খসি কোথা বহির্বাস;
উলঙ্গ হইয়া নাচে ঘন বহে শ্বাস ॥
আছাড়িয়া পড়ে নাহি মানে কাঁটা খোঁচা;
ছিঁড়ে গেল কণ্ঠ হ'তে মালিকার গোছা ॥
না খাইয়া অস্থি চর্ম্ম হইয়াছে সার।
ক্ষীণ অঙ্গে বহিতেছে শোণিতের ধার ॥
হরি নামে মত্ত হয়ে নাচে গোরা রায়।
অঙ্গ হতে অদভুত তেজ বাহিরায় ॥
ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল।
চরণ তলেতে পড়ি আশ্রয় লইল ॥
চরণে দলেন তারে নাহি বাহ্য জ্ঞান।
হরি ব'লে বাহুতুলে নাচে আগুয়ান ॥

"সত্যরে বাহুতে ছাঁদি বলে বল হরি।
হরি বল প্রাণেশ্বর মুকুন্দ মুরারি॥
কোথা প্রভু কোথায় বা মুকুন্দ মুরারি।
অজ্ঞান হইলা সবে এই ভাব হেরি॥
হরিনামে মত্ত প্রভু নাহি বাহ্যজ্ঞান।
ঘাড়ি ভেঙ্গে পড়িতেছে আকুল পরাণ॥
মুখে লালা অঙ্গে ধূলা নাহিক বসন।
কণ্টকিত কলেবর মুদিত নয়ন॥
ভাব দেখি যত বৌদ্ধ বলে হরি হরি।
শুনিয়া গোরার চক্ষে বহে অশ্রুবারি॥
পিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিল।
ইহা দেখি তীর্থরাম কাঁদিয়া উঠিল॥
বড়ই পাষণ্ড মুহি বলে তীর্থরাম।
কৃপা করি দেহ মোরে প্রভু হরি নাম॥
তীর্থরাম পাষণ্ডেরে করি আলিঙ্গন।
প্রভু বলে তীর্থরাম তুমি সাধুজন॥
পবিত্র হইনু আমি পরশি তোমারে।
"তুমি ত প্রধান ভক্ত" কহে বারে বারে॥
তীর্থরাম ধনী তবে চরণে পড়িয়া।
আকুল হইল কত কান্দিয়া কান্দিয়া॥
"কান্দিতে কান্দিতে যবে ভক্তি উপজিল।
অমনি ধরিয়া হাত প্রভু আলিঙ্গিল॥
প্রভু কহে তৃণসম গণহ বৈভবে।
ভক্তিধন অমূল্য রতন পাবে তবে॥

দূরেতে নিক্ষেপ কর বসন-ভূষণ।
ছাড়িয়া অনিত্য ধনে ভজ নিত্য ধন॥
বার বার যাতায়াতে পাইবে যন্ত্রণা।
নিষ্কাম জনের হয় এই ত মন্ত্রনা॥
এই যে সাধের দেহ ঢাকা চর্ম্ম দিয়া।
কিছুদিন পরে ইহা যাইবে পচিয়া॥
দেহ হতে প্রাণ-পাখী উড়ে যাবে যবে।
হয় কীট নয় ভস্ম নয় বিষ্ঠা হবে॥
গৌরবের ধন কিছু নাহি ত্রিভুবনে।
কেবল গৌরব আছে ঈশ্বর ভজনে॥
বিলাস বৈভব সব অনিত্য জানিয়া।
একে একে ফেলে দাও দূরেতে টানিয়া॥
ঈশ্বরে বিশ্বাস ঈশ্বর আনিয়া মিলায়।
আর কিছু প্রমাণ ত কহনে না যায়॥
অসংখ্য জগৎ হয় প্রমাণের ঠাঁই।
প্রমাণ নাহিক চাহে পণ্ডিত গোঁসাই॥
"নাহি প্রয়োজন বহু বাদবিতণ্ডায়।
কৃষ্ণ আনি সাধকেরে বিশ্বাসে মিলায়॥
এই শাস্ত্র আলাপনে কিবা প্রয়োজন।
বিশ্বাস করিয়া কৃষ্ণ করহ ভজন॥
অর্থের গৌরব যেই করে বার বার।
দিন দিন তার দুঃখ হয় অনিবার॥
সম্ভ্রম লাগিয়া করে গৌরব যে জন।
বল তার দুঃখ কেবা করে নিবারণ॥

এ আমার আমি তার সবে এই কয়।
মুদিলে নয়ন দুটী কেহ কার নয়॥
মিছামিছি আত্মীয়তা করে সব লোক।
ভাঙ্গা পুতুলের ন্যায় মৃতদেহে শোক॥
পুত্র হয় পিতার আত্মজ সবে জানে।
দুই চিত্ত এক বলি বেদে না বাখানে॥
ছাড়িলে পুত্রের দেহ তাহার জীবন।
তাহে নাহি সিদ্ধ হয় পিতার মরণ॥
জননীর দেহ হতে পুত্র জন্ম লয়।
কিন্তু দুয়ে এক নহে জানিহ নিশ্চয়॥
কেহ কারু নহে এই প্রমেয়ের ধারা।
না হয় করিতে সিদ্ধ প্রমাণের দ্বারা॥
"ঈশ্বর প্রমেয় হন তাহার প্রমাণ।
মনুষ্য হৃদয় মাঝে আছে বিদ্যমান॥
দূর হতে দূরে তিনি মূঢ়জনে জানে।
অত্যন্ত নিকটে তেঁহ জ্ঞানী ইহা মানে॥
সার তত্ত্ব কহিলাম বেদের বাখান।
মূর্খলোকে ইহার না রাখয়ে সন্ধান॥
এইসব সত্য তত্ত্ব জানে যেই জন।
পুনঃ পুনঃ সেজনার না হয় মরণ॥
প্রভু মুখে এই সব শুনি তীর্থরাম।
বিষয়ে আসক্তি ছাড়ি করে হরি নাম॥

(গোবিন্দদাসের করচা)

দীর্ঘ হইলেও আমরা এই বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম। কেননা এই

বৃত্তান্তে চৈতন্যদেবের মহত্ত্ব ত প্রকাশ পাইতেছেই তদ্ভিন্ন তাঁহার উপদেশের একটু আভাস পাওয়া যায়। সাধারণতঃ চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেবের উপদেশের মর্ম্ম বিশেষ পাওয়া যায় না। গোবিন্দ দাসের করচায় কয়েক স্থানেই তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তীর্থরামকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্যদেব পার্থিব ধনসম্পদের অসারতা এবং মানবজীবনের অনিত্যতা প্রদর্শন করিয়া ঈশ্বর ভজনে প্রবৃত্তি জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরকে জানিবার জন্য তর্কবিতর্ক বা বহু শাস্ত্রালোচনার প্রয়োজন নাই। সরল বিশ্বাসেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঈশ্বর মানুষের হৃদয়মাঝে বর্ত্তমান আছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় ধনী তীর্থরাম বিষয়-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া ভিখারী হইয়া ধর্ম্মসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। তীর্থরামের পত্নী এই সংবাদ পাইয়া সেখানে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন এবং তীর্থরামকে ফিরাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তীর্থরাম বলিলেন, মায়াজাল কাটিয়া বাহির হইয়াছি আর ফিরিব না। তুমি আমার সমুদায় বিষয় বৈভব ভোগ কর। তোমাকে সব দিলাম।

"কাঁদিতে কাঁদিতে তবে কমল কুমারী।
ফিরে গেল তীর্থ হল পথের ভিখারী॥"

তীর্থরামকে উদ্ধার করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব সিদ্ধ বটেশ্বর পরিত্যাগ করিলেন। যাত্রাকালে লোকে বস্ত্র প্রভৃতি অনেক উপহার আনিল, কিন্তু তিনি তাহা কিছুই গ্রহণ করিলেন না।

"কতলোক কত বস্ত্র আনি জোটাইল।
কিন্তু এক খণ্ড প্রভু হাতে না ছুঁইল॥
গোবিন্দ বলিয়া প্রভু ডাক দিল শেষে।
চাপড় মারিলা এক মোর পৃষ্ঠ দেশে॥

সাতদিন গোঞাইনু এই বটেশ্বরে।
নন্দীশ্বর যাই চল দর্শনের তরে॥
এই কথা শুনি কাঁধে লইলাম খড়ি।
চলিলাম প্রভুসনে বটেশ্বর ছাড়ি॥"

চৈতন্যচরিতামৃতেও এই বটেশ্বরের উল্লেখ আছে, কিন্তু ইহাকে বটেশ্বর বা অক্ষয়বট না বলিয়া সিদ্ধবট বলা হইয়াছে এবং ধনী তীর্থরাম-ঘটিত বৃত্তান্তের কোন উল্লেখ নাই। তৎপরিবর্ত্তে রাম উপাসক এক ব্রাহ্মণের রাম নাম ছাড়িয়া কৃষ্ণ নাম গ্রহণের বিবরণ আছে। শ্রীচৈতন্যদেব সিদ্ধবট আসিলে এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে লইয়া যান।

"সেই বিপ্র রাম নাম নিরন্তর লয়।
রাম নাম বিনু অন্য বচন কয়॥
সেই দিন তাঁর ঘরে রহিল ভিক্ষা করি।
তারে কৃপা করি আগে চলিলা গৌরহরি॥"

(চৈ, চ, ম, লী, নবম পরিচ্ছেদ)

চৈতন্যচরিতামৃত মতে তিনি সিদ্ধবট হইতে স্কন্দ দর্শনের জন্য স্কন্দ তীর্থে গমন করেন এবং ত্রিবিক্রম দেখিবার জন্য ত্রিমল্ল যান। তথা হইতে পুনরায় সিদ্ধবটে ফিরিয়া আসেন এবং পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হন; কিন্তু দেখিলেন ব্রাহ্মণ রাম নাম ছাড়িয়া কৃষ্ণ নাম করিতেছেন।

"পুন, সিদ্ধবট আইলা সেই বিপ্র ঘরে।
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লই নিরন্তরে॥
ভিক্ষা করি মহা প্রভু তারে প্রশ্ন কৈল।
কহ বিপ্র এই তোমার কোন্ দশা হৈল॥"

পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর কহিতে রাম নাম।
এবে কেন নিরন্তর কহ কৃষ্ণ নাম॥
বিপ্র কহে এই তোমার দর্শন প্রভাব।
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাব॥
বাল্যাবধি রাম নাম গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণ নাম আইল একবার॥
সেই হইতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল।
কৃষ্ণ নাম স্ফুরে রাম নাম দূরে গেল॥
(চৈ, চ, ম,লী, নবম পরিচ্ছেদ)

আমাদের নিকটে করচার বিবরণই অধিকতর মূল্যবান মনে হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের রাম নাম ছাড়াইয়া কৃষ্ণনাম লওয়াইবার কোন ব্যগ্রতা কোথাও দেখা যায় না। এবং স্কন্দক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে গিয়া পুনরায় সিদ্ধবটে ফিরিয়া আসা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। চৈতন্য-চরিতামৃত মতে শ্রীচৈতন্যদেব অতঃপর শিবদর্শনের জন্য বৃদ্ধকাশী যান এবং তথা হইতে এক ব্রাহ্মণ-গ্রামে গমন করেন সেখানে বহু পণ্ডিত-ব্রাহ্মণের বাস। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে তর্কে পরাজিত করিয়া স্বীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন।

"তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদীগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম॥
নিজ নিজ শাস্ত্রে সব উদ্‌গ্রাহে প্রচণ্ড।
সর্ব্বমত দূষী প্রভু করে খণ্ড খণ্ড॥
সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে॥

হারি হারি প্রভুমতে করেন প্রবেশ।
এই মত বৈষ্ণব প্রভু কৈল দক্ষিণ দেশ॥"

(চৈঃ, চঃ, ম, লী নবম পরিচ্ছেদ)

এখানে বৌদ্ধগণের সঙ্গে সংঘর্ষেরও একটী বিবরণ লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধ আচার্য্যগণ চৈতন্যদেবের আগমন-সংবাদ পাইয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিতে আসেন। কিন্তু তর্কে পরাস্ত হইয়া তাঁহাকে অপবিত্র অন্ন ভোজন করাইয়া পতিত করিতে চেষ্টা করেন।

"দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে বৌদ্ধের হইল লজ্জাভয়॥
প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধঘর গেলা।
সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈলা॥
"অপবিত্র অন্ন এক থালিতে করিঞা।
প্রভু আগে আনিল বিষ্ণু প্রসাদ বলিয়া॥
হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইলা।
ঠোঁটে করি অন্নসহ থালি লয়ে গেলা॥
বৌদ্ধগণের উপর অন্ন পড়ে অমেধ্য হইয়া
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিঞা
তেরছে পড়িল থালি মাথা কাটা গেল।
মূর্চ্ছিত হইয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িল॥
হাহাকার করি কাঁদে সব শিষ্যগণ।
সবে আসি প্রভুপদে লইল শরণ॥"

(চৈ, চ, ম, লী, নবম পরিচ্ছেদ)

প্রমাদ দেখিয়া বৌদ্ধগণ শ্রীচৈতন্যদেবের স্তুতি করিতে লাগিল,

তাহারা বলিল তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর, অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদের গুরুকে জীবন দান কর।

"প্রভু কহে সবে কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি।
গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি॥
তোমা সবার গুরু তবে পাইবে চেতন।
সর্ব্ববৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
গুরু কর্ণে কহে কহ কৃষ্ণ রাম হরি।
চেতন পাইলে আচার্য্য উঠে হরি বলি॥
কৃষ্ণ কহি আচার্য্য প্রভুকে করয়ে বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক পাইল বিস্ময়॥
এইমত কৌতুক করি শচীর নন্দন।
অন্তর্দ্ধান কৈল কেহ না পাই দর্শন॥"

(চৈ, চ, ম, লী, নবম পরিচ্ছেদ)

পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধাচার্য্যগণের সঙ্গে সংঘর্ষ এই উভয় ঘটনারই গোবিন্দের করচায় লিখিত বিবরণই অধিকতর স্বাভাবিক ও সমীচীন বলিয়া মনে হয়

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন যে, বটেশ্বর ছাড়িয়া পথে এক দশ-ক্রোশ ব্যাপী জঙ্গল সম্মুখে পড়িল। তাহা দেখিয়া গোবিন্দদাসের মনে ভয় হইল। চৈতন্যদেব তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আগে আগে চলিলেন। গোবিন্দদাস ভয়ে ভয়ে তাঁহার পিছে পিছে সঙ্কীর্ণ বন্যপথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। জঙ্গল পার হইয়া মুন্নানগরের পাশে একটী বৃক্ষতলে বিশ্রামের জন্য তাঁহারা বসিলেন। সম্ভবতঃ তখন দিন প্রায়, শেষ হইয়াছিল, দিনে দিনে বনপথ অতিক্রম করিবার জন্য তাঁহারা খুব দ্রুতবেগে হাঁটিয়া আসিয়া থাকিবেন। বৃক্ষতলে বসিয়া তাঁহারা

শ্রমাপনয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে মুন্নাবাসী দুইজন গৃহস্থ কিছু আটা লইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ভাবে মগ্ন আছেন কোন কথাই বলিলেন না। গৃহস্থ দুইজন সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব তেজ দেখিয়া নিকটে বসিয়া একদৃষ্টে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে একে একে বহুলোকের জনতা হইল। মুন্নানগরের নরনারী সংবাদ পাইয়া দলে দলে আসিয়া সন্ন্যাসীর চরণে প্রণাম করতঃ তাঁহাকে নগরের মধ্যে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। কিন্তু প্রেমে মত্ত শ্রীচৈতন্যদেব কোন কথাই শুনিলেন না, ক্রমে ভাব-সমুদ্র উছলিয়া উঠিল তখন তিনি উঠিয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে উপস্থিত লোক-গুলিও করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল। চৈতন্যদেব কখনও পড়েন, কখনও উঠেন। দর দর ধারে নয়ন হইতে অশ্রুধারা বহির্গত হইতেছে। তাঁহার ভাব দেখিয়া পাষণ্ডগণের মনেও ভক্তি উছলিয়া উঠিল। গৃহের কুলবধূগণও সে দৃশ্য দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। সন্ন্যাসীর শীর্ণ দেহ ও মস্তকে জটাভার দেখিয়া তাঁহারা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। এইভাবে অর্দ্ধেক রাত্রি কাটিয়া গেল। সে রাত্রিতে আর নিদ্রা হইল না। প্রভাতে শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণপথে অগ্রসর হইলেন। মুন্নাবাসিগণ সেদিন সেখানে থাকিতে দলে দলে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি সে কথা শুনিলেন না। যাত্রাকালে এক দরিদ্রা বৃদ্ধা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র, উদরে অন্ন নাই, সে কাঁদিয়া মহাপ্রভুর নিকট বস্ত্র ভিক্ষা করিল। শ্রীচৈতন্যদেব বৃদ্ধাকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন এবং উপস্থিত নরনারীর নিকট অন্নবস্ত্র ভিক্ষা চাহিলেন।

"বলে মোরে ভিক্ষা দেহ মুন্নাবাসী ভাই।
অন্নবস্ত্র ভিক্ষা পেলে তবে চলে যাই॥"

তিনি নিজের জন্য ভিক্ষা চাহিতেছেন ভাবিয়া মুন্নাবাসিগণ সাগ্রহে বহু অন্নবস্ত্র লইয়া আসিল এবং প্রত্যেকেই আমার বস্ত্র লউন, আমার বস্ত্র লউন বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল।

"প্রভু কহে শুন শুন মুন্নাবাসীগণ।
তোমাদের ভিক্ষা আমি করিনু গ্রহণ॥
বৃক্ষতলে এই দুঃখিনী বসে আছে।
এইসব অন্নবস্ত্র দাও ওর কাছে॥"

(গোবিন্দদাসের কড়চা)

সন্ন্যাসীর দয়া দেখিয়া লোকে অধিকতর বিস্মিত হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন তিনি গোবিন্দদাসকে অগ্রসর হইবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। বহুলোক তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে লাগিল, কিন্তু তিনি আর পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন না। একে একে সকল লোক ফিরিয়া গেল কেবল রামানন্দ স্বামী নামে এক ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলেন না।

"বড় সদাচার হয় রামানন্দ স্বামী।
গোপনেতে তার তত্ত্ব পুছিলাম আমি॥
"রামানন্দ বলে ভাই প্রভুরে দেখিয়া;
আমার কঠিন মন গিয়াছে গলিয়া॥
যদি প্রভু শিষ্য নাহি করেন আমারে।
তখনি ত্যজিব প্রাণ না রব সংসারে॥"

(গোবিন্দদাসের কড়চা)

দিবা দ্বিপ্রহরে তাঁহারা বেঙ্কট নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। অসাধারণ জ্ঞানী বলিয়া তাঁর খ্যাতি। "বেদান্তের পণ্ডিত বড় তুল্য তাঁর নাই।" তিনি চৈতন্য-

দেবের আগমন সংবাদ পাইয়া বিচার করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন আমি আপনার নিকটে হার মানিতেছি। বৈদান্তিক পণ্ডিত তথাপি ছাড়িলেন না, বিচার করিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। বাধ্য হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

"বিচার করিতে চাহে পণ্ডিত প্রবর।
হারিলাম বলি প্রভু করয়ে উত্তর॥
তথাপি না ছাড়ে স্বামী বিচার করিতে।
বদন বিকাশি প্রভু লাগিলা হাসিতে॥
অদ্বৈতবাদের কথা স্বামী যত কয়।
দ্বৈতাদ্বৈত বাদ তুলি চৈতন্য বুঝায়॥
অবশেষে ঘোরতর বিচার বাধিল।
ক্রমে ক্রমে দণ্ডিস্বামী হারি মানিনিল॥

(গোবিন্দদাসের কড়চা)

তিনি সশিষ্যে ভক্তি পথের পথিক হইলেন। বেঙ্কটনগরবাসী বহুসংখ্যক নরনারী আগন্তুক সন্ন্যাসীর ভাবে মাতিয়া উঠিলেন।

"তিনদিন থাকি প্রভু বেঙ্কটনগরে।
অকপটে হরিনাম দেন ঘরে ঘরে॥
কিবা নর কিবা নারী মাতিল সবায়।
সেই সঙ্গে নাচে মোর চৈতন্য গোঁসাই॥
মাতিল নগর পল্লী বালক বালিকা।
কতলোক আসে যায় কে করে তালিকা॥
ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ দেন সর্ব্বজনে।
চিরকেলে মূঢ় যত লোটায় চরণে॥

পাষণ্ড দেখিলে প্রভু আগে দেন কোল।
কোল দিয়া তারে কন হরি হরি বোল॥"

(কড়চা)

নিকটবর্ত্তী এক বনে পান্থভীল নামে এক ভয়ঙ্কর দস্যু ছিল। বনমধ্যে পথিক পাইলে সে তাহার সর্ব্বনাশ করিতে এই কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্যদেব সেখানে চলিলেন। সকল লোক তাঁহাকে নিষেধ করিতে লাগিল। তাহারা বলিল পান্থভীল অতি পাপাচারী, তার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, আপনাকে পাইলে বধ করিতে পারে। কিন্তু চৈতন্যদেব কোন বাধা না মানিয়া পান্থভীলের নিকটে উপস্থিত হইলেন। পান্থ তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিল।

"প্রভু বলে পান্থ তুমি সাধু মহাশয়।
তোমারে দেখিয়া সব পাপ হইল ক্ষয়॥
গৃহস্থের ন্যায় তুমি নও গৃহবাসী।
তুমি ত পরম সাধু বিরক্ত সন্ন্যাসী॥
বিষয়ের কীট নহ গৃহস্থের ন্যায়।
যাতে তাতে তুষ্ট দেখি তোমার হৃদয়॥
পুত্র নাই কন্যা নাই নাহি তব জায়া।
বিষয়েতে মত্ত নহ নাহি কোন মায়া॥
ধন্য পান্থরাজ তুমি সাধু শিরোমণি।
তোমারে দেখিয়া সুখী হইল পরাণি॥
তৃণ তুল্য জ্ঞান করি বিষয় বিভব।
এখনি ত্যজিতে পার যত আছে সব॥
রমণীর সঙ্গে তুমি নাহি কর বাস।
তাই আইলাম হেথা মিটাইতে আশ॥

শিষ্যগণে থাক তুমি সদাই বেষ্টিত।
তোমাকে দেখিতে চিত্ত হয় পুলকিত॥
মায়া মোহে বদ্ধ তুমি নহ সদাশয়।
তুমিই সাধুর শ্রেষ্ঠ এই মনে লয়॥
নীরবে শুনিয়া ভীল প্রভুর বচন।
ভক্তিভাবে প্রণাম করিলা সেইক্ষণ॥
প্রভুমুখে হরিনাম শুনি বার বার।
উছলিল তার মনে ভক্তি-পারাবার॥
লোটায়ে পড়িল ভীল প্রভুর চরণে।
কোলে করি প্রভুনাম দিলেন শ্রবণে॥
হরিনামে মত্ত হয়ে যত দস্যুগণ।
সেই বনে করিলেক আনন্দ কানন॥
সেই দিন হ'তে পান্থ পরিল কৌপীন।
হইল সাধুর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেতে প্রবীণ॥" [কড়চা]

এইরূপে দস্যু পান্থভীল সদলে পাপকার্য্য ছাড়িয়া সাধুপথ অবলম্বন করিলেন। একি আশ্চর্য্য স্বর্গীয় শক্তি! দুর্ব্বৃত্ত দস্যু, পতিতা রমণী, বিষয়াসক্ত ধনী, দাম্ভিক বৈদান্তিক, নিরীশ্বর বৌদ্ধ যে কেহ এই ভিখারী, নিরভিমানীর সংস্পর্শে আসিল তাহারই জীবনে মধুর ভক্তির সঞ্চার হইতে লাগিল। বহুদিন অনাহারে অনিদ্রায়, রৌদ্র বৃষ্টিতে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিয়া তাঁহার শরীর জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল তবুও অদম্য উৎসাহে নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘরে ঘরে হরিনাম বিতরণ করিতে লাগিলেন। বনমধ্যে পান্থভীল-প্রমুখ দস্যুগণের সঙ্গে তিন রাত্রি অতিবাহিত করিয়া তিনি অন্যত্র গমন করিলেন। এখন তিনি তামিল দেশে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গী সে দেশের লোকের ভাষা বুঝিতে পারিতেন না। তিনি লিখিতেছেন,

"সে দেশের লোক সব করে কাঁই মাই।
তথাপি বিলান নাম চৈতন্য গোঁসাই ॥"

শিক্ষিত পণ্ডিতগণের সঙ্গে চৈতন্যদেব সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা বলিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সাধারণ লোকের সঙ্গে কিরূপে বাক্যালাপ করিতেন বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ তীক্ষ্ন ধীশক্তিশালী নবদ্বীপের পণ্ডিত ইতিমধ্যে কিয়ৎ-পরিমাণে তামিল ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আরও কিছু-দিন পরে তামিল ভাষায় জ্ঞানের উল্লেখ আছে।

গোবিন্দদাসের করচায় তৎপরে গিরীশ্বর নামে একস্থানে গমনের উল্লেখ আছে। সেখানে একটী আশ্চর্য্য মন্দির ছিল। লোকে বলিত স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা সেই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মন্দিরের তিন দিক্ পর্ব্বতে বেষ্টিত। দক্ষিণ ভাগে একটি প্রকাণ্ড বিল্ববৃক্ষ। মন্দিরে গিরীশ্বর নামে শিবলিঙ্গ ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব নিজহস্তে বিল্বপত্র চয়ন করিয়া অঞ্জলি প্রদান করিলেন। তৎপরে প্রেমেমত্ত হইয়া নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন।

"কভু হাসে কভু কাঁদে পাগলের মত।
দর দর অশ্রুহ্রদে পড়ে অবিরত ॥
রোমাঞ্চিত কলেবর যেন জড় প্রায়।
আশ্চর্য্য প্রেমের ভাব কহনে না যায়॥
কোন ইচ্ছা নাই প্রভু মত্ত হরিনামে।
কাটিল দিনেক দুই সেই শৈবধামে॥" (কড়চা)

তৃতীয় দিবসে এক জটিল সন্ন্যাসী পর্ব্বত শিখর হইতে নামিয়া শিবপূজা করতঃ আবার পর্ব্বত-শিখরে চলিয়া গেলেন। তিনি মৌনব্রতধারী এবং প্রকৃত বৈরাগী। চৈতন্যদেব তখনও ভাবে অচেতন ছিলেন। চেতনা পাইলে সঙ্গীর মুখে সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য পর্ব্বত-

শিখরে উঠিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন সন্ন্যাসী এক বৃক্ষতলে ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গে কোন বস্ত্র নাই, নিকটে কোন ব্যবহার্য্য দ্রব্য নাই। চৈতন্যদেব ও তাঁহার সঙ্গী তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন না। ক্ষণকাল পরে ডাকিলেন, তাহাতেও তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল না। তখন শ্রীচৈতন্যদেব নিকটে বসিয়া স্তব আরম্ভ করিলেন। এইবার সন্ন্যাসী চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। এই দুই বিরক্ত সন্ন্যাসীর মিলনে প্রচুর আনন্দ হইল। জটিল সন্ন্যাসী আতিথ্য-সৎকারের জন্য বন হইতে পরটা নামে একপ্রকার ফল আনিলেন। চৈতন্যদেব তাহা হইতে দুই ফল নিজে গ্রহণ করিয়া চারিটী সঙ্গী গোবিন্দ দাসকে দিলেন।

"বড় মিষ্ট সুধাসম পরটার ফল।
ফল খেয়ে চিত্ত মোর হইল চঞ্চল॥
লোভ করি কতবার এ পাপ নয়ন।
প্রভুর ফলের পানে চাহে অনুক্ষণ॥" (কড়চা)

শ্রীচৈতন্য তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া নিজের ফল দুইটীও সঙ্গীকে দিলেন। কিন্তু গোবিন্দদাস লজ্জাবশতঃ তাহা ভক্ষণ করিতে চাহিলেন না। চৈতন্যদেবও তখন তাহাকে জোর করিয়া সেই ফল খাওয়াইলেন। সন্ন্যাসী আরও দুইটী ফল আনিয়া চৈতন্যদেবকে দিলেন। তাঁহারা ফল খাইয়া নিকটবর্ত্তী নির্ঝরের সুশীতল নির্ম্মল জল পান করিলেন। তৎপরে শ্রীচৈতন্যদেব নাম সংকীর্ত্তনে মত্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার ভাব উপস্থিত হইল।

"হরিনামে মত্ত প্রভু প্রেম উপজিল।
কদম্বের মত অঙ্গ শিহরি উঠিল॥

প্রেমভরে খুলে গেল জটার বন্ধন।
চরণে চরণ বাঁধি পড়িল তখন॥
কপাল কাটিয়া গেল পাথরের ঘায়।
রুধিরের ধার কত পড়িল ধরায়॥
মুখে লালা বহে কত জল নাসিকায়।
জড়ের সমান পড়ি রহে গোরারায়॥" (কড়চা)

ইহা দেখিয়া সন্ন্যাসীরও ভক্তি জাগিল। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্মশ্রু বহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যদেবের চেতনা হইলে সন্ন্যাসী বলিলেন, তুমি স্বয়ং ঈশ্বর। মহাপ্রভু এইকথা শুনিয়া কর্ণে হাত দিয়া বলিলেন, এমন কথা বলিও না। সন্ন্যাসী কহিলেন, তুমি নিশ্চয় মনুষ্য নহ। শ্রীচৈতন্যদেবও সন্ন্যাসীর অনেক স্তুতিবাদ করিলেন, বলিলেন, ঈশ্বরে তোমার আশ্চর্য্য প্রেম। তোমাকে দেখিলে পাষণ্ডেরও সুমতি হয়। তোমার বস্ত্র নাই, পাত্র নাই, ধনে স্পৃহা নাই, পার্থিব সুখের বশীভূত নহ, তোমার চরণে কোটী কোটী নমস্কার।

অতঃপর শ্রীচৈতন্যদেব ত্রিপদীনগরে যান। সেখানে শ্রীরামের মূর্ত্তি দেখিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। তথায় বহু সংখ্যক রামাইতবৈষ্ণব বাস করিতেন। তাঁদের মধ্যে মথুরা নামে এক পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যদেবকে বিচারের জন্য আহ্বান করিলেন। তিনি জোড় হস্তে বলিলেন আমি মূর্খ, বিচার জানি না, আপনার নিকটে শতবার পরাজয় স্বীকার করিতেছি। আপনি শ্রীরামের ভক্ত, আপনার নিকটে অনেক তত্ত্বকথা শুনিতে পাইব। বিরক্ত রামভক্ত হইয়া জিগীষার বশে শুভ্র বস্ত্রে কেন কালি লাগাইতেছেন। কিছু তত্ত্ব কথা বলুন, আপনার

কথা শুনিয়া লোকে শুদ্ধ হইবে। তর্কে কোন লাভ নাই। ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন যাহাতে লোকের উপকার হইবে। এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমে মত্ত হইয়া উঠিলেন। হরিবোল বলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অঙ্গের বস্ত্র কোথায় খসিয়া পড়িল, শরীর লোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল। অবশেষে আছাড় খাইয়া ভূমিতে জড়প্রায় অচেতন হইয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া রামাইতগণ বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নাচিতে লাগিলেন। কেহ বলে এ সন্ন্যাসী মানুষ নয়, কেহ বা চরণে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ত্রিপদী হইতে শ্রীচৈতন্যদেব পানানরসিংহে যান। মথুরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে ফিরাইয়া পাঠাইলেন।

চৈতন্যচরিতামৃতেও ত্রিপদী এবং বেঙ্কটনগরে গমনের উল্লেখ আছে। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত এবং অস্পষ্ট। যাহা হউক আমরা তাঁহার বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"মহাপ্রভু বলি আইলা ত্রিপদী ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখি গেলা বেঙ্কটা চলে॥
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরাম দর্শন।
রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম স্তবন॥
"স্বপ্রভাবে লোক সব করঞা বিস্ময়।
পানানরসিংহে আইলা প্রভু দয়াময়॥
নৃসিংহে প্রণতি স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল॥
শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন।
প্রভাবে বৈষ্ণব কৈল সব শৈবগণ॥

বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মীনারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন॥
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত বহুত করিল।
দিন দুই রহি লোক কৃষ্ণভক্ত কৈল॥
ত্রিমল্ল দেখি গেলা ত্রিকাল-হস্তি-স্থান।
মহাদেব দেখি তারে করিলা প্রণাম॥
পক্ষিতীর্থে যাই কৈল শিব দরশন।
বৃদ্ধ কোন তীর্থে তবে করিল গমন॥
শ্বেত বরাহ দেখি তারে নমস্কার করি।
পীতাম্বর শিব স্থানে গেলা গৌরহরি॥
শিয়ালী ভৈরবী দেবী করিল দর্শন।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন।

(চৈ, চ, ম, লী, নবম পরিচ্ছেদ)

চরিতামৃত এবং গোবিন্দদাসের করচা উভয় গ্রন্থে ত্রিপদীর পরে পানা-নরসিংহে গমনের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে গোবিন্দদাসের করচার বিবরণ অতি সুস্পষ্ট।

কেন পানা নরসিংহ নাম হইয়াছে গোবিন্দদাস তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রতিদিন চিনি পানা দিয়া নৃসিংহদেবের ভোগ দেওয়া হয় সেই জন্য তিনি পানা-নরসিংহ নামে প্রসিদ্ধ। পূজারীর নাম ও ব্যবহার প্রভৃতি সুস্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে।

"নৃসিংহের অধিকারী মাধবেন্দ্র ভূজা।
নিত্য আসি নরসিংহ দেবে করে পূজা॥
তুলসীর মালা আনি দিলা প্রভুর গলে।
মালা পরি প্রভু মোর হরি হরি বলে॥

পূজারী প্রসাদ কিছু আনিলা ত্বরিতে।
কণা মাত্র প্রসাদ লইলা প্রভু হাতে॥
হাতে করি প্রসাদের বহু স্তব করে।
প্রসাদ পাইতে দুই চক্ষে অশ্রু ঝরে॥
শর্করের পানা মোরে দিলা আনাইয়া।
পিয়ে পিয়ে খাই পানা উদর পুরিয়া॥" (কড়চা)

এই বিবরণ প্রত্যক্ষ দর্শকের ভিন্ন অন্যের লেখনী হইতে বাহির হওয়া সম্ভব নয় এবং চরিতামৃতের বিবরণ হইতে ইহার পার্থক্য সহজেই বুঝা যায়। তৎপরে কাঞ্চীতীর্থ গমনের বিবরণ। এখানেও উভয় গ্রন্থের পার্থক্য সুস্পষ্ট এবং কোন্‌টি অধিক প্রামাণিক তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। চরিতামৃতে কেবল উল্লেখ মাত্র আছে, কিন্তু করচায় নানা ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে যাহা দেখিয়া সুস্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, লেখক স্বচক্ষে সে সমুদায় দর্শন করিয়াছিলেন।

"ভবভূতি নামে শেঠি বিষ্ণুকাঞ্চী স্থানে।
লক্ষ্মীনারায়ণ সেবা করয়ে যতনে॥
বড় ভক্ত হয় শেঠী সাধু চূড়ামণি।
লক্ষ্মীনারায়ণ গত তাহার পরাণি॥
নিত্য সেবা ভক্তি করে শেঠী মহাশয়।
সেবার লাগিয়া করে বহু অর্থ ব্যয়॥
মন্দির পাখালে নিত্য তাহার রমণী।
সেবার লাগিয়া ব্যস্ত সাধু শিরোমণি॥
নিত্য দুই মণ ক্ষীরে পায়সান্ন হয়।
প্রসাদ পাইতে কত উদাসীন যায়॥

লক্ষ্মীনারায়ণ দেখি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
প্রণাম করিয়া স্তব করিলা বিস্তর॥ (কড়চা)

বিষ্ণুকাঞ্চী হইতে ছয়ক্রোশ দূরে প্রান্তরে ত্রিকালেশ্বর শিবের মন্দির। তাঁহার চারিহস্ত পরিমিত গৌরী-পট্ট। সে-স্থান হইতে পক্ষগিরি দেখা যায়। তাহার নিম্নে পক্ষতীর্থ। সেখানে ভদ্রানদী প্রবাহিত। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সঙ্গী তথায় থাকিয়া ভদ্রা নদীতে স্নান করিয়া ভিক্ষালব্ধ চাম্পীফলে আহারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া রহিলেন।

"বৃক্ষতলে রহিলাম শয়ন করিয়া।
রজনীতে আক্রমিল শার্দ্দূল আসিয়া॥
তর্জ্জন গর্জ্জন দেখি মোর গোরা চাঁদ।
হাসিয়া পাতিল প্রভু হরিনাম-ফাঁদ॥
হরিধ্বনি শুনি ব্যাঘ্র লেজ গুটাইয়া।
পিছাইয়া গেল এক বনে লম্ফ দিয়া॥
আশ্চর্য্য প্রভাব মুহি স্বচক্ষে হেরিয়া।
সেই পদরজঃ মাথে লইনু তুলিয়া॥" (কড়চা)

ভদ্রা হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে কালতীর্থ। চরিতামৃতে এই স্থানকে বোধ হয় ত্রিকাল-হস্তী নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। এবং সেখানে শিবের মন্দির আছে বলা হইয়াছে। চরিতামৃতে কাঞ্চী ও ত্রিকাল-হস্তীর মধ্যে ত্রিমল্ল নামে আর একটী স্থানের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে ত্রিপদীর পরে ত্রিমল্লের উল্লেখ আছে। ইহা বোধ হয় পুনরুক্তি মাত্র। স্বচক্ষে না দেখার জন্য এই চরিতামৃতে এ প্রকার ভ্রম আরও অনেক স্থানে দেখা যায়।

কিন্তু কড়চায় বরাহ অবতারের উল্লেখ আছে। চরিতামৃতকারও একস্থানে শ্বেত-বরাহ-মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সেই স্থানকে বৃদ্ধ কোল-তীর্থ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

তথা হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে সন্ধি-তীর্থ। সেখানে নন্দা ও ভদ্রা দুই নদী মিলিত হইয়াছে। সেইজন্যই বোধহয় এইস্থানের নাম সন্ধি-তীর্থ হইয়াছে। তীর্থস্বামীর নাম সদানন্দ পুরী।

তিনি অদ্বৈতবাদী। চৈতন্যদেবের সঙ্গে পরিচয়ের পরে তর্ক তুলিলেন, কিন্তু বিচারে পরাস্ত হইয়া ভক্তিধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তথা হইতে তাঁহারা চাঁই-পল্লী তীর্থে গমন করেন। সেখানকার লোকেরা বড় সদাচার। সেখানে সিদ্ধেশ্বরী নামে এক ভৈরবী ছিলেন।

"সিদ্ধেশ্বরী নামে এক ভৈরবী সুন্দরী।
তেজস্বিনী মহাতপা যেন মহেশ্বরী ॥
অস্থিচর্ম্ম অবশিষ্ট হইয়াছে তপে।
বসিয়া আছেন এক বিল্বমূলে জপে ॥
স্থিরভাবে বসি তিনি করিছেন ধ্যান।
তাঁহারে দেখিলে পাপী পায় বহু জ্ঞান ॥
শতবর্ষ বয়ঃক্রম হয়েছে তাঁহার।
তথাপি না চিনা যায় হেরিলে আকার ॥
শৃগালী ভৈরবী নামে আর এক মূরতি।
নদীর কূলেতে হয় তাঁহার বসতি ॥ (কড়চা)

চৈতন্যচরিতামৃতকার বোধ হয় ইঁহাকেই শিয়ালী ভৈরবী বলিয়াছেন।

চৈতন্যচরিতামৃত ও কড়চা উভয় গ্রন্থ অনুসারে শ্রীচৈতন্যদেব অতঃপর কাবেরীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এখানেও চরিতামৃতের বিবরণ

অতি সংক্ষিপ্ত। গ্রন্থকার কয়েকটী স্থানের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

আমরা তাঁহার লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি

"শিয়ালী ভৈরবী দেবী করিল দর্শন।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন॥
গো-সমাজ শিব দেখি আইলা বেদাবন।
মহাদেব দেখি তারে করিল বন্দন॥
"অমৃতলিঙ্গ-শিব" আসি দর্শন করিল।
সব শিবালয়ে শিব, বৈষ্ণব করিল॥
দেবস্থানে আসি কৈল বিষ্ণু দরশন।
"শ্রীবৈষ্ণবগণ" সনে গোষ্ঠী অনুক্ষণ॥
"কুম্ভকর্ণ কপীলের" দেখি সরোবর।
শিবক্ষেত্রে আসি শিব দেখে তেজোবর॥
পাপ নাশনে বিষ্ণু করি দরশন।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে কৈল আগমন॥

(চৈঃ চঃ মঃ লীঃ নবম পরিচ্ছেদ)

কড়চায় কাবেরী তীরে চৈতন্যদেবের ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ আছে। তিনি কাবেরী দর্শন করিয়া ভক্তিভরে স্নান করিয়া কূলে বসিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন হইলেন।

"স্নান করি কাবেরীতে গৌরাঙ্গ কিশোর।
হরিনাম-সুধাপানে হইলা বিভোর॥
অপরাহ্নে মোরে বলে ভিক্ষা করিবারে।
ভিক্ষা লাগি যাইলাম নগর মাঝারে॥

"থোড়া থোড়া চূনা আটা সংগ্রহ করিয়া।
প্রভুর সম্মুখে আনি দিলাম ধরিয়া॥
রুটি পাকাইয়া প্রভু লাগাইলা ভোগ।
প্রসাদ পাইয়া মোর হোলো উপযোগ॥
আমার দয়াল প্রভু নাগর নগরে।
প্রাতে উঠি চলিলেন কৃষ্ণ-প্রেমভরে॥
ধূলা মাখা জটা বাঁধা অন্য কথা নাই।
পথে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি চলিছে নিমাই॥" (কড়চা)

নাগর-নগরে শ্রীরাম লক্ষ্মণের মন্দির ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব সেই মন্দিরে গিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নাগর নগরে বহুলোকের বাস ছিল। চৈতন্যদেবের অদ্ভুত প্রেমের সংবাদ পাইয়া নগরবাসী আবাল-বৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। এমন কি দশক্রোশ দূর হইতেও লোক আসিয়া জুটিল।

"দশক্রোশ হতে লোক আসিয়া জুটিল।
একে একে সবে প্রভু হরিনাম দিল॥
এমন দয়াল প্রভু কভু দেখি নাই।
ঘরে ঘরে নাম দেই চৈতন্য গোঁসাই॥

নাগরনগরে শ্রীচৈতন্যদেব তিন দিন অবস্থিতি করেন। সেখানে একজন দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণ ছিল। সে দল-বল লইয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে কপট বলিয়া বহু তাড়ন করিল।

"দলবল লয়ে সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
দয়াল প্রভুরে বলে দূর দূর দূর॥
ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলে ওরে জুয়াচোর।
কপট সন্ন্যাসী সেজে করিতেছ জোর॥

গ্রাম্য লোকে মজাইছ ধর্ম্ম শিক্ষাছলে।
এইদণ্ডে তাড়াইব প্রকাশিয়া বলে॥
প্রভুর সম্মুখে আসি কত গালি দিলা।
তার কটু বাক্য প্রভু হেসে উড়াইলা॥
ব্রাহ্মণে ডাকিয়া শেষে চৈতন্য গোঁসাই।
বলে মোরে মেরে তুমি হরি বোলভাই॥ (কড়চা)

অন্যান্য দর্শকেরা ব্রাহ্মণের ব্যবহার দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইল, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া ব্রাহ্মণকে উপদেশ-বাক্য কহিলেন।

"শুন ওহে দয়াময় ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
হরি হরি বল সুখ পাইবে প্রচুর॥
অনিত্য দেহেতে আর কোন সুখ নাই।
হরিনামে মজিয়া আনন্দ কর ভাই॥
জড়পিণ্ড এই দেহ মরণ-সময়।
কেহ নাহি সঙ্গে যাবে এই নিশ্চয়॥
ভাই বন্ধু দারা সুত কেহ কারো নয়।
সবে বস্ত্র অলঙ্কার অর্থ দাস হয়॥
শৃগাল কুক্কুরে খাবে অনিত্য শরীর।
পচিয়া গলিয়া যাবে এই কর স্থির॥
হরি বলি বাহু তুলি নাচ মোর সনে।
যাইতে হবে না আর শমন-সদনে॥ (কড়চা)

চারিদিকে যত লোক দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা চৈতন্যদেবের উপদেশে মত্ত হইয়া হরি বলিয়া নাচিতে লাগিল। দুর্ম্মতি ব্রাহ্মণেরও মন বিগলিত হইল। সে চৈতন্যদেবের চরণ-তলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

শ্রীচৈতন্যদেব নাগর হইতে সাত ক্রোশ দূরে তাঞ্জোর নগরে গমন করিলেন। সেখানে ধলেশ্বর নামে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গৃহ-প্রাঙ্গণে বট-বৃক্ষ-তলে বসিলেন। তাঞ্জোর নগর এখনও বর্ত্তমান আছে। এবং তথায় একটী প্রকাণ্ড শিব-মন্দির আছে। মন্দিরের সম্মুখে এক বিশালকায় প্রস্তরময় বৃষ এখনও বর্ত্তমান আছে। বোধহয় চৈতন্যদেবের আগমন সময়েও এইরূপ ছিল। সেইজন্য চরিতামৃত এবং কড়চা উভয় পুস্তকেই ইহাকেই গো-সমাজ-শিব বলা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব অনুরাগের সহিত শিব দর্শন করিলেন। নিকটে চণ্ডাল নামে পর্ব্বতের গাত্রে বহুতর গোফা ছিল। তাহাতে অনেক সন্ন্যাসী তপস্যা করিতেন। চৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে গেলেন। সেখানে ভট্ট নামে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি হরিনামে নিত্য মত্ত থাকিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর প্রেমাবেশ দেখিয়া তাঁহার অনেক প্রশংসা করিলেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ লজ্জিত হইয়া বৈষ্ণবোচিত দীনতা প্রকাশ করিলেন। নিকটবর্ত্তী বনে অনেক সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁর নাম সুরেশ্বর। স্থানটী অতি মনোহর। চারিদিকে বড় বড় গাছ। ঝরণার জল একত্র হইয়া ক্ষুদ্র একটী নদী হইয়া কুলু কুলু স্বরে বহিয়া যাইতেছে। সন্ন্যাসীরা সেই স্থানে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতেন। গ্রাম্য লোকেরা আহার্য্য দিয়া যাইতেন। সন্ন্যাসীদিগকে আর কোথাও যাইতে হইত না। শ্রীচৈতন্যদেব সেই স্থানে কয়েক দিন থাকিয়া আনন্দে মত্ত হইয়া হরিগুণ গান করিলেন। সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে পাইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। তথা হইতে পদ্মকোট তীর্থে গমন করেন। সেখানে অষ্টভূজা ভগবতী দেবীর মন্দির ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব দেবী-মূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম করিয়া অনেক স্তুতি করিলেন। সন্ন্যাসীকে

দেখিবার জন্য বহুলোকের জনতা হইল। শ্রীচৈতন্যদেব একস্থানে বসিয়া তাহাদিগকে কিছু উপদেশ দিলেন। উপদেশের মর্ম্ম পূর্ব্বের অনুরূপ। এই মানবজীবন অনিত্য, জড়দেহ মৃত্যুর পরে পচিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে। স্ত্রী পুত্র কেহ কারও নয়। এসব মায়ার খেলা। যাহারা বিষয় বাসনায় লিপ্ত থাকে তাহাদিগকে বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

"তুমি কার কে তোমার কেবা আত্মপর।
মায়া বিটি খেলিতেছে যেন বাজিকর॥
যারা করে সংসারেতে বিষয়-বাসনা।
যাতায়াতে পাই তারা অনেক যাতনা॥
গর্ভের ভিতরে করে বিষ্ঠা মাঝে বাস।
মল মূত্র খাইয়া পুরায় অভিলাষ॥
জড় দেহে চিৎ বুদ্ধি যাহাদের হয়।
কেমনে উত্তীর্ণ হবে তাহারা নিরয়॥
যারা অবয়বে অবয়বী জ্ঞান করে।
চির বাস করে তারা নরক-ভিতরে॥
সংসার বিষম ফাঁদ না জানিয়া লোক।
সেই ফাঁদে পড়ি সবে পায় বহু শোক॥
আত্মার মরণ নাই মরে পাপ দেহ।
ভ্রমে মায়া-মুগ্ধ জীব দেহে করে স্নেহ॥" (কড়চা)

এ সেই ভারতের চির-প্রচলিত বৈরাগ্যের উপদেশ। ইহাতে কোন নূতনত্ব নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীতে এমন কিছু ছিল যাহাতে সকলে মুগ্ধ হইয়া গেল।

"এই উপদেশে সবে আশ্চর্য্য হইল।
অষ্টভূজা দেবী যেন কাঁপিতে লাগিল॥
চৈতন্য প্রভুর মুখে শুনি হরিধ্বনি।
চারিদিকে প্রতিধ্বনি হইল অমনি॥
বালক বালিকা যুবা ক্ষেপিয়া উঠিল।
অষ্টভূজা দেবী যেন দুলিতে লাগিল॥
পদ্মগন্ধ চারিদিকে লাগিল বহিতে।
সেইখানে পুষ্প-বৃষ্টি হইল আচম্বিতে॥
যতেক রমণী জন ফুল দেয় ফেলি।
ভক্তিভরে রমণীরা করে ফুলকেলি" ॥ (কড়চা)

এ সেইরূপই কথা যা বাইবেলে লিখিত আছে।—"For he taught them as one having authority". তিনি এমন ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন যেন সত্য দর্শন করিয়া বলিতেছেন।

এই স্থানে আর একটী ঘটনার বিবরণ আছে যাহা অতি কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা গোবিন্দ দাসের কড়চা হইতে তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করিতেছি।

"সেইখানে ছিল এক অন্ধ সাধুজন।
ভক্তিভরে ধরিলেক প্রভুর চরণ॥
প্রভু বলে ছাড় মোরে অহে সাধুবর।
অন্ধ বলে কৃপাকর জগৎ-ঈশ্বর॥
প্রভু বলে এইখানে জগৎ-ঈশ্বরী।
অন্ধ বলে দীন জনে দয়া কর হরি॥
দয়া কর মোরে তুমি প্রভু দয়াময়।
না দেখিয়া তব রূপ কাঁদিছে হৃদয়॥

আমি অন্ধ দুরাচার দেখিতে না পাই।
দেখাও আমারে রূপ চৈতন্য গোঁসাই॥
প্রভু বলে চর্ম্ম-চক্ষু নাহিক তোমার।
জ্ঞান-চক্ষে দেখ তুমি অন্তর সবার॥
অজ্ঞ লোক চক্ষু দিয়া করে দরশন।
জ্ঞানবান্ দেখে সব মুদিয়া নয়ন॥
সেই জ্ঞানবান্ তুমি অন্ধ মহাশয়।
অন্তরে দেখিছ সব মোর জ্ঞান হয়॥
অন্ধ বলে কেন ছল করুণা-নিধান।
অন্ধ বলি দয়া কর তুমি ভগবান্॥
বহুকাল আছি আমি মন্দিরে পড়িয়া।
স্বপ্নে ভগবতী মোরে দিয়েছে বুঝিয়া॥
তুমি সেই ভগবান্ অগতির গতি।
বলিলা একথা মোরে স্বপ্নে ভগবতী॥
দয়াময় তোমারে জানিব তবে আমি।
দেখাও যদ্যপি রূপ আঁধালারে তুমি॥
পর্ব্বত উপাড় পিপীড়ার পদ দিয়া।
পঙ্গু লঙ্ঘে হিমালয় তোমারে স্মরিয়া॥
অগস্ত্য শোষিলা সিন্ধু তোমার কৃপায়।
বিষপানে প্রহ্লাদের মৃত্যু নাহি হয়॥
বস্ত্ররূপে দ্রৌপদীর রাখিলে সম্মান।
অন্ধ বিল্বমঙ্গলের চক্ষু দিলা দান॥
অন্ধের শুনিয়া বাণী চৈতন্য গোঁসাই।
বলে অপরাধী মোরে কেন কর ভাই

সকল হৃদয়ে হরি করেন বসতি।
জিজ্ঞাসিয়া দেখহ বলিবে ভগবতী ॥
উচ্চারিলে যে কথা শুনিতে তাহা নাই।
মিছে কেন অপরাধী কর মোরে ভাই ॥
সামান্য মনুষ্য আমি অধম পামর।
ভ্রান্তি-কূপে পড়িয়াছে তোমার অন্তর ॥
অন্ধ বলে কথায় অধিক কাজ নাই।
দেখাও তোমার রূপ এই ভিক্ষা চাই ॥
কান্দিয়া আকুল অন্ধ প্রভুর লাগিয়া।
অন্ধের শিয়ড়ে প্রভু গেলেন চলিয়া ॥
অন্ধের ভকতি দেখি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ধীরে ধীরে প্রভু তার ধরিলেন কর ॥
বাহু পাশরিয়া গোরা অন্ধে আলিঙ্গিল।
প্রভুর পরশে অন্ধ শিহরি উঠিল ॥
বিদ্যুতের ন্যায় শীঘ্র নয়ন মেলিয়া।
কৃতার্থ হইল অন্ধ প্রভুরে দেখিয়া ॥
যেই দণ্ডে হেরিলেক মোর ধর্ম্মবীর।
অমনি পড়িয়া অন্ধ ত্যজিল শরীর ॥
হরিবোল বলি প্রভু অন্ধকে বেড়িয়া।
নাচিতে লাগিল প্রেমে উন্মত্ত হইয়া ॥
অন্ধের সমাধি সেই আঙ্গিনাতে দিয়া।
চলিলা গৌরাঙ্গ পদ্মকোট তেয়াগিয়া ॥" (কড়চা)

বিভিন্ন দেশে ধর্ম্মশাস্ত্রে অন্যান্য সাধু মহাপুরুষদিগের জীবনে এতদনুরূপ ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গোবিন্দ দাসের কড়চার এই

বিবরণে একটু বিশেষত্ব আছে। এখানে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার নাই, অথচ ঘটনাটী গভীর বিস্ময়োদ্দীপক এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সাধারণ বিশ্বসংসারে অন্ধ শ্রীচৈতান্যদেবকে মহাপুরুষ বা ঈশ্বরাবতার মনে করিয়া চক্ষু দানের জন্য ব্যাকুল হইয়া মিনতি করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব দৃঢ়তার সহিত অথচ কাতরে বলিতেছেন যে, তিনি ভ্রান্ত মানব, তাঁর সে শক্তি নাই। বাহিরের চর্ম্মচক্ষু অসার। অন্ধের যে তাহা নাই তাহাতে দুঃখ কি! তাহা অপেক্ষা মূল্যবান অন্তশ্চক্ষু তাঁহার আছে। অবশেষে মহাপ্রেমিক শ্রীচৈতন্যদেব করুণায় বিগলিত হইয়া অন্ধকে আলিঙ্গন করিলেন। সেই মুহূর্ত্তে অন্ধের জীবনলীলা শেষ হইল। সাধারণ লোকে মনে করিল যে, অন্ধ একমুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টিশক্তি পাইয়াছিল। জগতের ধর্ম্ম-সাহিত্যে ঠিক এইরূপ বিবরণ আর কোথাও পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে কড়চার প্রামাণিকতার নিঃসংশয়িত প্রমাণ দেখিতেছি। এখানে কল্পনার যথেষ্ট স্থান ছিল। কিন্তু এই গ্রন্থকারের রচনা কল্পনা-দোষে দূষিত হয় নাই। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে—ইহা চাক্ষুষ দৃষ্ট বিষয়ের বর্ণনা।

পন্নকোট হইতে শ্রীচৈতন্যদেব ত্রিপাত্র নগরে গমন করেন। সেখানে চণ্ডেশ্বর শিবের মন্দির ছিল। সেই মন্দিরে ববম্ শব্দ করিলে দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রতিধ্বনি হইত। মন্দির-প্রাঙ্গণে একটী প্রকাণ্ড বিল্ববৃক্ষ ছিল। লোকে তাহাকে সিদ্ধ বিল্ববৃক্ষ বলিত। সেই স্থানে অনেক উদাসীন শৈব বাস করিতেন। তাঁহাদের দলপতির নাম ভর্গদেব। তিনি সুপণ্ডিত এবং পরম ভক্ত, নিত্য ভক্তিভরে শিবের পূজা করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব মন্দিরে উপস্থিত হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন। ভর্গদেব এই অদ্ভুত সন্ন্যাসী দেখিয়া সন্ন্যাসিগণকে ডাকিয়া বলিলেন, শুনিয়াছি এক আশ্চর্য্য সন্ন্যাসী এই অঞ্চলে তীর্থদর্শনে

আসিয়াছেন। তিনি হরিনাম-সুধাদানে দেশ ভাসাইতেছেন। আবালবৃদ্ধবনিতাকে হরিনাম দিয়া মাতাইতেছেন। অনেক পাষণ্ডকেও তিনি হরিনামে উদ্ধার করিয়াছেন। ইনিই সেই সন্ন্যাসী হইবেন।

যেমন শুনেছি আজি দেখিলাম তাই।
আহা মরি কিবা রূপ কভু দেখি নাই॥
মানুষ না হয় এই সন্ন্যাসী-প্রবর।
ইহারে দেখিয়া কেন গলিল অন্তর॥
ঈশ্বরের অবতার হয় এই জন।
প্রণাম করহ সবে ধরিয়া চরণ॥
এই কথা বলি ভর্গ প্রণাম করিল।
দশনে রসনা কাটি প্রভু পিছাইল॥
প্রভু বলে ছিছি ভর্গ কি বলিলা তুমি।
নদীয়া নগরে হয় মোর জন্মভূমি॥
সামান্য মনুষ্য আমি এইত নিশ্চয়।
অবতার বলি কেন কর মিছে ভয়॥
ঈশ্বরের অবতার বলি বারে বারে।
অপরাধী কর কেন তোমরা আমারে॥
তীর্থ করিবারে আসিয়াছি তব ঠাঁই।
হরি বলি বাহু তুলে নাচ সবে ভাই॥ (কড়চা)

গোবিন্দ দাসের কড়চায় প্রকৃত সমসাময়িক বিবরণ পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে অনুরাগী ভক্তগণ চৈতন্যদেবের আশ্চর্য্য ধর্ম্ম-ভাব দেখিয়া তাঁহাকে অবতার জ্ঞানে স্তুতি করিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই তিনি দৃঢ়তার সহিত তার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমি

সাধারণ মানুষ, ধর্ম্মলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া ঘুরিতেছি। ভর্গদেব সাদরে শ্রীচৈতন্যদেবকে আতিথ্যগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন, তিনিও এক সপ্তাহ সেখানে থাকিয়া তাঁহাদের সঙ্গে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলেন। প্রতিদিন বহুসংখ্যক লোক আসিয়া জুটিতেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের মুখে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া ধন্য হইতেন। গোবিন্দ দাস শ্রীচৈতন্যদেবের এই সময়ের যে চিত্র দিয়াছেন তাহা উল্লেখ-যোগ্য।

"আমার প্রভুর কথা কি কহিব আর।
আশ্চর্য্য প্রভাব তাঁর বিচিত্র আকার॥
দিনান্তে সামান্য ভোজ্য খায় গোরা রায়।
না খাইয়া দেহ তাঁর ক্ষীণ যষ্টি প্রায়॥
অস্থি চর্ম্ম অবশিষ্ট হইয়াছে তাঁর।
তথাপি দেহের জ্যোতি অগ্নির আকার॥
মোহিত হয়েছে সবে অঙ্গের শোভায়।
বিনা যত্নে পদ্মগন্ধ সদাকাল পায়॥
যে জন তাঁহার প্রতি আঁখি মেলি চায়।
তেজের প্রভাবে চক্ষু ঝলসিয়া যায়॥" (কড়চা)

সাতদিন ত্রিপাত্রে থাকিয়া শ্রীচৈতন্যদেব আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইলেন। ভর্গদেব তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে হাতে ধরিয়া বিদায় করিলেন। পথে বহুসংখ্যক লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি সকলকে হরিনাম করিতে উপদেশ দিলেন। হরিনাম ভিন্ন মুখে অন্য কোন কথা নাই। বালকেরা তাঁহাকে ক্ষেপা হরিবোলা বলিত। তাঁহাকে দেখিলেই হরিবোল বলিয়া চীৎকার করিত। তিনি সেই কথা শুনিয়া হাততালি

দিয়া নৃত্য করিতেন। ক্রমে ক্রমে লোক সকল ফিরিয়া গেল। তৎপরে সম্মুখে একটী সুদীর্ঘ অরণ্য পড়িল। নির্জ্জনে বনের মধ্য দিয়া শ্রীচৈতন্যদেব নির্ভয়ে অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন, তাঁহার সঙ্গী পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। পথে বনের ফল খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিতেন এবং বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেন। তিন দিন পরে এক সন্ন্যাসী-দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হন। বন অতিক্রম করিয়া তাঁহারা রঙ্গ-ধামে পৌঁছিলেন। কড়চায় লিখিত আছে যে, বনপথ অতিক্রম করিতে এক পক্ষ লাগিয়াছিল এবং ইহার দূরত্ব পঞ্চাশ যোজন। দুর্গম বনপথ বলিয়া এবং ধীরে ধীরে আসার জন্য এক-পক্ষ লাগিয়া থাকিতে পারে, হয়ত সেইজন্য গোবিন্দ দাসের মনে হইয়া থাকিতে পারে বনপথ পঞ্চাশ যোজন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পথ অত দীর্ঘ হইতে পারে না। রঙ্গধাম বর্ত্তমান ত্রিচিনপল্লীর নিকটবর্ত্তী শ্রীরঙ্গপট্টম্ তাঞ্জোর হইতে ত্রিচিনপল্লী তিন মাইল মাত্র।

চৈতন্যচরিতামৃতে এসকলের কিছুই উল্লেখ নাই। কেবল অমৃতলিঙ্গ, কুম্ভকর্ণ, পাপনাশন প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের নাম মাত্র আছে। তন্মধ্যে কুম্ভকর্ণ বর্ত্তমান কুম্বাকোনাম্। চরিতামৃতে শৃঙ্গক্ষেত্রের অবস্থানের বিস্তৃত বিবরণ আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব কাবে-রীতে স্নান করিয়া রঙ্গনাথের মন্দিরের সম্মুখে নৃত্য ও গান করিতে-ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বেঙ্কট ভট্ট নামে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান এবং বহু সমাদরে আতিথ্য সৎকার করেন। তৎপরে তাঁহাকে বলিলেন যে, বর্ষা উপস্থিত। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার গৃহে চাতুর্ম্মাস্য করুন। তাঁহার অনুরোধে বেঙ্কট ভট্টের গৃহে চারিমাস সুখে অতিবাহিত করেন। প্রতিদিন কাবেরীতে স্নান

করিয়া শ্রীরঙ্গ দর্শন করিতেন এবং তাঁহার সম্মুখে প্রেমাবেগে নৃত্য করিতেন। নানাদেশ হইতে বহুসংখ্যক লোক শ্রীরঙ্গ দর্শন করিতে আসিত। তাহারা শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য ও প্রেমাবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া হরি হরি বলিত। চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হইলে বেঙ্কট ভট্টের নিকট বিদায় লইয়া শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ পথে অগ্রসর হইলেন।

গোবিন্দদাসের কড়চায় শ্রীরঙ্গধামে চারি মাস অবস্থানের কোন উল্লেখ নাই। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহাতে চরিতামৃতের এই বিবরণে সন্দেহ হয়। তাঁহার দীর্ঘ পথ ভ্রমণে আর কোথাও চাতুর্ম্মাস্য করিয়াছিলেন বলিয়া দেখা যায় না। তিনি যেরূপ ব্যগ্রতার সহিত তীর্থদর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন তাহাতে বর্ষার জন্য কোন এক স্থানে চারি মাস বসিয়া থাকিতেন তাহা মনে হয় না। আর এক কথা, শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পৌছিবার অনেক পূর্ব্বেই বর্ষারম্ভ এবং বোধ হয় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। বৈশাখ মাসের প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেব পুরী হইতে যাত্রা করেন। দুই মাসে শ্রীরঙ্গধামে পৌছান কোন ক্রমেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ পথে বিদ্যানগর প্রভৃতি স্থানে তিনি অনেক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণে সময়ের কোনই ধারণা নাই বলিয়া মনে হয়।

শ্রীরঙ্গধামে আর একটী ঘটনার কথা চরিতামৃত এবং করচা উভয় গ্রন্থেই আছে। সেখানে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। করচায় তাঁহার নামও দেওয়া হইয়াছে।

যুধিষ্ঠির নামে এক সাধক ব্রাহ্মণ।
বৈষ্ণবের চূড়ামণি সাধু আচরণ॥

এই ব্রাহ্মণ প্রতিদিন রঙ্গনাথের মন্দিরে বসিয়া অষ্টাদশাধ্যায় গীতি

আদ্যোপান্ত পাঠ করিতেন। পাঠকালে তাঁহার চক্ষু হইতে দর দর ধারে অশ্রু পড়িত, কিন্তু তিনি সংস্কৃত ভাল জানিতেন না। পড়িতে অনেক ভুল হইত, এইজন্য লোকে তাঁহাকে উপহাস করিত। ব্রাহ্মণ নিন্দা উপহাস অগ্রাহ্য করিয়া নিত্য আবিষ্ট-চিত্তে গীতা পাঠ করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব ব্রাহ্মণের ভাব দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং একদিন শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কিসে তাহার এমন ভাবোদয় হয়।

"মহাপ্রভু পুছিলা তারে শুন মহাশয়।
কোন অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥
বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয়ে রজ্জুধর।
বসিয়াছে হাতে তোত্র শ্যামল সুন্দর॥
অর্জ্জুনে কহিতে আছেন হিতোপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দাবেশ॥
যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাঞ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতা পাঠ না ছাড়ে মোর মন॥

(চৈঃ চঃ মঃ লীঃ, নবম পরি)

ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, তোমার গীতা পাঠ সার্থক। তুমিই গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়াছ, এই বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

শ্রীরঙ্গধামে চৈতন্যদেব শুনিলেন, ঋষভ পর্ব্বতে পরমানন্দ পুরী বাস করেন। এই সংবাদে তিনি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ঋষভ পর্ব্বতে গমন করিলেন। এবং তাঁহার সঙ্গে তথায় তিন দিন ধর্ম্মপ্রসঙ্গে

অতিবাহিত করিলেন। পুরী গোঁসাই বলিলেন যে, তিনি পুরুষোত্তম যাইবেন এবং তথা হইতে গঙ্গাস্নানের জন্য গৌড়ে যাইবেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, আপনি নীলাচলে যান; আমি সেতুবন্ধ হইতে অল্পকালে ফিরিয়া আসিব। আপনার নিকটে থাকিতে বড় ইচ্ছা। অনুগ্রহ করিয়া নীলাচলে দর্শন দিবেন। উত্তরকালে নীলাচলে পরমানন্দ পুরী নামে চৈতন্যদেবের একজন নিত্যসঙ্গী ছিলেন। সম্ভবতঃ ইনিই সেই পরমানন্দ পুরী।

তথা হইতে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশৈল ও কামকোষ্ঠী হইয়া দক্ষিণ মথুরায় আগমন করেন। দক্ষিণ মথুরা বর্ত্তমান মাদুরা। সেখানে একজন রামভক্ত ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসেন। মধ্যাহ্ন হইয়া গেল। মহাপ্রভু স্নান করিয়া আসিলেন। কিন্তু পাকের কোন আয়োজন দেখিলেন না। তাহাতে বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি এখন বনে বাস করিতেছি। এখানে পাকের সামগ্রী মিলে না। লক্ষ্মণ বন্য ফল, শাক আনিতে গিয়াছেন; তিনি আসিলে সীতা পাক করিবেন। চৈতন্যদেব বুঝিলেন, ব্রাহ্মণ রামভাবে মগ্ন হইয়া আছেন। ক্রমে বেলা তৃতীয় প্রহরে ব্রাহ্মণ কিছু রন্ধন করিয়া অতিথি-সৎকার করিলেন, কিন্তু নিজে কিছু আহার করিলেন না। চৈতন্যদেব তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেন উপবাস করিতেছেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমার আর এই জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করে না। অগ্নি বা জলে প্রবেশ করিয়া মরিতে ইচ্ছা করে। জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণীকে রাক্ষসে স্পর্শ করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া কি আর জীবনরক্ষা করা যায়? এই দুঃখে, নিরন্তর আমার প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণকে প্রবোধ দিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব

বলিলেন, তোমার মহাভ্রম হইয়াছে। ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতাদেবী চিদানন্দমূর্ত্তি। স্পর্শ করা দূরে থাকুক অন্যে তাঁহার দর্শনও পায় না। রাবণ আসিলে সীতা দেবী অন্তর্হিত হন এবং তৎস্থানে মায়াসীতা রাখিয়া যান। রাবণ সেই মায়াসীতা হরণ করে মাত্র। তাঁহার কথায় আশ্বস্ত হইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করিলেন। এখান হইতে চৈতন্যচরিতামৃত মতে শ্রীচৈতন্যদেব দুর্ব্বেশন যান। এই সকল স্থান কোথায় ঠিক জানা যায় না। কড়চায় এইসকল স্থানের উল্লেখ নাই। কড়চানুসারে ঋষভ পর্ব্বত হইতে শ্রীচৈতন্যদেব রামনাথ যান এবং তথা হইতে রামেশ্বর গমন করেন। বাস্তবিকই মাদুরা হইতে রামেশ্বরের পথে বর্ত্তমান রামনাথ পড়ে। চৈতন্যচরিতামৃতকার রামেশ্বরের পূর্ব্বে মহেন্দ্রশৈল তীর্থে গমন করিয়া পরশুরাম দর্শনের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহা ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়। কারণ মহেন্দ্র পর্ব্বত রামেশ্বর হইতে বহু উত্তরে।

অতঃপর শ্রীচৈতন্যদেব সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বহু পণ্ডিত ও সাধুর বাস; তাঁহারা একে একে শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখিতে আসিলেন। তন্মধ্যে একজন উদাসী পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যদেবকে বিচারের জন্য আহ্বান করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, আমি বিচার করিতে চাই না, আপনার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেছি। পণ্ডিত তাঁহার বিনয় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তখন বলিলেন বৃথাতর্কে কোন লাভ নাই। তাহাতে অহঙ্কার বৃদ্ধি হয় এবং নরকের পথ প্রশস্ত হয়। বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যদি বিনয় না আসে, প্রবৃত্তি সকল শাসিত না হয়, তবে তাহাতে কি ফল। পড়িয়া শুনিয়া যাঁর কৃষ্ণ নামে রুচি হয় না, সে মূর্খ এবং সর্ব্বদাই অশুচি। হরিনামে যাহার

হৃদয় গলে সেই প্রকৃত পণ্ডিত। এই কথা বলিতে বলিতে দুই হাত তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীগণ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অমৃতময় বাণী শুনিতেছিলেন। চৈতন্যদেব আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন। পাথরে তাঁহার থুত্‌নি কাটিয়া দর দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। তখন সেই বিচারাকাঙ্ক্ষী পণ্ডিত যত্নে রক্তধারা মুছিয়া দিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত মতে রামেশ্বরে বহু ব্রাহ্মণের বাস ছিল এবং শ্রীচৈতন্যদেব সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করেন। ব্রাহ্মণগণের সভায় কূর্ম্মপুরাণ পাঠ শ্রবণ করেন এবং তন্মধ্যে রাবণ কর্ত্তৃক মায়া সীতা হরণের বিবরণ শ্রবণ করিয়া দক্ষিণ মথুরা নিবাসী রামভক্ত ব্রাহ্মণের জন্য সেই পুস্তক সংগ্রহ করেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন কালে ব্রাহ্মণকে তাহা প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ তাহা পাইয়া অতিশয় কৃতজ্ঞ হইয়া বলিলেন, আপনি আমাকে মহাদুঃখ হইতে নিস্তার করিলেন। আজ আমার গৃহে থাকিয়া ভিক্ষা অঙ্গীকার করুন। যাইবার সময় মনোদুঃখে আমি ভাল করিয়া আপনাকে খাওয়াইতে পারি নাই। এই বলিয়া মহানন্দে পাক করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে উত্তমরূপে খাওয়াইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব সে রাত্রি ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করিয়া পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণ গেলেন, চৈতন্য চরিতামৃতে এইরূপ লিখিত আছে। কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক, কেন না তাম্রপর্ণী অনেক দক্ষিণে, সেখানে যাইতে হইলে রামেশ্বর হইতে সোজা পথ। বস্তুতঃ চৈতন্যচরিতামৃতের এই অংশের বিবরণ অতি অস্পষ্ট। গ্রন্থকার কেবলমাত্র কতকগুলি স্থানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারও মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নাই। যাহা হউক তাঁহার বিবরণ যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"সেই রাত্রি তাঁহা রহি তারে কৃপাকরি।
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী গেলা গৌরহরি॥

তাম্রপর্ণী স্নান করি তাম্রপর্ণী তীরে।
নয়ত্রিপদী দেখি বুলে কুতুহলে ॥
চিয়ড়তালা তীর্থে দেখি শ্রীরামলক্ষ্মণ।
তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন ॥
"গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্ত্তি।
পানা গাড়ি তীর্থে আসি দেখে সীতাপতি ॥
চামতাপুরে আসি দেখি শ্রীরামলক্ষ্মণ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন ॥
মলয়-পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য বন্দন।
কন্যা-কুমারী তাঁহা কৈল দরশন ॥"

(চৈ, চ, ম, লী, নবম পরি)

এখানে চৈতন্যচরিতামৃতের ভুল স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। কোথায় বা মলয়পর্ব্বত আর কোথায় বা কন্যাকুমারী। কন্যাকুমারী ভারতের সর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে। মলয়পর্ব্বত তাহার বহু উত্তরে। গোবিন্দদাসের কড়চার বিবরণ সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। কড়চানুসারে শ্রীচৈতন্যদেব সেতুবন্ধে তিন দিন থাকিয়া বামপথ ধরিয়া মাধ্বীবনে গমন করেন। মাধ্বীবনে এক মৌনব্রতধারী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার শ্বেত শ্মশ্রু বক্ষস্থল আবরণ করিয়াছিল, বড় বড় নখ উল্টাইয়া পড়িয়াছিল। উলঙ্গ হইয়া বসিয়াছিলেন। নিকটে বস্ত্র কমুণ্ডলী কিছুই ছিল না। বৃক্ষতল গৃহ, আকাশ বসন। শ্রীচৈতন্যদেব আসিয়া জোড়হস্তে তাঁর সম্মুখে দাঁড়াইলেন, দেখিলেন তিনি স্থিরভাবে বসিয়া আছেন, নয়ন মুদ্রিত। চৈতন্যদেব অনেক বিনয়, স্তুতি করিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসি চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন না। উদাসীন সন্ন্যাসিগণ তিন দিন অন্তর তাঁহার আহারের জন্য ফলমূল আনিয়া দিতেন। তিন দিন পরে

আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। যথাসময়ে আহারের জন্য যখন তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গে কথা বলিলেন। যোগীবর তাঁহার কথা বুঝিতে পারিলেন না। তখন চৈতন্যদেব সংস্কৃত-ভাষায় কথা বলিলেন। যোগী স্থিরভাবে তাহা শুনিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গে দুই চারিটী কথা বলিলেন। তৎপরে 'চাম্বনী শিঙড়ী' বলিয়া হাসিয়া অতি শুদ্ধমনে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে প্রণাম করিলেন। এই চাম্বনী শিঙড়ীর অর্থ কিছু বুঝা যায় না। হইতে পারে যে, গোবিন্দদাস কথাটি ঠিক বুঝিতে পারেন না। চৈতন্যদেবও তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিয়া আনন্দে কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিলেন। মৌনী সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিতে দেখিয়া সকল সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের চরণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন।

মাধ্বী বনে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সাতদিন ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া নিকটবর্ত্তী তত্ত্বকুণ্ডী নামক তীর্থে স্নান করিতে গেলেন এবং তথা হইতে তাম্রপর্ণী নদী তীরে গমন করিলেন। তখন মাঘী পূর্ণিমা সন্নিকট। মাঘী পূর্ণিমায় বহুলোক তাম্রপর্ণীতে স্নান করিতে আসে। শ্রীচৈতন্যদেব এখানে এক পক্ষ অপেক্ষা করিয়া মাঘী পূর্ণিমার দিন তাম্রপর্ণীতে স্নান করিলেন। গোবিন্দদাসের কড়চার এই বিবরণে স্থান ও কালের যথাযথ নির্দ্দেশ হইতেছে। রামেশ্বর হইতে অনতিদূরে কন্যাকুমারী ও রামেশ্বরের মধ্যে তাম্রপর্ণী নদী প্রবাহিত। গোবিন্দদাসও ঠিক সেইরূপ লিখিয়াছেন। মাঘী পূর্ণিমার দিন শ্রীচৈতন্যদেব তাম্রপর্ণী নদীতীরে ছিলেন। বৈশাখ মাসের প্রথমে তিনি পুরী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। তাহা হইলে প্রায় নয় মাসে তিনি তাম্রপর্ণী আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। ইহা যুক্তি যুক্ত মনে হয়। তাম্রপর্ণী পার হইয়া শ্রীচৈতন্যদেব সমুদ্রের কন্যাকুমারী দেখিতে চলিলেন। গোবিন্দদাস

কন্যাকুমারীর যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অতি সরল অথচ সুসঙ্গত।

"পর্ব্বত কাননদেশ নাহি সেই ঠাঁই।
কেবল সিন্ধুর শব্দ শুনিবারে পাই॥
বড় বড় তরঙ্গ আসিয়া সেই খানে।
ঈশ্বরের গুণগান করিছে সজ্ঞানে॥
সেভাব দেখিলে চিত্ত হয় আনন্দিত।
ভাবের উদয়ে দেহ হইল পুলকিত॥
পর্ব্বত সমান বালি হয়ে স্তুপাকার।
ঈশ্বরের গুণ যেন করিছে বিস্তার॥
হুঁ হুঁ শব্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরন্তর—।
কি কব অধিক সেথা সকলই সুন্দর॥
"দেখিবারে কিছু নাই তথাপি শোভন।
সেখানে সৌন্দর্য্য দেখে যার শুদ্ধ মন।" (কড়চা)

সমুদ্র দর্শনে শ্রীচৈতন্যদেব হৃষ্ট হইলেন এবং উল্লাসে স্নান করিতে উদ্যত হইলেন। সম্ভবতঃ গোবিন্দদাস উত্তালতরঙ্গ দেখিয়া কিছু ভীত হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে স্নান করিতে ডাকিলেন।

"গোবিন্দ বলিয়া প্রভু মোরে ডাক দিয়া।
স্নান করিবারে বলে ঈষৎ হাসিয়া॥
বেগে আসে পিছে ঢেউ পর্ব্বত সমান।
ভক্তিভাবে সেইখানে করিলাম স্নান॥
স্নানকরি প্রভুমোর কাঁদি হরি বলি।
হৃদয়ের প্রেম যেন পড়িল উথলি॥

লোমাঞ্চিত কলেবর কপাল ঘামিল।
সেই শীর্ণ দেহ তাঁর পুলকে পূরিল॥" (কড়চা)

কন্যা কুমারীতে সমুদ্র স্নান করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব গোবিন্দদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন এখন কোন্ দিকে যাইবে? গোবিন্দদাস উত্তর করিলেন প্রভু যেদিকে যাইবেন, এ দাস সেবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকেই যাইবেন। সম্ভবতঃ তাঁহার ভয় হইয়াছিল যে, গোবিন্দদাস শ্রান্ত ও অপরিচিত দেশ ভ্রমণে অনিচ্ছুক হইয়া থাকিবে। গোবিন্দদাসের উত্তরে আশ্বস্ত হইয়া পশ্চিম উপকূল দিয়া নূতন পথে চলিলেন। সেই সময়ে একদল সন্ন্যাসীও কন্যাকুমারীতে স্নান করিয়া ফিরিয়া যাইতেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। পঞ্চদশ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা পর্ব্বত সাঁতালে (সম্ভবতঃ পর্ব্বত সমতল বা অধিত্যকা) উপস্থিত হইলেন। সেইখানে সন্ন্যাসীরা অবস্থিতি করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব একটী বৃক্ষতলে গিয়া বসিলেন। স্থানটী নির্জ্জন, নিকটে লোকালয় নাই। গোবিন্দ দাসের চিন্তা হইল আহারের কি ব্যবস্থা হইবে।

"কি ভিক্ষা করিব কোথা ভাবিয়া না পাই॥
অন্তরের ভাব বুঝি ঈষৎ হাসিয়া।
বলে প্রভু ভাব তুমি কিসের লাগিয়া॥
হরিনাম সুধাপানে রজনী কাটাব।
প্রভাতে উঠিয়া যথা ইচ্ছা চলি যাব॥
ইহা বলি গোরাচাঁদ নয়ন মুদিয়া—,
স্থির ভাবে বসিলেন বৃক্ষে ঠেস দিয়া॥" (কড়চা)

সন্ন্যাসিগণ খঞ্জনি বাজাইয়া মধুর সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন এমন

সময়ে কোথা হইতে একজন বণিক আসিয়া সকলকে আহার্য্য দিয়া গেলেন।

"গোটা গোটা ফল মূল দুগ্ধ আর চিনি।
ভক্তি করে সকলেরে ভিক্ষা দেন তিনি॥"

গোবিন্দ দাস এইসব খাদ্য দ্রব্য পাইয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও চিনি মাত্র ভক্ষণ করিলেন। রাত্রি প্রভাতে সন্ন্যাসীর দল পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া ত্রিবঙ্কু দেশে গমন করিলেন। শ্রীচৈতন্য দেবও সেই সঙ্গে চলিলেন। গোবিন্দ দাস তৎকালীন ত্রিবাঙ্কুরের যে চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অতি হৃদয়-গ্রাহী।

"ত্রিবাঙ্ক দেশের রাজা বড় পুণ্যবান।
পালন করেন প্রজা পুত্রের সমান॥
নগরের লোক সব অতিথি কুশল।
অতিথি লইয়া সবে করে কোলাহল॥
অতিথি লইয়া সবে টানাটানি করে।
অতিথির সেবা করে বড়ই আদরে॥
এথাকার রাজা তার নাম রুদ্রপতি।
কাঙ্গালের মাতা পিতা অগতির গতি॥
রাজার রাজ্যে প্রজা বড় সুখী হয়।
রাজার লাগিয়া সবে ব্যাকুল হৃদয়॥
কত হাতী ঘোড়া বাঁধা রাজার দুয়ারে।
অন্নের অভাব নাই তাঁহার ভাণ্ডারে॥
নগরের তিন স্থানে অন্নছত্র হয়।
অতিথি পথিক আসি সেই ছত্রে রয়॥

যার যত দিন ইচ্ছা রহে সেইখানে।
ধন্য ধন্য রাজা বলি সকলে বাখানে॥ (কড়চা]

সন্ধ্যাকালে তাঁহারা ত্রিবঙ্ক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য দেব হৃষ্টচিত্তে একটি বৃক্ষতলে বসিলেন এবং সারা রাত্রি সেখানে অতিবাহিত করিলেন। একজন গ্রাম্য লোক কিছু চুনা [সম্ভবতঃ চানা বা ছোলা] আনিয়া দিয়াছিল। সেদিনকার মত তাহাতেই আহার কার্য্য সম্পন্ন হইল। পরদিন নগরে প্রচারিত হইল যে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। এই সংবাদে নগরের লোকেরা ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া জোড়হস্তে নিকটে দাড়াইয়া রহিল। শ্রীচৈতন্যদেব নয়ন মুদ্রিত করিয়া হরিনাম করিতেছেন, নয়ন-কোণ বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে। নিস্পন্দদেহে পুলক ও লোমাঞ্চ হইয়াছে। লোকে ইহা দেখিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে আপন গৃহে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল, কেহ ফল মূল আনিয়া দিল,কিন্তু চৈতন্য-দেব চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন না। ইতিমধ্যে একজন বৃদ্ধ আসিয়া বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে বলিতে লাগিল, কোথায় সন্ন্যাসী আমাকে একবার দেখাও। সম্ভবতঃ অন্ধতার জন্য বৃদ্ধ তাঁহাকে দেখিতে পাইতে-ছিল না। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার কথা শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার নিকট গেলেন। এইসব কথা নগরে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাকে দেখিবার জন্য অনেক জ্ঞানী পণ্ডিতও আসিলেন। একজন অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত আসিয়া তাঁহাকে অদ্বৈতবাদ তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। শ্রীচৈতন্য দেব তদুত্তরে তাঁহাকে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিলেন, কিন্তু সেই মায়াবাদীর নিকটে ভক্তি তত্ত্বের স্ফুরণ হইল না। ক্রমে দেশের রাজার নিকটেও এই নূতন সন্ন্যাসীর আগমনের

সংবাদ পৌছিল। তিনি বহু আগ্রহ করিয়া সন্ন্যাসীকে রাজ-প্রাসাদে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব সে-প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

"প্রভু বলে সেথা মোর নাহি প্রয়োজন।
বিষয়ীর কাছে আমি না করি গমন॥
রাজ দূত বলে শুন সন্ন্যাসী ঠাকুর।
কেন নাহি যাবে, পাবে সম্পত্তি প্রচুর॥
বস্ত্র অলঙ্কার আদি যাহা তুমি চাবে।
তথা তুমি অনায়াসে সেই ধন পাবে॥"

রাজদূতের কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, আমার ধনে কোন প্রয়োজন নাই। যারা বিষয়ের কীট আমি তাহাদেরে সংশ্রবে যাই না। বিষয়ের কীটেরাই ধনের আকাজ্ক্ষা করে, কিন্তু আমার বিশ্বাস ধন অনর্থের মূল। যারা ধনমদে মত্ত তাহারা প্রকৃত তত্ত্ব ভুলিয়া সর্ব্বদা বিষয়-নরকে ডুবিয়া থাকে। শরীর অনিত্য ইহা না জানিয়া ধনী ধনে জীবনের সার্থকতা মনে করে। সন্ন্যাসীর এই কথা শুনিয়া দূত ক্রুদ্ধ হইয়া ইহার প্রতিশোধ দিবার জন্য রাজার নিকট ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু ধার্ম্মিক রাজা রুদ্রপতি দূতের কথায় ক্রুদ্ধ হইলেন না, অধিকন্তু সন্ন্যাসীর নির্ভীক সত্য কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য অধিকতর উৎসুক হইলেন।

"গোটা গোটা বাত শুনি দূতের বদনে।
সন্ন্যাসী দেখিতে ইচ্ছা করিলা আপনে॥" (কড়চা)

তিনি ভক্তিযুক্ত হইয়া শীঘ্র বহির্গত হইলেন এবং দূরে হস্তী, অশ্ব রাখিয়া কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে দীনবেশে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং জোড়হস্তে বার বার বলিতে লাগিলেন, আমি

না বুঝিয়া আপনাকে ডাকিয়া ছিলাম, আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দেন। রাজা রুদ্রপতি বড়ই পণ্ডিত এবং ভাগবতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই চারিজন পণ্ডিতও আসিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, আপনি বড় ভাগ্যবান নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং বড় জ্ঞানী। আপনি ভাগবত জানেন, আপনাকে আর আমি কি বলিব। আমি রাধাকৃষ্ণ বিনা আর কিছুই জানি না। কৃষ্ণের নাম লইতে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম জাগিয়া উঠিল। দর দর ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল। তিনি উঠিয়া প্রেমে মত্ত হইয়া নাচিতে লাগিলেন এবং নাচিতে নাচিতে অজ্ঞান হইয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন। রাজা তাঁহাকে বাহু প্রসারিত করিয়া ধরিলেন। সেইসঙ্গে রাজার হৃদয়ে ভক্তি জাগিল। নয়নের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া গেল। অঙ্গে পুলকও রোমাঞ্চ দেখা দিল। ধূলায় তাঁহার অঙ্গ ধূসরিত হইল।

"দেখিয়া রাজার ভক্তি আমার নিমাই।
কোল দিয়া রাজারে বলেন এস ভাই॥
হরি নামে যার চক্ষে বহে অশ্রু ধারা।
সেইজন হয় মোর নয়নের তারা॥" (কড়চা)

ক্ষণকাল পরে রাজাকে বিদায় দিয়া চৈতন্যদেব স্নান করিতে গেলেন। রাজাও তাঁহার সেবার জন্য লোকজন রাখিয়া রাজধানী ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহার আহারের জন্য বহু ফল মূল প্রেরণ করিলেন। ক্রমে বহু লোকের জনতা হইতে লাগিল। লোকে যার যাহা ইচ্ছা ফলমূলাদি আনিয়া দিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যদেব কোন কথাই বলেন না। সর্ব্বশুদ্ধ তিনি এক পক্ষ ত্রিবাঙ্কুরে ছিলেন। এই দেশের স্বাভাবিক শোভা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।

"পর্ব্বতে বেষ্টিত দেশ দেখিতে সুন্দর।
ঝরনার জল চলে অতি মনোহর॥
বড় বড় নিম্ব বৃক্ষ চারিদিকে হয়।
আশ্চর্য্য তাহার শোভা কহনে না যায়॥"

এইখানে রামগিরী নামে এক পর্ব্বত আছে। লোকমুখে শুনিলেন যে, শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কার যুদ্ধের পর সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এখানে আসিয়া তিন দিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন এই কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্যদেব সেই পর্ব্বতোপরি উঠিলেন। এবং যেস্থানে রামচন্দ্র বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ ভক্তি ভরে সেই স্থানে প্রণাম করিলেন।

চৈতন্য চরিতামৃতে এসকলের কোনই উল্লেখ নাই। তৎপরিবর্ত্তে কয়েকটী স্থানের নাম উল্লেখ আছে সেগুলি কোথায়—তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। চৈতন্যচরিতামৃতের মতে কন্যাকুমারীর পরে তিনি যে সকল স্থানে যান তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমলী তলাতে রাম দেখে গৌরহরি।
মল্লার দেশেতে আইলা যেথা ভট্টমারি॥
কমাল কার্ত্তিক দেখি আইলা বিটাপাণী
রঘুনাথ দেখি তাঁহা বঞ্চিলা রজনী॥"

(চৈঃ চ, মধ্যী নবম পরি)

এখানে এক অনর্থের উল্লেখ আছে। চৈতন্যচরিতামৃত মতে কৃষ্ণদাস নামে এক সরল ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভট্টমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে সে তাহাকে স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রলোভন দেখায়। কৃষ্ণদাস সেই প্রলোভনে চৈতন্যদেবের সঙ্গ ছাড়িয়া ভট্টমারীদের সঙ্গে মিলিত হন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রাতে কৃষ্ণদাসকে না দেখিয়া তাহার অন্বেষণে ভট্টমারীদের নিকটে পরদিন উপস্থিত হইলেন।

"প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারী ঘরে।
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে॥
আসিয়া কহেন সব ভট্টমারীগণে।
আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে॥
আমিহ সন্ন্যাসী দেখ তুমিহ সন্ন্যাসী।
মোরে দুঃখ দেহ তোমার ন্যায় নাহি বাসী॥
শুনি সব ভট্টমারী উঠে অস্ত্র লঞা।
মারিবারে আইসে সব চারিদিকে ধাঞা॥
তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে।
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারি পলায় চারিভিতে॥
ভট্টমারী ঘরে মহা উঠিল ক্রন্দন।
কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন॥
(চৈঃ চঃ মঃ লীঃ নবম পরিঃ)

এই বৃত্তান্ত শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রও ব্যবহারের অনুরূপ বলিয়া মনে হয় না। চরিতামৃত অনুসারে অতঃপর তিনি পয়োস্বিনী তীরে গমন করেন। এখানে চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব এখানে ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তিনি সেই পুস্তকের বহু সুখ্যাতি করিয়াছেন।

"সিদ্ধান্ত শাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতা সমান।
গোবিন্দ মহিমা জ্ঞানের পরম কারণ॥
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্র মধ্যে অতি সার॥
(চৈঃ, চঃ, মঃ, লীঃ, নবম পরিঃ)

চৈতন্যদেব বহু যত্নে সেই পুস্তক নকল করিয়া লইলেন। তথা হইতে অনন্ত পদ্মনাভ স্থানে আসিলেন। সেখানে দিন দুই থাকিয়া শ্রীজনার্দ্দন দেখিতে আসিলেন। গোবিন্দদাসের কড়চায় এই সকল স্থানের উল্লেখ নাই। কড়চানুসারে শ্রীচৈতন্যদেব ত্রিবাঙ্কুর হইতে পয়োষ্ণী আসেন এবং পয়োষ্ণী হইতে সিংহারী মঠে গমন করেন। ইহা শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদিগণের প্রসিদ্ধ ও প্রধান মঠ। বর্ত্তমান সময়ে শৃঙ্গারী মঠ নামে পরিচিত। সেখানে বহু শঙ্কর শিষ্যের বাস। তাঁহারা একত্র হইয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গে বিচার করেন এবং বিচারে পরাজয় স্বীকার করেন। সিংহারি মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যদেব মৎস্যতীর্থে গমন করেন। চরিতামৃতেও এই তিনস্থান গমনেরউল্লেখ আছে, কিন্তু কোন বিশেষ বিবরণ নাই। চৈতন্যচরিতামৃতানুসারে শ্রীচৈতন্যদেব সিংহারী মঠ হইতে মধ্বাচার্য্য স্থানে গমন করেন এবং যেখানে উড়ুপ কৃষ্ণ দেখিয়া নিত্য করেন। মধ্বাচার্য্যের মঠ এখনও বর্ত্তমান আছে। মান্দ্রাজ প্রদেশের উত্তরতম জেলায় উড়ুপী নগরে ইহা অবস্থিত। সিংহারী হইতে ইহা অনেক দূর অথচ পথের কোন বিবরণ নাই। এখানে মঠের আচার্য্যের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার হয় এবং বিচারে শ্রীচৈতন্যদেব জয়ী হন। মধ্বাচার্য্যের শিষ্যেরা ভক্তিপথাবলম্বী বৈষ্ণব; সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ মতভেদ হওয়ার কথা নয়। মাধ্বমঠাধ্যক্ষ জ্ঞান, কর্ম্ম, মুক্তির, কথা বলিয়া ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার বিরুদ্ধে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন। মঠাধ্যক্ষ তাহা স্বীকার করিলেন। গোবিন্দদাসের কড়চায় শ্রীচৈতন্যদেব মধ্বাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত মঠে যাওয়ার উল্লেখ নাই। কড়চানুসারে শ্রীচৈতন্যদেব মৎস্য দেশ হইতে কাচাড়ে গমন করেন তথায় ভগবতী দর্শন করিয়া কৃষ্ণানদীর শাখা ভদ্রা নদীতে

স্নান করেন এবং তথা হইতে নাগপঞ্চপুরী গমন করেন। এখানকার লোকেরা রামভক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে তিন রাত্রি বাস করিয়া পার্ব্বত্য পথে চিতোল যান এবং তথা হইতে তুঙ্গভদ্রাতীরে উপস্থিত হন ও তৎপরে কাবেরীর উৎপত্তি স্থান কোটী গিরি যান। এখান হইতে সত্যগিরি পর্ব্বত দেখা যায়। সত্যগিরি বামে রাখিয়া তাঁহারা চণ্ডপুর নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে একজন বিরক্ত সন্ন্যাসী আছেন শুনিয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত, নাম ঈশ্বর ভারতী। অল্প আলাপেই শ্রীচৈতন্যদেব বুঝিতে পারিলেন তিনি বড়ই অহঙ্কারী। সুতরাং তিনি তাঁহার সঙ্গে আর বাক্যালাপ করিলেন না। সন্ন্যাসী তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বড় তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং আরও তিনজন সন্ন্যাসী লইয়া আসিয়া তাঁহাকে বিচারের জন্য আহ্বান করিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহার অভ্যস্ত প্রথানুসারে বলিলেন, আমি বিচার জানি না, স্বীকার করিতেছি তুমি জ্ঞানী যদি চাহ আমি জয়পত্র লিখিয়া দিতেছি। ইহাতে সন্ন্যাসী নিরস্ত হইতে বাধ্য হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব চক্ষু নিমীলিত করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অল্পক্ষণে ভাবে মত্ত হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণ বলিয়া ডাক দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, সম্মুখে এক তমালের গাছ দেখিয়া কৃষ্ণ বলিয়া জড়াইয়া ধরিলেন। চৈতন্যদেবের এই ভাবে সন্ন্যাসীর হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

"এই ভাব দেখি যোগী আপন নয়নে।
জড়ায়ে ধরে তবে প্রভুর চরণে॥
যোগী বলে বিচার না করিবারে মাগি।
উৎকণ্ঠা বাড়িছে মোর এবে কৃষ্ণ লাগি॥" (কড়চা)

ক্রমে যোগী চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত হইলেন। তাঁহাকে কৃষ্ণদাস নাম

দিয়া ভক্তির সহিত কৃষ্ণ উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়া শ্রীচৈতন্যদেব চণ্ডপুর পরিত্যাগ করিলেন। তৎপর দুই দিন দুই রাত্রি তাঁহারা পর্ব্বত পথে চলিলেন ইহার মধ্যে আর কোন লোকালয় দেখিতে পাইলেন না, কেবল চারিদিকে কদম্ববৃক্ষ। তাহা দেখিয়া "মোর কৃষ্ণ কেলি করে এই বৃক্ষতলে" বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন এবং কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হইয়া ঢুলিতে ঢুলিতে চলিতে লাগিলেন। একস্থানে পথ পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র জলাশয়ে একটী ব্যাঘ্র জলপান করিতেছিল; সঙ্গী গোবিন্দদাস তাহা দেখিয়া বড়ই ভীত হইল"

"প্রভু পার্শ্বে গুড়ি গুড়ি যাই সাবধানে॥
চলিল ডাহিনে গোরা ব্যাঘ্র রাখি বামে।
আবেশে অবশ অঙ্গ মত্ত হরি নামে॥
ফিরে না চাহিল ব্যাঘ্র মোদিগের প্রতি।
পিছনে তাকাই আর চলি দ্রুতগতি॥
মোর ভাব গতি দেখে ঈষৎ হাসিয়া—।
বলে প্রভু ভয় কর কিসের লাগিয়া
হরি নাম বলে নাহি রহে যমভয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাক না কর সংশয়॥" (কড়চা)

দুই দিন পরে তাঁহারা এক ক্ষুদ্র পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। গ্রামবাসীগণ বড়ই দরিদ্র। দুই দিন অনাহারে চলিয়া শ্রীচৈন্য দেব শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য বসিলেন। তাঁহার সঙ্গী ভিক্ষার জন্য গ্রামের ভিতর গিয়া এক ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইকেন। ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করেন। গৃহে কিছু ছিলনা অতিথিকে বলিলেন ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি ভিক্ষা করিয়া

আনিয়া আপনাকে ভিক্ষা দিতেছি এই বলিয়া বিপ্র বাহির হইলেন এবং অল্পক্ষণ পরে দুইটী নারিকেল আনিয়া গোবিন্দ দাসকে দিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সঙ্গী পরম তৃপ্তির সঙ্গে সেই নারিকেল ভক্ষণ করিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন। গোবিন্দদাসের মুখে ব্রাহ্মণের আতিথেয়তার কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্যদেব সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। ব্রাহ্মণের গৃহে গোপালের সেবা ছিল। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ভিক্ষা করিয়া গোপালের সেবা চালাইতেন। গৃহে আগন্তুক সন্ন্যাসী দেখিয়া তাঁহারা ত্রস্তেব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অতিথি-সৎকারের কোন ব্যবস্থা নাই বলিয়া ত্রুটী মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদের আশ্বাস দিয়া এক প্রান্তে বসিয়া ভক্তিভরে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। গ্রামবাসিগণ সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে আসিল এবং গান শুনিয়া প্রেমে মত্ত হইয়া উঠিল। এইরূপে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে উঠিয়া ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় লইয়া তাঁহারা অগ্রসর হইলেন কাণ্ডার দেশে নীলগিরি পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইলেন; সেখানে ক্ষুদ্র একটী নদী বহিতেছিল। শ্রীচৈতন্যদেব নদীতীরে একটী বৃক্ষের নিম্নে বসিলেন এবং সঙ্গীকে বলিলেন,—আজ রাত্রি এখানেই যাপন কর।

"এই মাত্র বলি গোরা মুদিয়া নয়ন।
হরিনামে করিলেন রজনী যাপন॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি লাগে প্রভুর কৃপায়।
সেই লাগি পড়ে থাকি যথায় তথায়॥
যেই দিন বলে প্রভু ভিক্ষা করিবারে।
সেই দিন যাই মুহি গৃহস্থের দ্বারে॥" (কড়চা)

পরদিন তাঁহারা গুর্জ্জরীনগরে উপস্থিত হইলেন সেখানে বহু লোকের বাস এবং অনেক অট্টালিকা; নিকটে অগস্ত্যকুণ্ড নামে একটী কুণ্ড ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব কুণ্ডে স্নান করিয়া তীরে বসিয়া হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে দুই চারিজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। এক ব্রাহ্মণ কিছু দুগ্ধ ও চিনি আনিয়া দিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে আপন গৃহে অতিথি হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, আপনি হরিনাম করুন; আপনার মুখে হরিনাম বড়ই মধুর লাগে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কোন দিকেই লক্ষ্য নাই; তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দুলিতে ছিলেন, গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল।

"লোকজন নাহি দেখে মোর গোরা রায়।
কৃষ্ণ হে বলিয়া কাঁদি মৃত্তিকা ভিজায়॥
ফুকারি ফুকারি প্রভু কাঁদিতে লাগিল।
বাঁধন খুলিয়া পৃষ্ঠে জটা এলাইল॥
লোমাঞ্চিত কলেবর কাঁদিয়া আকুল।
আলু থালু বেশে প্রভু কহে নানা ভুল॥
কভু প্রভু মত্ত হ'য়ে গড়াগড়ি যায়।
আছাড়ি বিছাড়ি কভু পড়য়ে ধরায়॥
ঐ মোর প্রিয় সখা মুকুন্দ মুরারী।
এই বলি ধেয়ে যান চৈতন্য ভিখারী॥
কখন বলেন এস প্রাণ নরহরি।
কৃষ্ণ নাম শুনি তোরে আলিঙ্গন করি॥" (কড়চা)

এই সংবাদ পাইয়া নগরের বহু লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন।

তন্মধ্যে অর্জ্জুন নামে একজন অদ্বৈতবাদী তাঁহাকে অদ্বৈতবাদ বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

"অর্জ্জুন বলিলা জীব-তত্ত্ব নাহি মানি।
আত্ম-তত্ত্ব জীব-তত্ত্ব দুই এক জানি॥
প্রভু কহে আপনি পণ্ডিত মহাশয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ শুনি করহ নিশ্চয়॥
দ্বাসুপর্ণা এশ্রুতির মর্ম্ম যদি জান।
তবে কেন দুই তত্ত্ব এক বলি মান॥
বেদান্তের সূক্ষ্ম কথা বলি গোরা রায়।
তন্ন তন্ন করি সব অর্জ্জুনে বুঝায়॥
জীব-আত্মা পরমাত্মা এই ভাবে রয়।
আত্মা মহা বৃক্ষ, জীব তার পত্র হয়॥
কি পাঠ করিলে তুমি পণ্ডিত ঠাকুর।
আতাল পাতাল কথা সব কর দূর॥
ঈশ্বরের ছায়া মায়া তাতে লিপ্ত নয়।
তাঁহার ইচ্ছায় জীব হয় মায়াময়॥
নাম বলে যেই মায়া ছাড়িবারে পারে।
সেইত মহান্ মুনি হয় এই সংসারে॥
মায়া যবনিকা মধ্যে আছে এক জন।
যবনিকা তুলে তাঁরে কর দরশন॥
এত বলি কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাক দিল।
সেস্থান অমনি যেন নিঃশব্দ হইল॥
প্রভুর মুখেতে নাম শুনিয়াছি কত।
আজি কিন্তু দেহ মোর হইল পুলকিত॥

রাম রাম বলি প্রভু ডাকিতে লাগিল।
সেস্থান তখনই যেন বৈকুণ্ঠ হৈল ॥"

(কড়চা)

দলে দলে লোক আসিয়া চৈতন্যদেবকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে হরিনাম শুনিতে লাগিল সকলেই তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। শ্রীচৈতন্যদেব আত্ম-হারা হইয়া হরিনাম করিতেছেন। তাঁর দুই চক্ষু বহিয়া ঝর ঝর অশ্রু ঝরিতেছে, জনতার পশ্চাতে বহু কুলবধূ দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা অঞ্চলের অশ্রু মুছিতেছিলেন। দলে দলে বড় বড় মহারাষ্ট্রী আসিয়া নাম শুনিতেছিল।

"অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিয়া।
হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুদিয়া ॥
উপদেশে এই দেশ মাতাইলা প্রভু।
এমন প্রভাব মুহি দেখি নাই কভু ॥
কখন তামিল বুলি বলে গোরা রায়।
কভু বা সংস্কৃত বলি শ্রোতারে মাতায় ॥"

এই বিবরণে মনে হইতেছে, এই স্থানটী তামিল ও মহারাষ্ট্রদেশের সন্ধিস্থল এবং শ্রীচৈতন্যদেব কিছু কিছু তামিল বলিতেও শিখিয়াছিলেন। অন্য দিনের মত হরিনাম করিতে করিতে আজও আছাড় খাইয়া ভূমিতলে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। লোকে কেহ জল আনিয়া মুখে দিল, কেহ বা অতি সাবধানে তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। দুই দণ্ড পরে চৈতন্যদেব উঠিয়া বসিলেন, তখন লোকে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। অপরাহ্নে এক ব্রাহ্মণ কিছু খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া দিলেন। চৈতন্যদেব বৃক্ষতলে বসিয়া তাহা আহার করিলেন।

গুর্জ্জরীনগর হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ণনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই পূর্ণনগর বোধ হয় বর্ত্তমান পুণা। সাত দিন পথে কোন স্থানে ইষ্টগোষ্ঠী না করিয়া তাঁহারা একেবারে বিজাপুরে পর্ব্বতে উঠিলেন। এখানে সহ্য গিরির শোভা দেখিয়া শ্রীচৈতন্যদেব অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহারা পূর্ণনগরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব অচ্ছসর নামক একটি জলাশয়-তীরে বিস্তৃত বকুল বৃক্ষতলে বসিলেন। এখানে বহু পণ্ডিতের বাস। অনেক চতুষ্পাঠী ছিল। নানা স্থান হইতে শত শত বিদ্যার্থী গুরুস্থানে বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। গীতা ও ভাগবতের বহু সমাদর ছিল।

"ভাগবত যেই জন করে অধ্যয়ন।
তাহারে পণ্ডিত বলি মানে সর্ব্বজন।
গীতা আর ভাগবত যেই নাহি জানে।
তাহারে পণ্ডিত বলি কেহ নাহি মানে॥" (কড়চা)

এক জন ব্রহ্মবাদী পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক উঠাইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার সকল যুক্তি খণ্ডন করিলেন। আর একজন পণ্ডিত ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাহা শুনিয়া চৈতন্যদেবের নয়নে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। লোকে তাঁহার ভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

"প্রভু বলে মোর প্রাণ মুকুন্দ মুরারী।
আসিয়া উদিত হও হৃদয়ে আমারি॥" (কড়চা)

কৃষ্ণ বিনা আর এ প্রাণ ধারণ করিতে পারি না, কোথা গেলে তাঁর

দর্শন পাইব এই বলিয়া আর্ত্তি করিতে লাগিলেন। একজন পণ্ডিত বিদ্রূপ করিয়া বলিল, তোমার কৃষ্ণ এই সরোবরের মধ্যে আছেন, এই কথা শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কলেবর লোমাঞ্চিত হইল। দ্বিগুণ বেগে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

"এমন অশ্রুরবেগ কভু দেখি নাই।
কৃষ্ণের বিরহে কেঁদে আকুল নিমাই॥
কৃষ্ণ বলি ফুলে ফুলে কাঁদিতে লাগিল।
বলে কৃষ্ণ বিনা প্রাণ বিফল হইল॥
অশ্রু জলে ভিজাইলা পৃথিবীর কোল।
কাঁদিতে কাঁদিতে মুখে বলে হরি বোল॥
একবার বলে মোরে একি বিড়ম্বনা।
কৃষ্ণ বিনা আর প্রাণে সহেনা যাতনা॥" (কড়চা)

সেই পণ্ডিত আবার বিদ্রূপ করিয়া বলিল, তোমার কৃষ্ণ এই জলে লুকাইয়া আছেন। শ্রীচৈতন্যদেব এইবার তাহার কথা শুনিয়া প্রেমাবেশে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, কিন্তু বহু লোক সরোবরে নামিয়া তাঁহাকে ডাঙ্গায় তুলিল এবং সেই পণ্ডিতকে তিরস্কার করিতে লাগিল। চৈতন্যদেব তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, ইহাকে কেন বৃথা তিরস্কার করিতেছ। জল, স্থল, শূন্য সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ নিয়ত বিরাজিত। যে ভক্ত, সেই দেখিতে পায়। মায়ামোহে যে ইহা বুঝে না সে বড়ই দুর্ভাগ্য। স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পদ সকলই মিথ্যা, যেদিন আত্মাপক্ষী দেহ-বৃক্ষ ছাড়িবে, সেদিন এই জড়দেহ পড়িয়া থাকিবে। তবে কেন জাগিয়া স্বপন দেখ! সকলকেই একদিন মরিতে হইবে। রাজাধিরাজ সম্রাটেরও নিস্তার নাই। বহুমূল্য মণিমুক্তা কিছুই সঙ্গে

যাইবে না। সংসারে সকলই অনিত্য, এক হরিনামই সত্য। ভক্তিভরে সকলে হরিনাম কর। সকল পাপ দূরে যাইবে। বার বার জন্ম, জরা মৃত্যু ভোগ করিতে হইবে না। তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহুলোক আসিয়া জুটিল। কেহ বলে এ সন্ন্যাসী মানুষ নয়, কেহ বলে ইনি মহাজন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন।

চরিতামৃতে এসকলের কোন উল্লেখ নাই। পুণা গমনেরও কোন বিবরণ নাই। তবে অনতিদূরবর্ত্তী পাণ্ডুপুর গমন করিয়া বিঠল দেখিয়াছিলেন লিখিত আছে। এই পাণ্ডুপুর বর্ত্তমান পাণ্ডারপুর, পুণা হইতে অধিক দূর নয়। পথে গোকর্ণ ও শোলাপুর গমনের উল্লেখ আছে। পাণ্ডারপুর মহারাষ্ট্র দেশের প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। শ্রীচৈতন্যদেব খুব সম্ভবতঃ তাহা দর্শন করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাসের কড়চায় ইহার উল্লেখ না থাকার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক আমরা চরিতামৃতের বিবরণই গ্রহণ করিতেছি। পাণ্ডারপুরে উপস্থিত হইয়া বিঠল (বর্ত্তমান বিঠোবা) দেবের সম্মুখে প্রেমাবেশে বহু নৃত্য গীত করিলেন। লোকে তাঁহার প্রেম দেখিয়া চমৎকৃত হইল। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন; তাঁহার নিকট শ্রীচৈতন্যদেব সংবাদ পাইলেন যে, শ্রীরঙ্গপুরী নামে মাধব পুরীর এক শিষ্য সেই গ্রামে এক ব্রাহ্মণ-গৃহে বিশ্রাম করিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন এবং প্রেমে বিগলিত হইয়া তাঁহাকে দণ্ড প্রণাম করিলেন। চৈতন্যদেবের দেহে পুলক, অশ্রু, স্বেদ, কম্প, দেখা দিল। শ্রীরঙ্গপুরী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই ইনি আমার গুরুদেবের শিষ্য হইবেন, নতুবা এমন প্রেম অন্যত্র সম্ভব নহে। অতঃপর দুইজনে নিভৃতে বসিয়া

ধর্ম্মালাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় হইল। শ্রীরঙ্গপুরী জানিতে পারিলেন যে, ইঁহার জন্মস্থান নবদ্বীপ। তখন তিনি বলিলেন যে, পূর্ব্বে তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে নবদ্বীপ গিয়াছিলেন। সেখানে জগন্নাথ মিশ্র নামক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। জগন্নাথের পত্নী পুত্রসম বাৎসল্যে তাঁহাদিগকে আহার করাইয়াছিলেন। তিনি রন্ধনে সুনিপুণা ছিলেন। সেখানে অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট খাইয়াছিলেন। তাঁহাদের এক যোগ্যপুত্র অল্পবয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম শঙ্করারণ্য হইয়াছিল এবং এই তীর্থে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন। শ্রীচৈতন্যদেব তখন বলিলেন, পূর্ব্বাশ্রমে তিনি তাঁহার ভ্রাতা এবং জগন্নাথ মিশ্র তাঁহার পিতা ছিলেন। এইরূপে কয়েকদিন তাঁহারা নানা কথায় আনন্দে অতিবাহিত করিলেন। তৎপরে শ্রীরঙ্গ পুরী দ্বারকা দেখিতে গমন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ব্রাহ্মণের অনুরোধে আরও কয়েকদিন পাণ্ডারপুরে অতিবাহিত করেন। তৎপরে কৃষ্ণবেন্বা তীরে গমন করিয়া নানা তীর্থ ও দেবমন্দির দর্শন করেন। এখানকার বৈষ্ণব সমাজে কৃষ্ণকর্ণামৃত পাঠ শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হন এবং সেই গ্রন্থ নকল করাইয়া লন। তৎপরে তাপিতে (সম্ভবতঃ তাপ্তি) স্নান করিয়া মাহিষ্মতী আগমন করেন। এই মাহিষ্মতী অতি প্রাচীন নগরী; নর্ম্মদাতীরে অবস্থিত। বর্ত্তমান সময়ে মহেশ নামে পরিচিত। নর্ম্মদা তীরে নানা তীর্থ দেখিয়া শ্রীচৈতন্যদেব দণ্ডকারণ্যে ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে গমন করেন। সেখানে সাতটী অতি প্রাচীন ও স্থূল তাল বৃক্ষ ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব তাহা দেখিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং সেগুলি সশরীরে বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল। তৎপরে পম্পা সরোবরে স্নান করিয়া তিনি পঞ্চবটী আসিয়া বিশ্রাম করিলেন। অতঃপর নাসিক ও ত্র্যম্বক দেখিয়া ব্রহ্মগিরি গেলেন। তদনন্তর গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান

কোসাবর্ত্ত আগমন করিয়া সপ্তগোদাবরী ও বহুতর তীর্থ দেখিয়া পুনরায় বিস্তানগরে আসিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের এই বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত এবং সন্দেহজনক। বহুদূরবর্ত্তী স্থানের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কোথায় পাণ্ডুনগর, কোথায় মাহিষ্মতী, কোথায় নাসিক আর কোথায় বিদ্যানগর! এই সকল নগরের অবস্থান সম্বন্ধে গ্রন্থকারের কোনই ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই সকল স্থান পর্য্যটন করিতে কত সময় লাগে সে সম্বন্ধেও কোন জ্ঞান ছিল বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক তিনি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন আমরা অবিকল তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। বিদ্যানগরে রামানন্দ রায়ের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। শ্রীচৈতন্যদেব পথে সংগৃহীত কর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা দুই গ্রন্থ তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, তুমি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলে ইহাতে তাহার সমর্থন করা হইয়াছে। রামানন্দ রায় বলিলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আজ্ঞানুসারে রাজার নিকট নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। রাজা অনুমতি দিয়াছেন; তিনি নীলাচলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, তোমাকে লইবার জন্য আমার এখানে আগমন। তোমাকে লইয়া নীলাচল যাইব। রামানন্দ রায় বলিলেন, আমার সঙ্গে অনেক হাতী, ঘোড়া, সৈন্য যাইবে। বহু কোলাহল হইবে। সব গুছাইয়া লইতে দিন দশ সময়ও লাগিবে; আপনি অগ্রে যান, আমি পরে আসিতেছি। শ্রীচৈতন্যদেব এই কথা শুনিয়া আনন্দে নীলাচল যাত্রা করিলেন এবং পূর্ব্বে যে পথে আসিয়াছিলেন সেইপথে নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আলালনাথে পৌছিয়া সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণকে সংবাদ দিবার জন্য অগ্রে পাঠাইয়া দিলেন। ভক্তগণ এই সংবাদে অধীর হইয়া সমুদ্রতীরে আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হইলেন।

এই গেল চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণ; কিন্তু গোবিন্দদাসের কড়চার বিবরণ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। কড়চানুসারে শ্রীচৈতন্যদেব দ্বারকা প্রভৃতি আরও বহুস্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং পথে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। পুণা হইতে তিনি ভোলেশ্বর শিবদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই স্থানটি পুণার কিছু দক্ষিণে হইবে।· তাঁহারা তাহা ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব সেখানকার বর্ণনা শুনিয়া কিছু পথ ফিরিয়াও সেখানে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। পার্ব্বত্য পথে ভোলেশ্বর পৌছিয়া দেখিলেন পর্ব্বতের উপরে প্রকাণ্ড মন্দির; তার মধ্যে ভোলেশ্বর; নিকটে সিদ্ধকূপ নামে একটি কূপ; তাহার জল তুলিয়া স্নান করিয়া অন্যান্য স্থানের মত স্তব স্তুতি করিলেন। ভোলেশ্বর হইতে নিকটবর্ত্তী দেবলেশ্বর মন্দির দেখিতে যান। তথা হইতে কিছু দূরে জিজুরীনগরী। সেখানে খাণ্ডবা নামে এক দেবতার মন্দির। অতঃপর তাঁহারা সেখানে গেলেন। যে সকল বালিকার পিতা মাতা দরিদ্র, অর্থাভাবে বিবাহ দিতে পারে না অথবা অন্য কোন কারণে বিবাহ হয় না, খাণ্ডবার সঙ্গে তাহাদের বিবাহ দেয়, কিন্তু পরিণামে তাহাদের অশেষ দুর্গতি হয়।

> "খাণ্ডবারে পতি ভাবি কতশত নারী।
> ক্রমে ক্রমে হইয়াছে পথের ভিখারী॥
> প্রতারিত হয়ে সবে খাণ্ডবার স্থানে।
> বেশ্যাবৃত্তি কত নারী করিছে এখানে॥
> খাণ্ডবার পত্নী বলি পাপ কর্ম্ম করে।
> তাহাদের বড়ই দুর্গতি হয় পরে॥
> তীর্থ করিবারে হেথা আসে বহুজন।
> কৌশলে তাদের করে নরকে পাতন॥" (কড়চা)

শ্রীচৈতন্যদেব এই হতভাগিনীদের কথা শুনিয়া তাহাদের দুঃখে অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন। লোকে এই রমণীদিগকে মুরারী বলিত। তিনি কাঁদিয়া বলিলেন—

"কেমন নিঠুর পিতা বলিতে না পারি।
কেমনে মুরারী করে আপন কুমারী॥"

দয়ার সাগর চৈতন্যদেব তাহাদিগকে দেখিতে যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। সঙ্গী নিষেধ করিলেন তাহা কিন্তু শুনিলেন না। মুরারী পল্লীতে গিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন করিলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদে ক্রমে ক্রমে বহু নারী আসিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন।

"নারীগণ বলে প্রভু কর হরিনাম।
নাম বলে অবশ্য পাইবে নিত্য ধাম॥
বড়ই দয়াল হরি অগতির গতি।
তাঁহাকে ভাবহ সবে নিজ নিজ পতি।
কৃষ্ণকে পাইতে পতি যত গোপীগণ।
কাত্যায়িনী ব্রত করে হয়ে শুদ্ধমন॥
কৃষ্ণ পতি পাইলে না রবে ভবভয়।
কৃষ্ণ সকলের পতি জানহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে ডাক ভক্তি ভরে।
সর্ব্বদা বলহ মুখে হরে কৃষ্ণ হরে॥"

এই বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন; অমনি তাঁহার অঙ্গে পুলকাদি দেখা দিল। মুরারীগণ তাঁহার ভাবাবেশ দেখিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, আমি গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষা করি; আমি নিতান্ত অস্পৃশ্য; আমাকে

ছুঁইও না, ভক্তিভরে হরি বল। নামবলে সকল পাপ ভস্ম হইয়া যাইবে। যে না জানিয়া পাপে মগ্ন হয় হরিনামে সে পাপ ক্ষয় হয়। শ্রীচৈতন্য-দেবের উপদেশ শুনিয়া নারীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ইন্দিরা বাই নামে একজন রমণী জোড়হস্ত করিয়া বলিল, হে সন্ন্যাসী মহাশয়, আমাকে কৃপা করুন। আমি কুকর্ম্ম করিয়া বৃদ্ধা হইয়াছি। পদধূলি দিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। এই বলিয়া সে ধূলায় লোটাইতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যদেব তাহাকে হরিনাম দিয়া উদ্ধার করিলেন। ইন্দিরা তাহার পাপার্জ্জিত গৃহ ত্যাগ করিয়া বাহির হইল। এইরূপে আরও অনেক মুরারী পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া সাধুজীবন আরম্ভ করিল। অনুতাপে ক্রন্দন করিয়া তাহারা হরিনাম করিতে লাগিল।

এইরূপে মুরারীগণের উদ্ধার করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব চোরানন্দী বনে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে নিষেধ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, সেখানে বহু দস্যুর বাস, তাহারা জীবন নাশ করিতে পারে, সেখানে যাইবেন না। শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, দস্যুরা আমার কি লইবে। রামস্বামী নামে একজন লোক সম্ভবতঃ সন্ন্যাসী, বলিল, চোরানন্দীতে ত কোন তীর্থ নাই, সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন কি? যদি দস্যুরা আপনার কোন অমঙ্গল সাধন করে, তবে আপনার শোকে লোক প্রাণ ত্যাগ করিবে। চৈতন্যদেব সে সকল গ্রাহ্য না করিয়া চোরানন্দী বনে গমন করিয়া একটী বৃক্ষতলে বসিলেন। সেখানে বহু দুষ্ট লোক আড্ডা করিয়া ডাকাতি করিত। পথিক দেখিলে তাহার প্রাণবধ করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। অল্পক্ষণ পরেই একজন লোক আসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিল। তৎপরে সে গভীর বনমধ্যে চলিয়া গিয়া দস্যুদলের নেতা নরোজীকে লইয়া আসিল। সে মহা বলশালী। একে একে অস্ত্রধারী আরও

২।৪ জন দস্যু আসিয়া জুটিল। নরোজী বলিল, আপনি আমার গৃহে চলুন, আজ রাত্রি সেখানে যাপন করিবেন। চৈতন্যদেব বলিলেন, আজ এই বৃক্ষতলেই রাত্রি যাপন করিব। তখন নরোজী সঙ্গিগণকে সন্ন্যাসীর জন্য ভিক্ষা আনয়ন করিতে বলিল। দস্যুগণ অবিলম্বে কেহ কাঠ, কেহ চাউল, কেহ দুগ্ধ কেহ ফলমূল আনয়ন করিতে লাগিল। গোবিন্দ-দাস লিখিয়াছেন যে, চৈতন্যদেবের সঙ্গে তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু এই বন-মধ্যে যত খাদ্য-দ্রব্য আনয়ন করিয়াছিল এত কোথাও দেখেন নাই। চৈতন্যদেব ততক্ষণে যোগাসনে বসিয়া নাম সংকীর্ত্তনে মগ্ন হইয়াছেন। হরিনাম করিতে করিতে তিনি প্রেমে মত্ত হইয়া পড়িলেন। খাদ্যদ্রব্যাদি কিছুই লক্ষ্য নাই। তাঁহার পদাঘাতে সেগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। দুই এক জন দস্যু বলিতে লাগিল, সন্ন্যাসী ইচ্ছা করিয়া খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করিতেছেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর ভাব দেখিয়া নরোজীর হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাহার প্রাণে অনুতাপ জ্বলিয়া উঠিল।

"নরোজী বলিল কভু দেখি নাই হেন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোর প্রাণ কাঁদে কেন॥
কত পাপ করিয়াছি কে পারে বলিতে।
আজি কেন ইচ্ছা হয় কৌপীন পরিতে॥"

নরোজী এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখিতে লাগিল। তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বহিতেছিল। ক্রমে বহু দস্যু আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে দিবা প্রায় অবসান হইয়া আসিল। তখন নরোজী কাঁদিয়া বলিল "আমি আর দস্যুবৃত্তি করিব না। আপনি আমাকে সঙ্গে লউন। আমি ব্রাহ্মণের সন্তান। স্ত্রী-পুত্র নাই তবে আর কার জন্য ধন সঞ্চয় করিব? দস্যুদল পরিত্যাগ

করিয়া আপনার সঙ্গে ভ্রমণ করিব।" চৈতন্যদেব তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহাকে বৈরাগ্যের উপদেশ দিলেন। নরোজী তৎক্ষণাৎ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী হইল। তাঁহারা চোরানন্দী বন পরিত্যাগ করিয়া খণ্ডলা নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে মূলা নামে বেগবতী নদী প্রবাহিত। শ্রীচৈতন্যদেব স্নান করিয়া নদীতীরে বসিলেন, সঙ্গীদ্বয় ভিক্ষার জন্য বহির্গত হইল। ক্রমে দুই চারি জন করিয়া বহু লোক আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। খণ্ডলার লোকেরা খুব আতিথেয়। তাহারা শ্রীচৈতন্যদেবকে নিজ গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজন ধনী লোক ছিল। চৈতন্যদেবের পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র দেখিয়া সে বলিল, "আজ আমার বাগানে গিয়া ভিক্ষা গ্রহণ কর। পরিধানের জন্য একখানি বস্ত্র দিব। যদি চাহ পাথেয়ের জন্য অর্থ দিব। আর যাহা চাহিবে তাহাই আনিয়া দিব।" চৈতন্যদেব হাসিয়া বলিলেন, বিলাস-বিভবে আমার কোন প্রয়োজন নাই, ছিন্ন বস্ত্রই ভাল। অর্থের কোনই প্রয়োজন নাই, শরীর রক্ষার জন্য মাঝে মাঝে ভিক্ষা করিতে হয়। আজ আমার দুইজন সঙ্গী ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। এই বলিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া তিনি হরিনাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার গাত্র হইতে স্বেদ বহির্গত হইতে লাগিল। নরোজী নিকটে বসিয়া স্বেদ মুছাইল। এইরূপে সারা রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে উঠিয়া তাহারা নাসিক নগরে গেলেন। এই স্থানে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসিকা ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহার কিঞ্চিৎ উত্তরে ত্রিমুক। বনবাসকালে রামচন্দ্র ইহার নিকটে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন, এইপ্রকার জনশ্রুতি আছে।

শ্রীচৈতন্যদেব সেই কথা শুনিয়া তদভিমুখে চলিলেন। নিবিড়

বনের মধ্যে ঝরণার ধারে একখানি প্রস্তরের উপরে রামচন্দ্রের পদ-চিহ্ন আছে বলিয়া লোকে দেখাইল। শ্রীচৈতন্যদেব "হেথা মোর রাম" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। পাগলের মত এদিকে ওদিকে ফিরিতে লাগিলেন। এইরূপে অনাহারে দুই একদিন ভ্রমণ করিয়া পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব সেখানে একটী গুহার মধ্যে স্থির হইয়া বসিলেন। সঙ্গী দুইজন আহার্য্য অন্বেষণে বাহির হইল। অল্পক্ষণ পরে নরোজী কিছু ফল সংগ্রহ করিয়া জোড়হস্তে সম্মুখে দাঁড়াইল। চৈতন্যদেব কিছু ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট সঙ্গীদিগকে দিলেন। আহারান্তে সারারাত্রি বসিয়া হরিনাম করিয়া কাটাইলেন। পরদিন প্রভাতে পঞ্চবটী ত্যাগ করিয়া দমন নগরে গেলেন এবং তথায় বিশ্রাম না করিয়া আরও উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে সুরথ রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অষ্টভুজা ভগবতীর মন্দির ছিল। দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। সেখানে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখিয়া বলিলেন, "আপনাকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইতেছে। কিরূপে সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইব, সেই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন। শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন,"আমি সার-তত্ত্ব কিছুই জানি না, ভবানী আপনার মনের অন্ধকার দূর করিবেন। সামান্য নায়িকা যেমন সুন্দর নায়ক দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেইভাবে কৃষ্ণকে ডাকুন, আপনিই মনের অন্ধকার ঘুচিয়া যাইবে।" তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ দেবীর নিকট বলি দিবার জন্য ছাগ লইয়া উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, পবিত্রমূর্ত্তি দেবী কিরূপে পশু ভক্ষণ করিবেন। লোভী মানুষ নিজের জিহ্বার চরিতার্থে পশু বধ করে। কিন্তু জগজ্জননী কখনও

নিরীহ পশুর রক্তে আনন্দিত হইতে পারেন না। এই প্রকারে শ্রীচৈতন্যদেব পশুবধের নৃশংসতা প্রমাণ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার যুক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া বধ্য ছাগ ছাড়িয়া দিয়া পুষ্প ও পত্র দ্বারা দেবীর পূজা করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবও ভক্তিভরে দেবীর পূজা করিয়া তাপ্তি নদীতে স্নানের জন্য অগ্রসর হইলেন। তাপ্তিতে সন্ধ্যাস্নান করিয়া নিকটবর্ত্তী প্রান্তস্থিত বামনমূর্ত্তি দর্শন করিতে গমন করেন। বলি রাজা এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। বামনদেবের পূজা করিয়া যজ্ঞকুণ্ড দর্শনের জন্য ভরোচ নগরে যান। এখানে একটী প্রকাণ্ড খাদ ছিল। প্রবাদ যে, এখানে বলি রাজা যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং এই খাদ সেই যজ্ঞের কুণ্ড। অতঃপর তিনি নর্ম্মদায় স্নান করিয়া বরোদায় গমন করিলেন। বরোদার রাজা পরম ধার্ম্মিক। সেখানে একটী গোবিন্দের মন্দির ছিল। রাজা স্বহস্তে গোবিন্দের মন্দির পরিষ্কার করিতেন এবং প্রতিদিন তুলসীমঞ্জরী সংগ্রহ করিয়া গোবিন্দের চরণে অর্পণ করিতেন। চৈতন্যদেব সন্ধ্যাকালে গোবিন্দ দর্শনের জন্য মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং অন্যান্য স্থানের মত এখানেও প্রেমে মত্ত হইয়া নৃত্য করিলেন। বরোদা অবস্থানকালে একটী অনর্থ সংঘটন হয়। সঙ্গী নরোজী তিন দিনের জ্বরে এখানে প্রাণত্যাগ করেন। চৈতন্যদেব পরম যত্নে স্বহস্তে তাঁহার শুশ্রূষা করেন এবং আসন্নকালে তাঁহার কর্ণে হরিনাম শ্রবণ করান। নরোজী শ্রীচৈতন্যদেবের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ভিক্ষা করিয়া চৈতন্যদেব নরোজীর মৃতদেহ সমাধিস্থ করিলেন এবং ভক্তিভরে সমাধির চারিদিকে নৃত্য করিতে করিতে নাম সংকীর্ত্তন করিলেন। বরোদার রাজা এই কথা শুনিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব

প্রেমাবেশ দেখিয়া করজোড়ে তাঁহাকে ভিক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। চৈতন্যদেব বলিলেন, বিলাসের অন্নে প্রয়োজন নাই। আমি গৃহস্থের ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করিব। রাজা অতিশয় দীনতা প্রকাশ করিয়া সেদিন ভিক্ষা গ্রহণের জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব অগত্যা সঙ্গী গোবিন্দদাসকে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে অনুমতি দিলেন। প্রভুর আদেশ পাইয়া গোবিন্দদাস রাজার নিকটে সামান্য লোকের ন্যায় মুষ্টিভিক্ষা চাহিলেন।

পর দিন প্রভাতে তাঁহারা বরোদা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে একটী বেগবতী নদী অতিক্রম করিয়া তাঁহারা আহামেদাবাদে উপস্থিত হইলেন। কড়চায় আহামেদাবাদের যে বর্ণনা আছে তাহাতে মনে হয় সে সময় আহামেদাবাদ অতি সমৃদ্ধিশালী সহর ছিল।

"আশ্চর্য্য আমেদাবাদ জাঁকের সহর।
কতই উদ্যান কত গৃহ মনোহর॥
বড় বড় অট্টালিকা মধ্যে শোভা পায়।
নিরত দেশের লোক অতিথি সেবায়॥
গ্রাম্যলোক অতিথিরে দেবতুল্য মানে।
অতিথির সেবা তারা করে প্রাণপণে।"

শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব্ব দেহকান্তি দেখিয়া আমেদাবাদবাসী অনেক লোক আসিয়া স্ব স্ব গৃহে ভিক্ষাগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিল। কিন্তু তিনি কোনও গৃহস্থের বাটী না গিয়া নগরপ্রান্তে নন্দনীনামক একটী উদ্যানের পার্শ্বে রজনী যাপন করিতে মনস্থ করিলেন। অগত্যা সেখানেই নগরবাসিগণ খাদ্যদ্রব্যাদি আনয়ন করিল। রাত্রিতে

শ্রীচৈতন্যদেব কিছু আহার করিলেন। রজনীতে বহুলোক আসিয়া তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিল। একজন পণ্ডিত ভাগবতের শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। চৈতন্যদেব তাহাতে বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে অনেক সাধুবাদ করিলেন। তিনিও শ্রীচৈতন্যের ব্যবহারে প্রীত হইয়া নগরবাসীদের নিকটে সন্ন্যাসীর বহু প্রশংসা করিলেন। ক্রমে বহুলোক তাঁহার নিকটে সমাগত হইল। চৈতন্যদেব আনন্দে মাতিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। আমেদাবাদ-বাসীদিগকে তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন গোবিন্দদাসের কড়চায় তাহার নিম্নলিখিত সারমর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

"প্রভু বলে ভক্তিভরে নাম কর সবে।
সব তাপ দূরে যাবে দুঃখ নাহি রবে॥
কাহাকেও না করিবে ঘৃণা গর্ব্ব ভরে—
গর্ব্বশূন্য হয়ে বল হরে কৃষ্ণ হরে॥
বিদ্যার গৌরবে নহে পণ্ডিত সে জন।
ভক্তিরসে যে জনের শুদ্ধ নাহি মন॥
কোটি বিঘ্ন যেই জন তৃণ সম গণি।
প্রেমে মত্ত হয় তারে ভক্ত বলি মানি॥
প্রেমভক্তি সার তত্ত্ব শ্রুতি ইহা কহে,
প্রেমে মত্ত হরি ভক্ত মুক্তি নাহি চাহে।
প্রেম ভক্তি হয় যার কণ্ঠের ভূষণ।
নিত্য পরিকর হয় কৃষ্ণের সে জন॥
কৃষ্ণপ্রেম শিখরিণী যে করে আস্বাদ।
সেবিতে তাহার পদ না করি বিবাদ॥

এই দেহে যেই জন কাটিয়া বন্ধন।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয় ঠাকুর সে জন॥
মহামায়া জ্ঞান চক্ষে ধূলি প্রক্ষেপিয়া।
দিয়াছে চৈতন্য জড়ে গ্রন্থি লাগাইয়া॥
সে কারণ মূর্খ লোক এই চরাচরে।
মুগ্ধ হয়ে জড় দেহে আত্মবুদ্ধি করে॥
জড়দেহে অভিমানে ছাড়ে যেই জন।
মাথার ঠাকুর সেই বেদের কথন॥
কৃষ্ণপ্রেমে নিমগন পরম বৈষ্ণব।
বহু গণ্ডগোল করি না করে কৈতব॥
বেদান্তের মুখ্য অর্থ যেই নাহি জানে।
সেইজন্য জীব ব্রহ্মে এক করি মানে।”

পরদিন আহামেদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া শুভ্রামতী নদী পার হইয়া আরও পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। পথে কতকগুলি দ্বারকাযাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন বাঙ্গালী ছিলেন। ইঁহাদের নাম রামানন্দ ও গোবিন্দচরণ। বহুদিন পরে দুইজন বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গোবিন্দদাস অতিশয় আনন্দিত হইলেন। স্বভাবতঃই তিনি তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারাও গোবিন্দ দাসের মুখে শ্রীচৈতন্যের পরিচয় পাইয়া অতিশয় পুলকিত হইলেন এবং ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। চৈতন্যদেবও তাঁহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়া প্রস্তাব করিলেন, “চল, আমরা একসঙ্গে দ্বারকা যাই।” অতঃপর তাঁহারা একত্র দ্বারকাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে তাঁহারা ঘোগা নামে এক গণ্ডগ্রামে উপস্থিত হইলেন।

সেখানে বারমুখী নামে পরমরূপবতী এক বারবনিতা বাস করিত। বহু ধনীর সন্তান তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া কুপথে যাইত, বারমুখীর বহু ধন; নগরপ্রান্তে প্রকাণ্ড এক উদ্যানে সুন্দর গৃহে বাস করিত। তাহার গৃহপার্শ্বে একটী বিশাল নিমগাছ ছিল। চৈতন্যদেব পথশ্রমে শ্রান্ত হইয়া নিম্ব বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। সঙ্গী গোবিন্দদাস গ্রাম হইতে কিছু ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। মধ্যাহ্নে চারিজন আহার করিলেন। তৎপরে চৈতন্যদেব ভাবে মত্ত হইয়া নাম সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে দরদরধারে অশ্রু বাহির হইতে লাগিল। সংকীর্ত্তন শুনিয়া ক্রমে গ্রামের লোক সেখানে উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসীর আশ্চর্য্য ভক্তিভাব দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে কাহারও হৃদয় প্রেমে গলিল। সঙ্গী রামানন্দ ও গোবিন্দচরণ হাততালি দিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেবের অঙ্গে স্বেদ, পুলক, কম্প দেখা দিল। তিনি কখনও নৃত্য করেন, কখনও বা ঊর্দ্ধমুখে হাত তুলিয়া "কোথায় প্রাণের কৃষ্ণ" বলিয়া ক্রন্দন করেন। একবার "গোবিন্দ রে কোথায় প্রাণের কৃষ্ণ মিলাও আনিয়া" বলিয়া নিমগাছকে আলিঙ্গন করিলেন। নিকটে একটী গর্ত্ত ছিল, ভাবে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে তাহাতে পড়িয়া গেলেন। একজন গ্রামবাসী তাঁহাকে কপট সন্ন্যাসী ভাবিয়া বলিল, "গ্রামের লোককে প্রবঞ্চনা করিয়া অর্থলাভ করিবার জন্য তুমি এইপ্রকার ভাণ করিতেছ; আমার নিকট তোমার ভারিভূরি খাটিবে না; আমি তোমার মত অনেক কপট সন্ন্যাসী দেখিয়াছি।" অন্যান্য লোকেরা তাহার এই তিরস্কার-বাক্য শুনিয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইল। চৈতন্যদেব তাহাদিগকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ভাই সব, উহাকে মারিও না, হরিনাম-সুধা পান করাও; বিষয়-পিপাসায়

উহার হৃদয় শুষ্ক হইয়াছে, ভক্তির অভাবে উহার প্রাণ কঠোর হইয়াছে, হরিনাম-সুধা দানে উহাকে সিক্ত কর। অতঃপর দুর্ব্বৃত্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সাধু! তুমি আমার নিকটে এস, আমি তোমাকে হরিনাম-সুধা পান করাইব, তোমার পাপের বোঝা নামিয়া যাইবে। মধুর হরিনামে সকল পাপ দূর হয়, শুষ্ক হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার হয়।" এই বলিয়া চৈতন্যদেব তাহার নিকটে গিয়া তাহার কর্ণে হরিনাম-সুধা ঢালিয়া দিলেন। জানালা হইতে বারমুখী এই ব্যাপার দেখিতেছিল। সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ভক্তিভাব দেখিয়া তাহার হৃদয়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। সে মনে মনে বিচার করিল, আমি অর্থের জন্য পাপজীবন যাপন করিতেছি. কোথায় আমার এই ঘৃণিত জীবন, আর কোথায় এই দেবস্বভাব সাধু! তাহার মনে অনুতাপ জাগিয়া উঠিল। সে পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া সেই সাধুর শরণাপন্ন হইতে সঙ্কল্প করিল। বারমুখী আপনার কক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সন্নিধানে উপস্থিত হইল। মিরা নামে তাহার দাসী পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। সে তাহাকে বলিল, আমার ধনসম্পত্তি তোমাকে দান করিলাম। আজ হইতে আমি পথের ভিখারী হইলাম। তাহার মাথার কেশপাশ এলাইয়া পড়িল। তাহাতে তাহার রূপের শোভা আরও বাড়িয়া উঠিল। সমাগত লোক তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, কিন্তু চৈতন্যদেব নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। বারমুখী কাতরে বলিল, "হে সন্ন্যাসী, আমার বন্ধন ছেদন করিয়া দাও, আমি বড়ই পাপিষ্ঠা। কিরূপে উদ্ধার পাইব আমাকে বলিয়া দাও। নতুবা আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইব। এই বলিয়া সে মস্তকের কেশরাশি ছিন্ন করিয়া ফেলিল। তখন চৈতন্যদেব তাহাকে বলিলেন,

তুমি এই স্থানে তুলসী-উদ্যান প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে হরিনাম সাধন কর। বারমুখী "তুমি কৃষ্ণ, তুমি হরি" বলিয়া চৈতন্যদেবের চরণে পড়িল। তিনি দুই চারিপদ পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। উপস্থিত লোকেরা এই ব্যাপার দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। দাসী মিরাবাই কাঁদিতে ছিল। বারমুখী তাহাকে বলিল, "মিরা, আমার কথা শুন, আমার সমুদয় সম্পত্তি তোমাকে দান করিলাম। তুমি আর পাপ কর্ম্ম করিও না, ভগবানের নাম কর ও সাধুসেবা কর।" অতঃপর সে সামান্য বেশে সেইস্থানে তুলসী-উদ্যান প্রস্তুত করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

এইরূপে বারমুখীর উদ্ধার করিয়া চৈতন্যদেব সঙ্গীদের সঙ্গে সোমনাথদর্শনে অগ্রসর হইলেন। তিনদিনে তাঁহারা জাফেরাবাদে পৌঁছিলেন। সেখানকার অধিবাসীরা দরিদ্র, কিন্তু বড় আতিথেয়। সন্ন্যাসী দেখিয়া গ্রামবাসিগণ ভিক্ষা আনিয়া দিল। চৈতন্যদেব রুটি প্রস্তুত করিয়া আহার করিলেন এবং এক মালীর উদ্যানে রাত্রি যাপন করিলেন। জাফেরাবাদ হইতে ছয়দিনে তাঁহারা সোমনাথে পৌঁছিলেন। তখন সোমনাথের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। মুসলমানেরা সোমনাথের বিখ্যাত মন্দির ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়াছিল, কেবল ভগ্নস্তূপ অবশিষ্ট ছিল। সোমনাথের এই অবস্থা দেখিয়া চৈতন্যদেব অতিশয় ব্যথিত হইলেন। সোমনাথ হইতে তাঁহারা জুনাগড়ে যান। জুনাগড়ে মিরাজিউ নামক একজন ব্রাহ্মণের ঘরে দুই দিন অতিবাহিত করিয়া নিকটবর্ত্তী গৃণার পাহাড় দেখিতে যান। পথিমধ্যে একদল সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের দলপতি ভর্গদেব পীড়িত হইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য সঙ্গীদিগকে তাঁহার সেবা করিতে বলিলেন এবং ঔষধার্থে নিমপাতার রস খাওয়াইতে বলিলেন। ভর্গদেব তাহাতে

সুস্থ হইয়া অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তৎপরে ভর্গদেবকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা গৃণার অভিমুখে চলিলেন। গৃণার অতি উচ্চ পাহাড়। তাহার শিরোভাগে পাথরে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন আছে বলিয়া প্রবাদ। চৈতন্যদেব তাহা দেখিয়া ভাবাবেশে মত্ত হইলেন। তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া রামানন্দ ও গোবিন্দচরণও ভাবে মত্ত হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। অপরাহ্নে তাঁহারা পাহাড় হইতে নামিয়া ভদ্রানামে নদীতীরে রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে ভদ্রানদী পার হইয়া ধন্বিধর নামক এক বিশাল অরণ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। অরণ্য দেখিয়া সঙ্গিগণের প্রাণে ত্রাস হইল। চৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া অগ্রসর হইতে বলিলেন। ভর্গদেবের অনুবর্ত্তী সন্ন্যাসীদল লইয়া তাঁহারা ষোল জন ছিলেন। সঙ্কীর্ণ বনপথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। জঙ্গল ক্রমে নিবিড়তর হইতে লাগিল। দেশের রাজা পথের ধারে মাঝে মাঝে বিশ্রামস্থান করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাত্রিতে তাঁহারা সেখানে অবস্থান করিতেন। বন্যফল খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন। এইরূপে সাতদিনে তাঁহারা বন অতিক্রম করিয়া নিকটবর্ত্তী অমরাপুরী পৌছিলেন। প্রবাদ, এইখানে প্রভাস-যজ্ঞে যাদবগণ ধ্বংস হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেব এখানে যাদবগণের বিনাশ স্মরণ করিয়া বহু ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনদিন অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা দ্বারকা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ১লা আশ্বিন তাঁহারা দ্বারকায় পৌছিলেন। দ্বারকাতে গিয়া চৈতন্যদেব পরমানন্দে মগ্ন হইলেন। তিনবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া মন্দিরে প্রবেশকরতঃ বিগ্রহের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। তাঁহার নয়ন দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। ভাবে মত্ত হইয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন। দ্বারকাবাসিগণ আগন্তুক সন্ন্যাসীর

অপূর্ব্ব ভাবাবেশ দেখিয়া মোহিত হইলেন। পাণ্ডারাও তাঁহার বহু সম্মান করিলেন। একপক্ষ কাল দ্বারকায় বাস করিয়া তিনি নীলাচল ফিরিতে সঙ্কল্প করিলেন। পথে বিদ্যানগর হইতে রায় রামানন্দকে সঙ্গে লইবার ইচ্ছা। আশ্বিনের শেষদিনে তাঁহারা বরোদা নগরীতে ফিরিলেন। বরোদা হইতে যোলদিনে নর্ম্মদার তীরে পৌঁছিলেন। এখান হইতে ভর্গদেব শ্রীচৈতন্যের নিকট বিদায় লইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন। চৈতন্যদেব, রামানন্দ, গোবিন্দচরণ ও গোবিন্দ-দাসের সঙ্গে নর্ম্মদার তীরে তীরে চলিলেন। নর্ম্মদার তীরে দোহদ ও কুক্ষী নামক দুইটী স্থানে এক এক রাত্রি যাপনের উল্লেখ আছে। কুক্ষী গ্রামে উপস্থিত হইয়া এক ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র। অতিথি-সৎকারের সঙ্গতি ছিল না। রাত্রিতে চারিজন অতিথি সমাগত দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন। চৈতন্যদেব তাহা জানিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "যিনি জীবন দিয়াছেন তিনিই আহার দিবেন। মানুষ ভ্রমে মনে করে তাহারাই কর্ত্তা; আপনি কিছু ভাবিবেন না।" এই বলিয়া তিনি হরিনাম-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময়ে একজন বৈশ্য কিছু দুগ্ধ ও চিনি হস্তে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আপনার গৃহদেবতা, লক্ষ্মীজনার্দ্দন কাল রাত্রে আমাকে স্বপ্ন দিয়াছেন যে, তাঁর পায়স খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে। সেইজন্য এই দুগ্ধ ও চিনি আনিয়াছি।" ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। গোবিন্দদাস আরও লিখিয়াছেন যে, বৈশ্য শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখিয়া একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল, ইনিই রাত্রে আমার নিকট স্বপ্নে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, দুগ্ধ ও চিনি পাইয়া ব্রাহ্মণ চৈতন্যদেবকে পায়স রন্ধন করিতে বলিলেন। রন্ধনের পরে

অতিথি ও গৃহস্থ পরম পরিতোষসহকারে ভোজন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে চৈতন্যদেব সঙ্গিগণের সঙ্গে গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন। সেই বৈশ্য নিকটেই প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চৈতন্যদেবকে দেখিয়া তাঁহার চরণে পড়িল এবং তাঁহাকে দয়া করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধে অনুরোধ করিল। চৈতন্যদেব তাঁহাকে নিরন্তর হরিনাম করিতে উপদেশ দিলেন। বৈশ্যও সেইদিন হইতে সংসারে বিরাগী হইয়া ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত হইলেন।

অতঃপর তাঁহারা একটী অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে লোকালয় ছিল না। দুইদিন ক্রমাগত বনপথ দিয়া চলিয়া তাঁহারা আমঝোরা নগরে উপস্থিত হইলেন। পথে দুইদিন আহার হয় নাই। সঙ্গিগণ ক্ষুধায় ছটফট করিতেছিল, কিন্তু চৈতন্যদেব নির্ব্বিকারচিত্তে একস্থানে বসিয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন। গোবিন্দদাস নগরে ভিক্ষা করিয়া দুই সের আটা লইয়া আসিলেন। চৈতন্যদেব তাহা দিয়া ষোলখানি রুটী প্রস্তুত করিয়া সঙ্গিগণকে ভাগ করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে একটী দরিদ্রা স্ত্রীলোক একটী সন্তান লইয়া উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা চাহিল। শ্রীচৈতন্যদেব আপনার ভাগের রুটী কয়খানি তাহাদের দিয়া নিজে অনাহারে রহিলেন। রাত্রিতে গোবিন্দদাস কিছু ফল সংগ্রহ করিয়া আনিল। তাহা দ্বারা চৈতন্যদেব ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। নিকটে লক্ষ্মণকুণ্ড নামে এক কুণ্ড আছে শুনিয়া তাঁহারা সেখানে স্নান করিতে গেলেন। নগরপ্রান্তে পর্ব্বতের মধ্যে অতি সুন্দর কুণ্ড। ইহা অতি গভীর এবং ইহার জল অতি সুশীতল। প্রবাদ, বনবাসকালে সীতাদেবী পিপাসায় অতি কাতর হইলে লক্ষ্মণ পর্ব্বতগাত্রে বাণ মারিয়া এই কুণ্ড উদ্ঘাটিত করেন। কুণ্ডের শীতলজলে স্নান করিয়া তাঁহারা তৃপ্ত হইলেন। পরদিন তাঁহারা বিন্ধ্যগিরির উপরিস্থিত মন্দুরানগরে

উপস্থিত হইলেন। বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করিয়া নর্ম্মদার তীরে তীরে চলিতে লাগিলেন। তিনদিনে তাঁহারা দেবঘর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া গ্রামের প্রান্তরে একটী বৃক্ষতলে বসিলেন; গোবিন্দদাস গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া কিছু আতপ-তণ্ডুল পাইলেন। সঙ্গীগণ রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন। অন্ন প্রস্তুত হইলে সকলে আহার করিলেন। সন্ন্যাসীর আগমন সংবাদ পাইয়া গ্রামের লোকেরা একে একে তাঁহাকে দেখিতে আসিল। ইহাদের মধ্যে একজন কুষ্ঠরোগী ছিল। তাহার নাম আদিনারায়ণ। আদিনারায়ণ ধনী বণিক; কিন্তু রোগের জন্য সর্ব্বদাই ক্ষুণ্ণ। সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ভক্তিভাব দেখিয়া রোগমুক্তির জন্য তাঁহার চরণে কাঁদিয়া পড়িল। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে প্রসাদ ভক্ষণ করিতে দিলেন। গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া আদিনারায়ণের ব্যাধি দূর হইল। আদিনারায়ণের রোগমুক্তি দেখিয়া আরও অনেক রোগী আসিয়া জুটিল। শ্রীচৈতন্যদেব তখন সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। আদিনারায়ণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। চৈতন্যদেব তাহাকে ফিরিয়া গৃহে গিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে বলিলেন। এখান হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে শিবানী নগর। তাঁহারা দুইদিনে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবানীর পূর্ব্বভাগে মহল পর্ব্বত। তাহা দেখিয়া তাঁহারা চণ্ডীপুর নগরেতে উপস্থিত হইলেন। এখানে চণ্ডীর মন্দির ছিল। তাহা দর্শন করিয়া তাঁহারা রায়পুর আসিয়া পৌছিলেন। রায়পুর পৌছিতে কতদিন লাগিয়াছিল তাহা নির্দ্দেশ করা নাই। ইহা যদি মধ্যপ্রদেশের বর্ত্তমান রায়পুর হয়, তাহা হইলে সেখানে পৌছিতে নিশ্চয়ই অনেকদিন লাগিয়াছিল। রায়পুর হইতে শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্যানগরে গমন করিয়া রায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। স্থির হইল কয়েকদিন পরে রামানন্দ রায় নীলাচলে

আসিবেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া অগ্রেই চলিলেন। বিদ্যানগর হইতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ছয়দিনে রত্নপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। রত্নপুর ছাড়িয়া তাঁহারা সম্মুখে মহানদী পাইলেন। নদীর তীরে তীরে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা স্বর্ণগড় নামক একটী স্থানে উপস্থিত হইলেন। গড়টী অতি মনোরম। শাণ্ডীশ্বর নামে সেখানকার রাজা পরম ধার্ম্মিক। শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন সংবাদ পাইয়া তিনি তাঁহার নিকটে আসিয়া জোড়হস্তে তাঁহার গৃহে অতিথি হইবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব রাজগৃহে গেলেন না; কিন্তু তাঁহার ইঙ্গিতে গোবিন্দদাস রাজার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। রাজার আদেশে বহু খাদ্যদ্রব্য আনীত হইল। শ্রীচৈতন্যদেব বৃক্ষতলে রন্ধন করিয়া সঙ্গীগণের সঙ্গে আহার করিলেন। অপরাহ্নে রাজা গৃহে ফিরিয়া গেলেন। চৈতন্যদেব বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহারা সম্বলপুরে পৌছিলেন। সম্বলপুরে রাত্রিবাস করিয়া পরদিন দশক্রোশ-দূরস্থিত ভ্রমরা নগরে আসিলেন। এখানে বহু বৈষ্ণবের বাস ছিল। সেখানে চারিদিন অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা প্রতাপনগরী এবং দাসপাল নামক স্থানে পৌছিলেন। উভয়স্থানেই স্থানীয় লোকদিগকে হরিনামে মত্ত করিয়াছিলেন। দাসপাল হইতে একদিনে রসালকুণ্ড নামক একস্থানে উপস্থিত হন। সম্ভবতঃ ইহা বর্ত্তমান গন্‌জাম্ জেলার অন্তর্গত রসালকুণ্ড। শ্রীচৈতন্যদেব এখানে তিনদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস এখানকার লোকদিগকে ভক্তিহীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে এখানেও ভক্তির বন্যা বহিয়াছিল। রসালকুণ্ডেতে এক জন মাড়ুয়া ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার অল্পবয়স্ক পুত্র শ্রীচৈতন্যদেবের অতিশয়

অনুরাগী হইল। ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে মারিবার জন্য লাঠি হস্তে উপস্থিত হইয়া বলিল, "ভণ্ড সন্ন্যাসী, তুমি আমার একমাত্র পুত্রকে ভুলাইয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে, আমি তোমাকে সমুচিত শাস্তি দিব।" শ্রীচৈতন্যদেব হাসিয়া বলিলেন, "আমাকে যদি মারিবে, তাহা হইলে তোমাকে হরিনাম লইতে হইবে। যতবার হরিনাম করিবে ততবার মারিতে পাইবে।" এই বলিয়া তিনি পৃষ্ঠ পাতিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণের পুত্র পিতাকে ক্ষমা করিবার জন্য চৈতন্যদেবকে কাতরে অনুনয় করিতে লাগিল; বলিল, "আমার পিতার অপরাধ লইবেন না, তাঁহাকে নরক হইতে রক্ষা করুন।" চৈতন্যদেব বলিলেন, "যে বংশে তোমার মত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে বংশে কাহারও নরকে যাইবার ভয় নাই।" ততক্ষণে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর আশ্চর্য্য ক্ষমা দেখিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার হাত হইতে লাঠী পড়িয়া গেল। সে চৈতন্যদেবের চরণে পড়িয়া আপনার দুর্ব্যবহারের জন্য বার বার ক্ষমতা প্রার্থনা করিতে লাগিল। চৈতন্যদেব তাঁহাকে তুলিয়া কর্ণে হরিনাম মন্ত্র দিলেন। ব্রাহ্মণের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এইরূপে ব্রাহ্মণের উদ্ধার করিয়া চৈতন্যদেব রসালকুণ্ড হইতে ঋষিকুল্যা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন।

ঋষিকুল্যা নদীতীরে অনেক ঋষি বাস করিতেন। তাঁহারা পরম সমাদরে শ্রীচৈতন্যদেবকে অভ্যর্থনা করিলেন। এখানে তিনি তিনদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। ঋষিকুল্যা আসিলেই পুরীতে তাঁহার আগমন-সংবাদ পৌছিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব আলালনাথ পৌছিতেই ভক্তগণ সেখানে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। গোবিন্দদাস তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে

গদাধর ও মুরারি ছুটিয়া আসিলেন। খঞ্জনআচার্য্য খোঁড়া হইলেও মনের আবেগে অনেকের পূর্ব্বেই আসিয়া পৌছিলেন। তৎপরেই সার্ব্বভৌম ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে আসিলেন। ক্রমেই নরহরি, হরিদাস, রামদাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি বহু ভক্তগণ আসিয়া মিলিলেন। বহুদিনের বিচ্ছেদের পরে ভক্তসম্মিলনে সেদিন যে আনন্দধারা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা অনুমান করা যায়, বর্ণনা দুঃসাধ্য। ভক্তদল তাঁহাকে ঘেরিয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, চারিদিকে মহা হরিধ্বনি উঠিল। অবশেষে ভক্তগণ তাঁহাকে লইয়া শ্বেত, নীল বহু পতাকা উড়াইয়া পুরীর দিকে অগ্রসর হইলেন। মাঘের তৃতীয় দিবসে অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যদেব পুরী পৌছিলেন। পুরী পৌছিয়া সর্ব্বাগ্রে সদলে মন্দিরে গেলেন। জগন্নাথ দর্শন করিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে দরদরধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। গাত্রে স্বেদ ও পুলক দেখা দিল। ক্রমে তিনি অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম তখন তাঁহাকে কোলে লইলেন। কতক্ষণ পরে চেতনা হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে লইয়া কাশীমিশ্রের গৃহে আসিলেন।

বৈশাখের প্রথমে তিনি পুরী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং মাঘের প্রথমে তিনি পুরী প্রত্যাগমন করেন। চৈতন্য চরিতামৃতকারের মতে দাক্ষিণাত্যভ্রমণে দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। এই গণনা ঠিক হইলে দ্বিতীয়বৎসর মাঘমাসে তিনি পুরী ফিরিয়া আসেন। তাহা হইলে মাত্র এক বৎসর নয় মাস বাহিরে ছিলেন এত অল্প দিনে এত দীর্ঘ পর্য্যটন সম্ভব কিনা সন্দেহের বিষয়।

পুরী প্রত্যাগমন ও মণ্ডলী গঠন।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব পুরী আসিয়াছেন শুনিয়া বহুলোক দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম একে একে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন; ইতিপূর্ব্বে তিনি অল্প যে কয়েকদিন পুরীতে ছিলেন সম্ভবতঃ বেশী লোকের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই; দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্য পর্য্যটন করিয়া আসায় তাঁহার খ্যাতি বাড়িয়া গিয়া থাকিবে, সুতরাং সকলে আগ্রহের সহিত তাঁহাকে দেখিতে আসিবে, ইহা স্বাভাবিক। উৎকলের রাজা স্বয়ং প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য গমনের অল্প দিন পরেই তিনি লোক মুখে শুনিয়াছিলেন যে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে এক জন অদ্ভুত গৌড়ীয়সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। এই সংবাদে কৌতূহলপরবশ হইয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "শুনিলাম তোমার গৃহে এক জন অদ্ভুত সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করাও।" সার্ব্বভৌম বলিলেন, "ইহা অতি দুষ্কর কার্য্য। তিনি পরম বিরক্ত সন্ন্যাসী, রাজদর্শন করিবেন কিনা সন্দেহ। বিশেষতঃ সম্প্রতি তিনি দক্ষিণযাত্রা করিয়াছেন।" ইহাতে রাজার ঔৎসুক্য আরও বাড়িয়া গেল; তিনি বলিলেন, "সন্ন্যাসী ফিরিলে একবার তাঁহাকে দেখাইতেই হইবে।" সার্ব্বভৌম আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তিনি ফিরিলে আমি যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখিব।" এই অবসরে সার্ব্বভৌম পুরীতে চৈতন্যদেবের অবস্থানের জন্য একটি উপযুক্ত স্থানের কথাও বলিলেন।

স্থানটী নির্জ্জন হওয়া আবশ্যক। অথচ জগন্নাথের মন্দির হইতে বেশী দূর না হয়।" রাজা তাঁহার পুরোহিত কাশীমিশ্রের বাটিতে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তদনুসারে সার্ব্বভৌম চৈতন্যদেবকে কাশীমিশ্রের বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। এখন হইতে তিনি সেখানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কাশীমিশ্র পরম সমাদরে তাঁহার সেবা করিতেন।

নিত্যানন্দ-প্রমুখ গৌড়ীয় ভক্তগণ সত্বরেই তাঁহার প্রত্যাগমন সংবাদ নবদ্বীপে প্রেরণ করিলেন। কাহার দ্বারা এই সংবাদ প্রেরিত হয়, সেই বিষয়ে মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দদাসের কড়চা অনুসারে শ্রীচৈতন্যের আদেশে গোবিন্দদাস স্বয়ংই নবদ্বীপ যান।

"গোবিন্দ বলিয়া মোরে ডাক দিয়া পাছে
যাইতে কহিলা মোরে আচার্য্যের কাছে॥
আজ্ঞা মাত্র পত্রসহ বিদায় লইয়া
শান্তিপুরে যাত্রা করি প্রণাম করিয়া॥ (কড়চা)

কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত মতে কালাকৃষ্ণদাস নামে এক ব্যক্তি চৈতন্যদেবের প্রত্যাগমন সংবাদ লইয়া নবদ্বীপে যান।

"তবে গৌড় দেশে আইলা কালা কৃষ্ণদাস
নবদ্বীপে গেলা তিঁহ শচী আই পাশ
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার
দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু কহে সমাচার।"

চৈঃ, চঃ, মধ্যলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যচরিতামৃত অনুসারে এই ব্যক্তি দক্ষিণভ্রমণে চৈতন্যদেবের সঙ্গী ছিল। ত্রিবাঙ্কুরে ভট্টমারিদের প্রলোভনে পড়িয়া চৈতন্যদেবকে পরিত্যাগ করিয়া যায়; অনেক বুঝাইয়া চৈতন্যদেব তাহাকে ফিরাইয়া

আনেন। পুরীতে পৌছিয়া ভক্তদের নিকট তাহার ব্যবহারের কথা বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিতে বলেন; ভক্তগণ পরামর্শ করিয়া তাহাকে গৌড়ে প্রেরণ করেন। আমাদের মনে হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় লোক মুখে শুনিয়া থাকিবেন যে, পুরীতে পৌছিয়া দক্ষিণ ভ্রমণের সঙ্গীকে গৌড়ে সংবাদ দিতে পাঠান হয়, তদনুসারে তিনি, কালা কৃষ্ণদাসের দ্বারাই গৌড়ে সংবাদ প্রেরিত হয় এইরূপ মনে করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যাবর্ত্তন-সংবাদে গৌড়-বাসী ভক্তগণের মধ্যে মহাআনন্দের তরঙ্গ উত্থিত হইল। তাঁহারা সকলে মিলিয়া পুরী যাত্রার সঙ্কল্প করিলেন। সম্মুখে রথযাত্রা, সেই সময়ে সকলে পুরী যাইবেন স্থির হইল। যথাসময়ে নানা স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে মিলিত হইলেন, পরে সকলে শচীমাতার অনুমতি লইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করতঃ পুরী যাত্রা করিলেন। এই যাত্রায় গৌড়বাসী দুই শত জন ভক্ত পুরী গিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে তাহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিদিগের নাম, উল্লিখিত হইয়াছে, যথা অদ্বৈতআচার্য্য, শ্রীবাসপণ্ডিত, বক্রেশ্বর বিদ্যানিধি, গদাধর পণ্ডিত, আচার্য্যরত্ন, পুরন্দরাচার্য্য, গঙ্গাদাস, শঙ্কর পণ্ডিত; মুরারি গুপ্ত, নারায়ণ পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, হরি ভট্ট, নৃসিংহানন্দ, বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ, গোবিন্দ, মাধব বসু এবং ঘোষ রাঘব পণ্ডিত, নন্দনাচার্য্য, শ্রীমান্ পণ্ডিত, শ্রীকান্ত নারায়ণ, শুক্লাম্বর, শ্রীধর, বিজয়, বল্লভসেন, পুরুষোত্তম, সঞ্জয়, কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ খাঁ, রামানন্দ, মুকুন্দ দাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন, খণ্ড বাসী চিরঞ্জীব ও সুলোচন।

ভক্তগণ সন্নিহিত হইয়াছেন শুনিয়া শ্রীচৈতন্যদেব স্বরূপদামোদর ও গোবিন্দ দাসের হস্ত দিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য মাল্য ও চন্দন প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সমাদর করিয়া

কাশীমিশ্রের গৃহাভিমুখে লইয়া চলিলেন। পথে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁহাদের মিলন হইল, তখন ভক্তদল আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। একে একে সকলে নমস্কার আলিঙ্গনাদি করিয়া একত্রে কাশীমিশ্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য দেবের ইচ্ছানুসারে রাজা প্রতাপরুদ্রের আদেশে, কাশীমিশ্র সকলের জন্য যথাযোগ্য বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা করিলেন। সেদিন সকলে স্নানান্তে একত্রে কাশীমিশ্রের গৃহে আহার করিলেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদের লইয়া মন্দিরে আরতি দেখিতে গমন করিলেন এবং তৎপরে মন্দির-প্রাঙ্গণে কীর্ত্তন হইল। ভক্তগণ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ভাবে মত্ত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে নৃত্য করিলেন। পুরীর লোকেরা সেই অদ্ভুত কীর্ত্তন দেখিয়া মুগ্ধ হইল। গৌড়ীয় ভক্তগণ যতদিন পুরীতে ছিলেন, প্রতিদিন এইরূপ নাম সঙ্কীর্ত্তন হইত।

গৌড়ীয় ভক্তগণের আগমনের কয়েকদিন পরে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপস্থিত হইল। রথযাত্রার সময় প্রতিবৎসর জগন্নাথদেবের বিগ্রহকে রথে করিয়া পুরীর মন্দির হইতে গুণ্ডিচামন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। দুই একদিন পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেব কাশীমিশ্র, সার্ব্বভৌম এবং মন্দিরের পড়িছাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমার এক ইচ্ছা আছে, অনুগ্রহ করিয়া তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। আমি ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া স্বহস্তে গুণ্ডিচামন্দির পরিষ্কার করিব।" তাঁহারা বলিলেন, "একাজ আপনার অযোগ্য হইলেও আপনার যাহা ইচ্ছা তাহা অবশ্যই সাধিত হইবে। বিশেষতঃ, মহারাজার আদেশ আছে, আপনি যাহা বলিবেন তাহাই পালন করিতে হইবে।" পড়িছার আদেশে শত সম্মার্জ্জনী ও নূতন কলস আনিত হইল। পরদিন প্রভাতে চৈতন্যদেব

ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া মহা উৎসাহে গুণ্ডিচামন্দির পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, দেখা যাক! কে কত আবর্জ্জনা বাহির করে। দেখা গেল, সর্ব্বাপেক্ষা তিনিই অধিক আবর্জ্জনা বাহির করিয়াছেন। তৎপরে সরোবর হইতে কলসী কলসী জল আনিয়া মন্দির ধৌত করিতে আরম্ভ করা হইল। সর্ব্বশেষে বস্ত্রদ্বারা মন্দির মুছা হইল। সমুদয় কার্য্যসমাপনান্তে শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তগণ সঙ্গে স্নান ও জলক্রীড়া করিলেন। ইতিমধ্যে বাণীনাথ ও কাশীমিশ্র জগন্নাথের প্রসাদ বহু অন্ন ব্যঞ্জন তথায় আনয়ন করিয়াছিলেন। স্নানান্তে সকলে মহাআনন্দে তাহা ভোজন করিলেন।

রথযাত্রার দিন রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই চৈতন্যদেব ভক্তগণ সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করিয়া মন্দিরের দ্বারে আগমন করিলেন। পাণ্ডাগণ ধরাধরি করিয়া জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা মূর্ত্তি তিনখানি রথে তুলিলেন। বহুলোক রথ টানিতে লাগিল। চৈতন্যদেব ভক্তগণ সঙ্গে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে রথের সঙ্গে অগ্রসর হইলেন। গৌড়ীয় ভক্তদলকে সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া গগনভেদী সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইল। এই সম্প্রদায় বিভাগেই শ্রীচৈতন্যদেবের অসাধারণ কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কে কোন্ দলে কি কাজ করিবেন, তিনি স্বয়ং তাহা স্থির করিয়া দিলেন। স্বরূপদামোদরকে প্রথম দলের নেতা মনোনীত করিলেন। তাঁহার সঙ্গে দামোদর, নারায়ণ, দত্তগোবিন্দ, রাঘবপণ্ডিত ও শ্রীগোবিন্দানন্দ এই পাঁচজনকে গায়ক নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে এই দলে নৃত্য করিতে আদেশ করিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত দ্বিতীয় দলের নেতা হইলেন। তাঁহার সঙ্গে গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান, শুভানন্দ ও শ্রীরাম পণ্ডিত এই পাঁচজন গায়ক এবং নিত্যানন্দ নর্ত্তক মনোনীত হইলেন। তৃতীয় দলে মুকুন্দ নেতা এবং

বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারী, শ্রীকান্ত ও বল্লভসেন গায়ক হইলেন। এই দলের সঙ্গে হরিদাসঠাকুরের প্রতি নাচিবার আদেশ হইল। চতুর্থদলে মূলগায়ক গোবিন্দ ঘোষ, এবং হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব, মাধবও বাসুদেব ঘোষ এই পাঁচজন সঙ্গী মনোনীত হইলেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত ইহাঁদের সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কুলীন গ্রামবাসী ভক্তদলের আর একটী পৃথক সম্প্রদায় হইল। তাঁহাদের সঙ্গে রামানন্দ ও সত্যরাজখাঁ নৃত্য করিতে লাগিলেন। শান্তিপুরের বৈষ্ণবগণ আর একটী সম্প্রদায় গঠন করিলেন। এই দলে অদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবগণদ্বারা আর একটী সম্প্রদায় গঠিত হইল। নরহরি সরকার এই দলে নৃত্য করিতে লাগিলেন। চারি সম্প্রদায় রথের সম্মুখে; দুই সম্প্রদায় দুই পার্শ্বে এবং এক সম্প্রদায় পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব কখনও এদলে, কখনও ওদলে, এরূপে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুইখানি খোল এবং ছয়খানি করতাল বাজিতে লাগিল। সমাগত যাত্রীদল এই অদ্ভুত সংকীর্ত্তন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র যতদূর সম্ভব নিকটে থাকিয়া সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ইনি অতিশয় ধর্ম্মানুরাগী লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। স্বহস্তে সম্মার্জ্জনী লইয়া অগ্রে অগ্রে পথ পরিষ্কার করিতে ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব রাজার ভক্তি দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন সংবাদ পাইয়াই রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার সঙ্গে মিলনের জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দ্বারা এই ইচ্ছা চৈতন্যদেবের গোচর করাইয়া ছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব সন্ন্যাসীর রাজদর্শন নিষেধ বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তৎপরে রায় রামানন্দ আসিলে তাঁহার দ্বারাও পুনরায় এই

প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। বার বার বাধা পাইয়াও চৈতন্যদেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি বাড়িয়াই গিয়াছিল। তিনি চৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্তগণের পুরীতে অবস্থানের সকল প্রকার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য অমাত্যদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন। রথযাত্রার দিনে তাঁহার নিকটে থাকিয়া চৈতন্যদেবের নৃত্যদর্শন করিতে ছিলেন। একবার প্রেমাবেশে শ্রীচৈতন্যদেবকে পড়িতে দেখিয়া নিকটে গিয়া তাঁহাকে বক্ষেধারণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব জানিতে পারিয়া রাজঅঙ্গস্পর্শ হইল বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্র তাহাতে লজ্জিত ও ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু সার্ব্বভৌম তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "প্রভু আপনার উপর সন্তুষ্টই হইয়াছেন, আপনি চিন্তিত হইবেন না।" দ্বিপ্রহরের সংকীর্ত্তনের শ্রমে ক্লান্ত হইয়া বৈষ্ণবগণ পথিপার্শ্বস্থ উপবনে বিশ্রাম করিতে গেলেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমাবেশে ও শ্রান্তিতে সংজ্ঞাহীন হইয়া উদ্যান গৃহের বারান্দায় পড়িয়াছিলেন। সেই সময়ে সার্ব্বভৌমের ইঙ্গিতে রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার চরণ ধরিয়া ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিলেন। শ্লোক শুনিয়া চৈতন্যদেব আনন্দে বিভোর হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আজ তুমি আমাকে যে অমূল্য রতন দিলে, তাহার প্রতিদান দিবার আমার কিছু নাই।" এতদিনে রাজা প্রতাপরুদ্রের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। তিনি চৈতন্যদেবের আলিঙ্গন পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব রথযাত্রার আট দিন এইরূপে ভক্তগণ সঙ্গে গুণ্ডিচামন্দিরে নৃত্য ও নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলি করিলেন।

গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রার পরেও চারিমাস নীলাচলে অবস্থান

করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গসুখ ভোগ করিলেন। প্রতিদিন প্রভাতে উপলভোগের পরে চৈতন্যদেব ভক্তগণ সঙ্গে সমুদ্রে স্নান ও জগন্নাথদর্শন করিতেন। তৎপরে হরিদাসের কুটীরে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া নামসংকীর্ত্তন ও ধর্ম্মালাপ করিতেন। সন্ধ্যাকালে মন্দিরে সংকীর্ত্তন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন, বিজয়া-দশমী, রাসযাত্রা প্রভৃতি বিশেষদিনে বিশেষ উৎসব হইত। উত্থান দ্বাদশীর পরে চৈতন্যদেব গৌড়ীয় ভক্তগণকে দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বিদায়ের পূর্ব্বে প্রত্যেক ভক্তকে পৃথক পৃথক সম্ভাষণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যকে বলিলেন, "গৃহে গিয়া আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ কর।" বিশেষভাবে নিত্যানন্দের সঙ্গে নিভৃতে কথোপকথন হইয়াছিল। কি কথা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ নাই। তবে বিশেষভাবে তাঁহার উপরে বঙ্গদেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য ভক্তগণকে বৎসর বৎসর রথযাত্রার সময় নীলাচলে আসিতে অনুরোধ করিলেন। নিত্যানন্দকে বলিলেন, 'তুমি গৌড়দেশে থাকিয়াই ধর্ম্ম প্রচার কর'। শ্রীবাস পণ্ডিতের হস্তে শচীমাতার জন্য মহাপ্রসাদ ও বস্ত্রখণ্ড দিয়া তাঁহাকে অনেক প্রবোধবাক্য বলিয়া পাঠাইলেন। ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যের আসন্ন বিচ্ছেদে কাঁদিতে কাঁদিতে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনিও তাঁহাদের বিরহে কাতর হইলেন। কেবল মাত্র গদাধর পণ্ডিত, পরমানন্দপুরী, জগদানন্দ, স্বরূপদামোদর, দামোদরপণ্ডিত, গোবিন্দ ও কাশীশ্বর এই কয়জন পুরীতে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে নিগূঢ় যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। গদাধর পণ্ডিতের সহিত প্রথম বয়স হইতেই পরিচয়, ক্রমে সেই সম্বন্ধ অতি গভীর ও মধুর হইয়াছিল; তিনি অতি সুকণ্ঠ ছিলেন। নিত্য ভাগবত পাঠ

করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে শুনাইতেন। তিনিও গদাধরের মুখে ভাগবত শুনিতে অতিশয় ভালবাসিতেন। পরমানন্দপুরীর সঙ্গে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে প্রথম পরিচয় হয়; তখনই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহার সঙ্গে একত্র বাসের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া তাঁহাকে পুরীতে অবস্থানের জন্য অনুরোধ করিলেন। পুরী গোঁসাই তখন গঙ্গাস্নানের জন্য বঙ্গদেশে আগমন করিতেছিলেন; নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের পুরীপ্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে নীলাচলে আসেন এবং তখন হইতে শেষ পর্য্যন্ত তথায় শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে একত্রে বাস করিয়া গভীর ধর্ম্মালোচনায় দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। স্বরূপদামোদরের সঙ্গেও প্রথম জীবন হইতে পরিচয়; তখন তাঁহার নাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য্য। তিনি নবদ্বীপের অধিবাসী; নবদ্বীপের বৈষ্ণবদলের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্টযোগ ছিল। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর পুরুষোত্তমও গৃহত্যাগ করেন এবং কাশীতে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। বোধহয় সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তিনি ভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করেন; কারণ লিখিত আছে, গুরুর আদেশে তিনি বেদান্ত পাঠ করেন এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন; এবং চৈতন্যদেবের সঙ্গে পুনর্ম্মিলনের পরে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। চিরদিনই তিনি অনাসক্ত এবং গভীর জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু বেদান্ত ধর্ম্মে তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিপ্রচারের সংবাদ পাইয়া গুরুর অনুমতি লইয়া পুরীতে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং তদবধি তাঁহার সন্নিধানে থাকিয়া ভক্তিসাধনে জীবন অতিবাহিত করিলেন। বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় স্বরূপ বলেন।

"গুরুঠাঁঞি আজ্ঞা মাগি আইল নীলাচলে।
রাত্রি দিনে কৃষ্ণ প্রেম আনন্দ বিহ্বলে॥
পাণ্ডিত্যের অবধি, বাক্য নাহি কার সনে।
নির্জ্জনে রহেন সব লোক নাহি জানে॥
কৃষ্ণরস তত্ত্ব বেত্তা, দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ॥"

চৈঃ, চঃ, মধ্যলীলা, ১০ম পরি

স্বরূপদামোদর চৈতন্যদেবের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়াছিলেন। কেহ কোন গ্রন্থ বা সঙ্গীত রচনা করিয়া চৈতন্যদেবকে শুনাইতে আসিলে অগ্রে স্বরূপদামোদর অনুমোদন না করিলে তাঁহার গোচর হইত না। তিনি অতি সুগায়কও ছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহার কণ্ঠে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গীতাবলী শ্রবণ করিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। পুরী অবস্থানকালে চৈতন্যদেবের আর একজন নিকট সঙ্গী ছিলেন, ভৃত্য গোবিন্দ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, চৈতন্যচরিতামৃতানুসারে ইনি পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য ছিলেন। ঈশ্বরপুরী মৃত্যুকালে তাহাকে আদেশ করেন, তুমি পুরীতে গিয়া চৈতন্যের সেবা কর। একথা আমাদের নিকট সমীচীন মনে হয় না; আমাদের ধারণা, ইনি কড়চার রচয়িতা এবং দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গী গোবিন্দ কর্ম্মকার। গোবিন্দ চৈতন্যদেবের অতি অনুরক্ত ও প্রিয় অনুচর ছিলেন। পুরীতে অবস্থান কালে তিনি তাঁহার সেবা ও সকলপ্রকার কার্য্য সমাধান করিয়া-ছিলেন। গৌড়ের ভক্তদলের মধ্যে এক ব্যক্তি পুরীতে রহিয়া গেলেন, তিনি হরিদাসঠাকুর। কিন্তু যবনকুলজাত বলিয়া তিনি সর্ব্বদা চৈতন্যদেবের নিকটে থাকিতে পারিতেন না। নগরের বাহিরে এক

নির্জ্জন কুটীরে বাস করিতেন। চৈতন্যদেব প্রতিদিন সেখানে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন এবং ভৃত্য গোবিন্দের হস্তে তাঁহার খাদ্য প্রেরণ করিতেন।

এইসকল ভক্ত ব্যতীত ক্রমে উৎকলবাসী অনেক ব্যক্তিও চৈতন্য-দেবের অনুরক্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একজন প্রধান ছিলেন। চৈতন্যদেবের পুরী প্রত্যাগমনের কয়েকদিন পরেই রায় রামানন্দ পুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইনি অতি অসাধারণ লোক ছিলেন। ইঁহার কিছু পরিচয় পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। ক্রমে ইঁহার বিষয়ে আরও অনেক কথা জানা যাইবে। ভক্তিতত্ত্বে ইনি অসাধারণ পণ্ডিত ও রসজ্ঞ ছিলেন। চৈতন্যদেবের সহবাস লাভের জন্য উচ্চ রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এখন হইতে তিনি পুরীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রতি রজনীতে চৈতন্যদেব ইঁহার সঙ্গে ভক্তিতত্ত্ব আলোচনায় কালাতিপাত করিতেন। রাজা প্রতাপরুদ্র এই অবসরকালেও তাঁহার পূর্ব্ব বেতন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। রামানন্দ রায়ের পিতা ভবানন্দ রায় ও তাঁহার অপর চারিপুত্রও চৈতন্যদেবের অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বাণীনাথ পট্টনায়ক সর্ব্বদা চৈতন্যদেবের নিকটে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। রাজপণ্ডিত কাশীশ্বর মিশ্র, যাঁহার গৃহে চৈতন্যদেবের বাসস্থান হইয়াছিল, তিনি শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে ছিলেন। এতদ্ভিন্ন শিখি মাইতি, জগন্নাথের পূজারী জনার্দ্দন, কৃষ্ণদাস, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, মুরারি মাইতি, চন্দনেশ্বর প্রভৃতি বহুলোক চৈতন্যদেবের অনুরাগী হইলেন। এইরূপে নবদ্বীপের ন্যায় পুরীতেও এক সুবৃহৎ ভক্তদল গঠিত হইয়াছিল।

বৃন্দাবন গমন

বহুদিন হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের মনে বৃন্দাবন গমনের আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমরা দেখিয়াছি, গয়ায় হৃদয় পরিবর্ত্তনের পরে এবং পুনরায় সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর তিনি বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া বাহির হইয়াছিলেন; কিন্তু কোন কারণে দুইবারই অল্পদুর গিয়া ফিরিয়া আসেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণান্তর পুরীতে ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরেই সেই আকাঙ্ক্ষা পুনরায় জাগিয়া উঠে। চৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতামতে সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর নীলাচল আগমনের পঞ্চম বৎসরে বিজয়াদশমীর পরে চৈতন্যদেব গৌড় হইয়া বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া বাহির হন। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতের বষগণনা কিছু ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, তাঁহার মতে চৈতন্যদেব দুই বৎসর দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। তাঁহার সেই গণনা স্বীকার করিলেও তৃতীয় বৎসর রথযাত্রার সময়ে গৌড়ের ভক্তগণ পুরী আগমন করেন। সম্ভবতঃ, তখনও তাঁহার মনে বৃন্দাবন বা গৌড়গমনের সঙ্কল্প উদিত হয় নাই। কেননা, তাহা হইলে গৌড়ীয় ভক্তগণকে পুরী আসিতে নিষেধ করিতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞানুসারে রথযাত্রার সময়ে পুনরায় নীলাচল আগমন করেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার এই বৎসরকে তৃতীয় বৎসর বলিয়াছেন।

> "তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ
> নীলাচলে চলিতে সবার হইল মন।"

চৈঃ, চঃ, মধ্যলীলা, ১৬শ পরি।

কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতের গণনানুসারেও ইহা চতুর্থ বৎসরের কথা। যাহাহউক, পূর্ব্ব বৎসরের মত এই বৎসরেও, গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রার সময়ে পুরীতে আগমন করেন। এবার তাঁহাদের সঙ্গে অনেকগুলি রমণীও শ্রীচৈতন্যকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন। শ্রীবাসাচার্য্যের পত্নী, মালিনীদেবী, অদ্বৈতার্য্যের পত্নী, আচার্য্যরত্নের পত্নী প্রভৃতি বহু রমণী শ্রীচৈতন্যের প্রিয়-খাদ্যসকল সঙ্গে লইয়া পুরীতে আগমন করেন। তাঁহাদের ইচ্ছা স্বহস্তে এই সকল খাদ্য রন্ধন করিয়া চৈতন্যদেবকে আহার করান। নিত্যানন্দ নিষেধসত্ত্বেও এবারেও ভক্তদলের সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

"যদ্যাপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে,
নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রেমভক্তি প্রকাশিতে;
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে দেখিতে।"

চৈঃ, চঃ, মধ্যলীলা, ১৬শ পরি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এবারও চারিমাস কাল পুরীতে অবস্থান করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন, রথযাত্রা দর্শন, সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতিতে মহানন্দে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে অতিবাহিত করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় এবারও ভক্তগণ স্ব স্ব গৃহে চৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দিলেন। তবে এই বৎসর গৃহিণীগণ সঙ্গেথাকায় আহারাদির ব্যাপার অধিক বিস্তৃতাকারে ও আরও অধিক সুখের হইয়াছিল। চাতুর্ম্মাস্য সমাপ্ত করিয়া ভক্তগণ গৌড়ে ফিরিলেন। এবার পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গৌড়ে না ফিরিয়া পুরীতেই রহিয়া গেলেন। যাত্রাকালে নিত্যানন্দকে গৌড়ে থাকিয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। সম্ভবতঃ, ইহার পরে চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও রামানন্দের নিকট

বৃন্দাবন গমনের ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। এই সংবাদে তাঁহারা বিমর্ষ হইলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র সেই সংবাদ শুনিয়া কোনরূপে শ্রীচৈতন্য-দেবকে পুরীতে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতে বলিলেন। তাঁহারাও নানাছলে আজকাল করিয়া তাঁহার যাওয়ায় বিলম্ব করিয়া দিতে লাগিলেন।

"দুঁহে কহে রথযাত্রা কর দরশন ?
কার্ত্তিক মাস আইলে করিহ গমন'।
কার্ত্তিক আইলে কহে 'এবে বড় শীত,
দোলযাত্রা দেখি যাইও এই ভাল রীত'।
আজি কালি করি উঠায় বিবিধ উপায় ;
যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয়।"

চৈঃ, চঃ, মধ্যলীলা, ১৬শ পরি।

এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। প্রতি বৎসরই গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রার সময়ে নীলাচলে আসিতেন। পঞ্চম বৎসরে (চৈতন্যচরিতামৃতানুসারে) গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চারিমাস অপেক্ষা না করিয়া রথযাত্রার পরেই গৌড়ে ফিরিয়া গেলেন। এবার শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌম ও রামানন্দকে ডাকিয়া অতিশয় ব্যগ্রতাসহকারে গৌড়ে যাইবার আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। বলিলেন, "বহুদিন হইতে আমার বৃন্দাবন যাইবার আকাঙ্ক্ষা, আজকাল করিয়া তোমরা কাল বিলম্ব করিতেছ ; এবার আমাকে যাইতে অনুমতি দাও। আমি গৌড় হইয়া বৃন্দাবন যাইব ; গৌড়ে জননীকে দেখিয়া ও গঙ্গাস্নান করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিব।" তাঁহারাও এবার আর কিছু বলিতে পারিলেন না, কেবল বলিলেন, "এখন বর্ষা, চলিতে কষ্ট হইবে, বর্ষান্তে বিজয়া

দশমীর দিনে আপনি অবশ্য যাত্রা করিবেন।" এবং তদনুসারে যাত্রার আয়োজন চলিতে লাগিল।

নির্দ্ধারিত দিনে শ্রীচৈতন্যদেব পুরী হইতে যাত্রা করিলেন। উৎকলবাসী বহু ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। চৈতন্যদেব উৎকলবাসী বৈষ্ণবদিগকে প্রবোধ দিয়া ফিরাইলেন। রায়রামানন্দ পশ্চাতে দোলায় চড়িয়া আসিতে লাগিলেন। ভবানীপুরে পৌছিয়া যাত্রীদল সেদিনকার মত সেখানে বিশ্রাম করিলেন। বাণীনাথ পট্টনায়ক তাঁহাদের আহারের জন্য বহুপ্রসাদ প্রেরণ করিলেন। পরদিন প্রভাতে তাঁহারা পুনরায় অগ্রসর হইয়া ভুবনেশ্বর পৌছিলেন; এবং সেদিন সেখানে থাকিয়া পরদিন কটকে পৌছিলেন; সেখানে নগরপ্রান্তে একটি সুরম্য উদ্যানে তাঁহারা বিশ্রাম করিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র তখন কটকে ছিলেন; চৈতন্যদেবের আগমন সংবাদ পাইয়া সত্বরে আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার অঙ্গে স্বেদ,কম্প ও পুলক দেখা দিল; তিনি বার বার ভূমিতে পড়িয়া চৈতন্য-দেবের চরণে লুটাইতে লাগিলেন। তিনিও প্রতাপরুদ্রের প্রেমাবেশ দেখিয়া প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও বহুক্ষণ তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রায়রামানন্দ তখন রাজাকে শান্ত করাইয়া বসাইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব আশ্বাসবাক্যে প্রতাপরুদ্রকে প্রবোধ দিয়া গৃহে যাইতে বলিলেন। অগত্যা তিনি বাহিরে আসিয়া নিজ রাজ্যমধ্যে পথপার্শ্বস্থ সমুদয় রাজকর্ম্মচারীকে আদেশ করিলেন, সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যদেবের নির্ব্বিঘ্নে গমনের ব্যবস্থা করিতে আয়োজন করিবে। হরিচন্দন এবং রঙ্গরাজ নামক দুইজন উচ্চ কর্ম্মচারীকে পথের সমুদয় সুব্যবস্থা করিবার জন্য চৈতন্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব সন্ধ্যাকালে কটক

পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইবেন শুনিয়া নদীতীরে নূতন নৌকা রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং যেখানে নদী পার হইবেন, সেখানে একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন, এবং বলিলেন, "সেখানে আমি স্নান করিব এবং সেখানেই যেন আমার মৃত্যু হয়।"

"এক নব [illegible] আনি রাখ নদীতীরে ;
মহাপ্রভু স্নান করি যাইবেন নদী পারে।
তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি ;
নিত্য স্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি।"

চৈঃ, চঃ, মধ্যলীলা, ১৬শ পরি।

যথাসময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের গমন দর্শন করিবার জন্য রাজমহিষীগণ হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নদীতীরে আসিলেন। সন্ধ্যাকালে কটক হইতে বাহির হইয়া চৈতন্যদেব সঙ্গীগণ সমভিব্যাহারে চিত্রোৎপল নদীতে স্নান করিলেন, এবং জ্যোৎস্নালোকে নদী পার হইয়া চতুর্দ্বার নামক স্থানে পৌছিলেন এবং সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিলেন। নদী-তীর হইতে বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও পণ্ডিত গদাধরকে বিদায় দিলেন। পুরী হইতে যাত্রাকালে, পণ্ডিত গদাধরকে সঙ্গে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "তুমি নীলাচলে থাকিয়া, গোপীনাথের সেবা কর।" কিন্তু পণ্ডিত বলিলেন, "তুমি যেখানে থাক, সেই আমার নীলাচল।" তিনি কোনমতেই তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে বলিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। একাকীই যাইব।" এই বলিয়া একাকী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কটকে পৌছিয়া চৈতন্যদেব গদাধরকে নিকটে ডাকিয়া আনাইলেন এবং

পুনরায় পুরী ফিরিয়া যাইবার জন্য অনেক করিয়া বলিলেন। চিত্রোৎপল নদী-তীরে তাঁহার নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। গদাধর পণ্ডিত মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। মূর্চ্ছিত পণ্ডিতকে লইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে পুরী ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণের এই অদ্ভুত অনুরাগ দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়।

পরদিন প্রভাতে সদলে নদীতে স্নান করিলেন। ইতিমধ্যে রাজাজ্ঞায় পড়িছাগণ প্রসাদ আনয়ন করিলেন। নিত্য এইরূপ প্রসাদ আসিত; ভক্তগণ-সঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া চৈতন্যদেব অগ্রসর হইলেন। জাজপুরে পৌছিয়া রাজকর্ম্মচারীদিগকে বিদায় দিলেন; কিন্তু তখনও রায় রামানন্দ সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। রেমুনা পৌছিয়া তাঁহাকেও সনির্ব্বন্ধে বিদায় দিলেন, বিদায়কালে রামানন্দ মূর্চ্ছিত হইলেন; চৈতন্যদেব তাঁহার মূর্চ্ছিত দেহ লইয়া ক্রন্দন করিলেন ও সংকল্পে হৃদয় বাঁধিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। এখন তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা থাকিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ইঁহারা প্রধান:—পরমানন্দ পুরী, স্বরূপদামোদর, জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, হরিদাস ঠাকুর, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথাচার্য্য, পণ্ডিত দামোদর, রামাই এবং নন্দাই।

ক্রমে তাঁহারা উৎকলরাজ্যসীমায় উপস্থিত হইলেন; এখান হইতে যবন রাজার অধিকার। উৎকল রাজপ্রতিনিধি চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, ইহার পরে দুষ্ট যবনরাজার অধিকার। পথ অতি সঙ্কট-জনক, আপনি এখানে কিছুদিন অপেক্ষা করুন; আমি তাঁহার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করি। চৈতন্যচরিতামৃতরচয়িতা এইরূপ পথের নানা বিভীষিকা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, প্রতিবৎসরই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই পথে নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত করিয়াছেন; চৈতন্য-

দেবের মহিমা বৃদ্ধি করিবার জন্য ইহা বোধ হয় তাঁহার অতিরঞ্জন; যাহা হউক কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেরূপ লিখিয়াছেন, আমরা তাহারই বর্ণনা করিতেছি। চৈতন্যদেব যখন যবনরাজ্যসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে একজন যবন গুপ্তচর হিন্দুর বেশ ধরিয়া সেখানে আসিয়াছিল। সে এই অদ্ভুত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যবনরাজার নিকটে তাঁহার সংবাদ জানাইল। যবনরাজা তাঁহাকে দেখিবার জন্য কৌতূহলপরবশ হইয়া উৎকল রাজপ্রতিনিধির নিকট আপনার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে পাঠাইলেন। কর্ম্মচারী আসিয়া বলিল, "যবনরাজা সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন; আপনি যদি অনুমতি দেন, তিনি এখানে আসিয়া একবার দর্শন লাভ করেন।" উৎকলরাজপ্রতিনিধি যবনরাজাকে অল্প কয়েক জন সঙ্গী লইয়া আসিতে অনুমতি দিলেন। অনুমতি পাইয়া যবনরাজা শ্রীচৈতন্যের নিকটে আসিয়া নিজের যবনকুলে জন্মের জন্য অনেক ধিক্কার দিয়া চৈতন্যদেবের মহিমাকীর্ত্তন ও তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিলেন। এই সমুদয় অস্বাভাবিক ও কবিকল্পনা বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, ফলে যবনরাজ চৈতন্যদেব ও তাঁহার সঙ্গিগণকে নিজ রাজ্যমধ্য দিয়া নির্ব্বিঘ্নে যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এবং স্বয়ং তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া পিছলদা পর্য্যন্ত আসিলেন, পিছলদা হইতে চৈতন্যদেব সঙ্গীদের লইয়া নৌকা যোগে পানিহাটি পৌছিলেন। পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের বাসস্থান তিনি সসম্ভ্রমে চৈতন্যদেবকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। চৈতন্যদেবের আগমন সংবাদ পাইয়া বহু লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল। পানিহাটিতে এক রাত্রি বাস করিয়া চৈতন্যদেব পরদিন কুমারহট্টে আসিলেন; তখন সেখানে শ্রীবাসাচার্য্য বাস করিতেছিলেন। কোন্ সময়ে এবং কি কারণে শ্রীবাসাচার্য্য নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া কুমারহট্টে

আসেন তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ, শ্রীচৈতন্য-দেবের পরামর্শ অনুসারে তিনি কুমারহট্টে আসেন। চৈতন্যদেব তাঁহার ভক্তদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসাইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার আশ্চর্য্য কার্য্যকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কুমারহট্ট হইতে শিবানন্দ সেনের গৃহে এবং তথা হইতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা বিদ্যা-বাচস্পতির গৃহে গমন করেন। নির্ব্বিঘ্নে গঙ্গাস্নানের জন্য চৈতন্যদেব কয়েক দিন নিভৃতে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহার আগমন সংবাদ নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত ব্যপ্ত হইয়া পড়িল এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে এই সকল ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, এত লোকের জনতা হইয়াছিল যে বিদ্যাবাচস্পতি অনেক নৌকার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও নদী পার হইতে নৌকা না পাইয়া লোকে কলাগাছে চড়িয়া ও কলসী বুকে দিয়া নদী পার হইতে লাগিল। ক্রমে বহুলোক বাচস্পতির গৃহে চতুর্দ্দিকে জনতা করিয়া দাঁড়াইয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিল।

> "লক্ষকোটি লোক মহা হরিধ্বনি করে।
> হরিধ্বনি মাত্র শুনি সভার বদনে।
> আর বাক্য কেহ নাহি বোলে নাহি শুনে॥"

চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

হরিধ্বনি শুনিয়া চৈতন্যদেব উল্লাসে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং তিনিও হরি বলিয়া লোকের সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেখানে তখন মহা তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইল।

আজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ তুলিয়া।
'হরি' বলি সিংহনাদ করেন গর্জ্জিয়া॥
দেখিয়া প্রভুরে চতুর্দ্দিগে সর্ব্বলোকে।
'হরি' বলি নৃত্য সবে করেন কৌতুকে॥
দণ্ডবত হই সভে পড়ে ভূমিতলে।
আনন্দে হইয়া মগ্ন 'হরি হরি' বোলে॥
দুই বাহু তুলি সর্ব্বলোক স্তুতি করে,
উদ্ধারহ প্রভু! আমি-সব-পাপিষ্ঠেরে॥"
"ঈষত হাসিয়া প্রভু সর্ব্বলোক প্রতি।
আশীর্ব্বাদ করেন কৃষ্ণেতে হউ মতি॥
বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ সভার জীবন ধন প্রাণ॥"
সর্ব্ব লোক 'হরি' বোলে শুনি আশীর্ব্বাদ।
পুনঃপুনঃ সভেই করেন স্তুতিবাদ।"

চৈঃ, ভাঃ, অন্ত্যখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

চৈতন্যদেবকে দেখিবার জন্য লোকের এত আগ্রহ যে, কেহ বা বৃক্ষশাখায়, কেহ বা ঘরের উপরে চড়িল। চৈতন্যদেব একান্তে কয়েকদিন গঙ্গাস্নান করিবেন বলিয়া বাচস্পতির গৃহে আসিয়াছিলেন, বহুলোকের জনতা দেখিয়া সে আশায় নিরাশ হইয়া বাচস্পতিকে কিছু না বলিয়াই গোপনে রাত্রিকালে নিত্যানন্দ-প্রমুখ কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে কুলিয়া গমন করিলেন এবং মাধবদাস নামক এক ব্যক্তির গৃহে নিভৃতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রভাতে উঠিয়া বাচস্পতি তাঁহাকে না দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। অপরদিকে বাহিরে বহুলোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিল। তাহারা একবার

চৈতন্যদেবকে দেখাইবার জন্য বাচস্পতিকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "প্রভু যে কখন কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, আমি কিছুই জানি না," কিন্তু লোকে সে কথা বিশ্বাস করিল না। তাহারা মনে করিল, প্রভুকে ঘরে লুকাইয়া বাচস্পতি তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতেছেন। অনুনয় বিনয়ের পরে, তাঁহাকে তাঁহারা নিন্দা ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন। বাচস্পতি প্রমাদ গণিলেন, একে চৈতন্যদেবের বিরহে মন কাতর, তাহার উপরে লোকের গঞ্জনা। তিনি কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া তাঁহার কাণে কাণে চৈতন্যদেবের কুলিয়া গমনের সংবাদ দিল; তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া জনসঙ্ঘকে সেই কথা বলিলেন এবং তাহাদের লইয়া কুলিয়া যাত্রা করিলেন। কুলিয়াগ্রাম নবদ্বীপের অপর পার্শ্বে গঙ্গা তীরে; চৈতন্যদেবের কুলিয়া গমন সংবাদে সেখানে আরও অধিকতর জনতা হইল। এত লোকের সমাগমে কুলিয়া গ্রামে এক মেলা বসিয়া গেল। সমাগত জনসঙ্ঘের আহারাদির জন্য নানা স্থানের দোকানদারেরা আসিয়া খাদ্য-দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে লাগিল; অপরদিকে দলে দলে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব গৃহমধ্যে ছিলেন। বাচস্পতি আসিয়া প্রথমে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া চৈতন্যদেব একাকী তাঁহাকে ভিতরে ডাকিয়া লইলেন। সাক্ষাৎ পাইয়া বাচস্পতি তাঁহার চরণে অনেক স্তুতিবাদ করিলেন, অবশেষে বলিলেন, "আপনার দর্শন না পাইয়া লোকে আমাকে তিরস্কার করিতেছিল; তাহারা বলিতেছিল, আমি ক্রূরমতি, গৃহের ভিতরে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছি। আপনি একবার বাহিরে আসিয়া সকলকে দর্শন দিয়া আমার অপবাদ দূর করুন।" চৈতন্যদেব

বাচস্পতির কথায় ঈষৎ হাস্য করিয়া বাহিরে আসিলেন। অমনি সে বিপুল জনসঙ্ঘ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

"যেইমাত্র মহাপ্রভু বাহির হৈলা।
সেই সভে আনন্দসাগরে মগ্ন হৈলা॥
চতুর্দ্দিকে লোক দণ্ডবত হই পড়ে।
যার যেন মত স্ফুরে সেই স্তুতি পঢ়ে॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হরিধ্বনি করে।
ভাসিল সকল লোক আনন্দ সাগরে॥"

চৈঃ, ভাঃ, অন্ত্যখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

হরিধ্বনি শুনিয়া চৈতন্যদেব মত্ত হইয়া উঠিলেন। চারিদিকে কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া তাঁহার প্রাণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিল। এক একটী কীর্ত্তনীয়াদলের সঙ্গে তিনিও নাচিতে লাগিলেন। মহা প্রেমিক নিত্যানন্দও তাঁহার সঙ্গে ভাবে মত্ত হইয়া নৃত্য করিলেন। এইরূপে বিনা চেষ্টায় কুলিয়া গ্রামে এক মহোৎসব হইল। এইখানে চৈতন্যভাগবত-রচয়িতা দুইটী ক্ষুদ্র ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের একটী প্রধান শিক্ষা ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটী প্রধান তত্ত্ব বেশ উজ্জ্বল রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। বহুক্ষণ জনসঙ্ঘের সহিত সঙ্কীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করিয়া গৃহাভ্যন্তরে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সঙ্গে মন্ত্রণা করিতেছেন, এমন সময়ে এক জন লোক আসিয়া বলিল, "পূর্ব্বে আমি বহু বৈষ্ণব নিন্দা করিয়াছি এখন নিজ দোষ বুঝিতে পারিয়া অনুতাপ করিতেছি। কিসে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন।" তদুত্তরে শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, "যেমন যে মুখে বিষ পান করে তাহাতে

যদি অমৃত ভক্ষণ করে, তাহা হইলে বিষের দোষ নষ্ট হয়, তেমনি যে মুখে তুমি বৈষ্ণব নিন্দা করিয়াছ, সেইমুখে এখন বৈষ্ণবের মহিমা কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে তোমার অপরাধ মার্জ্জনা হইবে। আর যদি তুমি বৈষ্ণব নিন্দা না কর, অকপটে বৈষ্ণবের ভক্তি ও বৈষ্ণবের সেবা কর, তাহা হইলে বৈষ্ণব নিন্দার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।”

এইস্থানে আর একটি ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসের পূর্ব্বে যখন নবদ্বীপে বাস করিতেছিলেন সেই সময়ে দেবানন্দ নামে একজন ব্রাহ্মণ সেখানে বাস করিতেন। তিনি ধার্ম্মিক ও ভগবৎভক্ত হইলেও শ্রীচৈতন্যের প্রতি আস্থাবান ছিলেন না। সন্ন্যাসগ্রহণের পরে একবার চৈতন্যদেবের পরমভক্ত বক্রেশ্বরপণ্ডিত তাঁহার গৃহে বাস করেন; তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রতি দেবানন্দের অনুরাগ জন্মে। শ্রীচৈতন্যের কুলিয়া আগমন সংবাদ পাইয়া পণ্ডিত দেবানন্দ এই সময়ে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং পূর্ব্বাপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। চৈতন্যদেব স্বীয় স্বাভাবিক ঔদার্য্য গুণে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, বক্রেশ্বর পণ্ডিত পরম বৈষ্ণব। বৈষ্ণব সেবার গুণে আপনার হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে; আপনি পরম ভাগ্যবান। এই বলিয়া তিনি বৈষ্ণব সেবার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। বৃন্দাবনদাস এই সময়ে তাঁহার মুখে এই মহাবাক্য আরোপ করিয়াছেন।

> “ ‘কৃষ্ণ সেবা হইতেও বৈষ্ণব সেবা বড়’।
> ভাগবত আদি সর্ব্ব শাস্ত্রে কৈল দঢ় ॥ ”

চৈঃ, ভাঃ, অন্ত্যখণ্ড ৩য় অধ্যায়।

ইহা একটি গভীর কথা ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটি প্রধান তত্ত্ব। আমরা বর্ত্তমান সময়ে সচরাচর শুনিয়া থাকি মানবের সেবা ঈশ্বর সেবা। কিন্তু এখানে বৈষ্ণব অর্থাৎ ধার্ম্মিক লোকের সেবা ঈশ্বর সেবা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মে, শ্রীচৈতন্যের শিক্ষায় বৈষ্ণব নিন্দা অতি গর্হিত পাপ এবং বৈষ্ণব সেবা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

কুলিয়া গ্রামে সাতদিন অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন গমন উদ্দেশ্যে ভক্তদল সঙ্গে গঙ্গাতীরে তীরে অগ্রসর হইলেন এবং ক্রমে রাম-কেলি নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। চৈতন্যচরিতামৃতমতে শ্রীচৈতন্য-দেব কুলিয়া হইতে শান্তিপুর গমন ও তথায় অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে কয়েক দিন থাকিয়া শচীমাতার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তৎপরে রামকেলি যান। চৈতন্যভাগবতে কিন্তু একথার কোন উল্লেখ নাই। চরিতা-মৃতের বিবরণই ঠিক বলিয়া মনে হয়। রামকেলি গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণের বাস ছিল; শ্রীচৈতন্যদেব এখানে কয়েকদিন নিভৃতে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার আগমন-সংবাদ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। চৈতন্যদেব ভক্তগণ সঙ্গে নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দে মত্ত থাকেন, অঙ্গে স্বেদ, পুলক, কম্প প্রভৃতি মহাভাবের লক্ষণ প্রকাশ পায়; ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সমাগত লোক এই অদ্ভুত ভাব দেখিয়া ভক্তিতে ও সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া হরিধ্বনি করে। এমন কি, মুসলমানেরাও দূর হইতে তাঁহাকে শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করিয়া হরি হরি বলিত।

"হেন সে আনন্দ প্রকাশেন গৌররায়।
যবনেও বলে 'হরি' অন্যের কি দায়॥

যবনেও দূরে থাকি করে নমস্কার।
হেন গৌরচন্দ্রের কারুণ্য-অবতার॥"

চৈঃ, ভাঃ, অন্ত্যখণ্ড ৪র্থ অধ্যায়।

রামকেলি গ্রামের অনতিদূরে তৎকালীন বঙ্গরাজ্যের রাজধানী গৌড়নগর। নবাব সৈয়াদ হুসেন সাহ্ তথায় বাস করিতেন। কোতোয়াল তাঁহার নিকটে এই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। নবাব কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার বিষয়ে আরও জানিতে চাহিলেন। কোতোয়াল যাহা দেখিয়াছিল, সমুদয় যথাযথ বর্ণনা করিলেন; নবাব সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য কেশব খাঁ নামক একজন হিন্দু কর্ম্মচারীকে ডাকাইলেন। পাছে মুসলমান নবাব সন্ন্যাসীর প্রতি অত্যাচার করেন এই ভয়ে কেশব খান বলিলেন, "সে এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আসিয়াছে, তাহার আর কি সন্ধান করিবেন।" নবাব বলিলেন, "তাঁহাকে ভিক্ষুক বলিও না। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছে। আমার রাজ্যে আমার প্রজারা আমার কথা মানে এবং অনেকে তাহাও মানে না; কিন্তু সর্ব্বত্র লোকে ইঁহার সেবা করিতেছে। ইহা কি সামান্য ভিক্ষুকে সম্ভব হয়"? বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন যে, নবাব শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এ কথা কতদূর সত্য বলা যায় না, কিন্তু ইহা ঠিক যে নবাব শ্রীচৈতন্যের প্রতি কোন অসদ্ব্যবহার করেন নাই; উড়িষ্যা আক্রমণ সময়ে তিনি অনেক হিন্দুর মন্দির ও দেববিগ্রহ ধ্বংস করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। সাধারণতঃ তিনি হিন্দুর বিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু এই সময়ে আদেশ করিলেন কেহ যেন শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি কোন অত্যাচার না করে; তিনি যেখানে ইচ্ছা থাকিয়া, যথেচ্ছ সঙ্কীর্ত্তনাদি করুন। কিন্তু গৌড়বাসী

হিন্দু নেতাগণ বিধর্ম্মী নবাবের আশ্বাসে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া পরামর্শ করিয়া একজন ব্রাহ্মণের দ্বারা চৈতন্যদেবকে বলিয়া পাঠাইলেন দুর্বৃত্ত নবাবকে বিশ্বাস নাই। রাজধানীর সন্নিধান হইতে তাঁহার চলিয়া যাওয়াই ভাল। ব্রাহ্মণ রামকেলি গ্রামে গিয়া দেখিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনরসে মগ্ন আছেন, তাঁহার বাহ্য জ্ঞান নাই। তাঁহাকে কোন কথা বলিবার অবসর না পাইয়া ভক্তদের কাহাকেও তিনি এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন। ভক্তগণ তাহাতে চিন্তান্বিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারাও শ্রীচৈতন্যকে কিছু বলিবার অবসর পাইলেন না। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন, অন্তর্য্যামী চৈতন্যদেব ভক্তদের মনের কথা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, এমন কি তিনি যে স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডপতি ঈশ্বর, রাজা তাঁহার কিছুই করিতে পারিবে না ইত্যাদি অনেক অলৌকিক কথা বলিয়াছিলেন যাহা চৈতন্যচরিত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী। হইতে পারে সঙ্গীদিগকে বিমর্ষ দেখিয়া চৈতন্যদেব তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যে কারণেই হউক তিনি বৃন্দাবন গমন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে নীলাচলাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এখানে একটি গভীর বিস্ময়জনক প্রশ্ন আছে; চৈতন্যভাগবতে এই অংশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ থাকিলেও একটি অতি প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ মাত্র নাই, সেটি রূপ ও সনাতনের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ। রূপ ও সনাতন উত্তর কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবমণ্ডলীতে আনয়ন শ্রীচৈতন্যদেবের একটি শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। চরিতামৃতমতে রূপ ও সনাতনের সঙ্গে মিলনই রামকেলি আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বিবৃত হইয়াছে।

"গৌড় নিকটে আসিতে নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহা আগমন॥

এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে
সবে বলে কেনে আইলা রামকেলি গ্রামে ॥"

চৈঃ, চঃ, মধ্যম লীলা ১ম পরিচ্ছেদ।

এইরূপ অবস্থায় তাঁহাদের সহিত প্রথম সাক্ষাতের কোন উল্লেখ চৈতন্যভাগবতে না থাকা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। সৌভাগ্যক্রমে চৈতন্যচরিতামৃতে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। এই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহাদের প্রথম মিলন হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণ এইরূপ—এই সময়ে গৌড়ের নবাবের দবীর খান ও সাকর মল্লিক নামে দুইজন উজীর বা প্রধান রাজমন্ত্রী ছিলেন। কেশবখাঁ শ্রীচৈতন্যদেবের বিষয়ে যে বিবরণ দিলেন, নবাব তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া দবীর খানকে তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। নবাব ও উজীরের সঙ্গে কথা-বার্ত্তার যে বিবরণ আছে, তাহাতে উভয়েই শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করিতেন দেখা যায়। দবীর-খান গৃহে ফিরিয়া স্বীয় ভ্রাতা সাকর মল্লিকের সহিত পরামর্শ করিয়া উভয়েই গভীর রাত্রিতে ছদ্মবেশে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। রামকেলি গ্রামে আসিয়া প্রথমে তাঁহারা নিত্যানন্দ ও হরিদাসের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহারা তাঁহাদিগকে শ্রীচৈতন্যের নিকট লইয়া যান। উচ্চপদস্থ দুই ভাই গভীর দৈন্যসহকারে দন্তে তৃণগুচ্ছ লইয়া গলবস্ত্র হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে পড়িলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে উঠিতে বলিলেন। তাঁহারা উঠিয়া অনেক দীনতা প্রকাশ করিলেন; দুঃখের বিষয়, ইহাদিগের সম্বন্ধে সমসাময়িক বিবরণ বেশী পাওয়া যায় না। ইহাদের জীবন যে গভীর

রহস্যময় তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবত: ইহারা মুসলমানবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অথবা স্বয়ং মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা বার বার বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের নীচকুলে জন্ম।

"নীচজাতি নীচসঙ্গে করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥"

চৈঃ, চঃ, মধ্যখণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরবর্ত্তী বৈষ্ণবলেখকেরাও একথা গোপন করিয়া ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনতম ইতিহাস চৈতন্য-চরিতামৃতের বিবরণে স্পষ্টই মনে হয়, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন না। চৈতন্যদেবের নিকট আপনাদের উদ্ধার প্রার্থনার কালে দবীর খান ও সাকর মল্লিক বলিয়াছিলেন, আমাদের উদ্ধারের তুলনায় জগাই মাধাই উদ্ধার অপেক্ষাকৃত সহজ।

"জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তাঁহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার॥
ব্রাহ্মণ জাতি তারা নবদ্বীপে ঘর।"

চৈঃ, চঃ, মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ।

এই কথায় স্পষ্টই মনে হয় যে, তাঁহারা ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন না। অন্ততঃ তাঁহাদের যবনত্ব ঘটিয়াছিল। আরও স্পষ্টরূপে তাঁহারা বলিতেছেন যে, তাঁহারা ম্লেচ্ছ জাতি।

"ম্লেচ্ছ জাতি, ম্লেচ্ছ সঙ্গী, করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।

চৈঃ, চঃ, মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যচরিতামৃতে আরও লিখিত আছে যে, তাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে বহুধন দিয়া পুরশ্চারণ করতঃ বৈষ্ণবমণ্ডলীতে প্রবেশ করেন।

"দুই ভাই বিষয় ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহুধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল।
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চারণ;
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্যচরণ॥"

চৈঃ, চঃ, মধ্যলীলা, ১৯শ পরিচ্ছেদ।

হইতে পারে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যবন হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদের সে দোষ খণ্ডন করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় মণ্ডলীর মধ্যে গ্রহণ করেন। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের মহিমা অধিক প্রকাশ পায়। তিনি যে একজন অসাধারণ সংস্কারক ছিলেন তাহার এইরূপ বহু প্রমাণ আছে। তিনি কেবল আচণ্ডালে কোল দেন নাই, যবনদিগকেও স্বীয় ধর্ম্মমণ্ডলীতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। চরিতামৃতের বিবরণে সেই রাত্রিতেই তাঁহাদিগের পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে রূপ ও সনাতন নাম প্রদান করেন। সম্ভবতঃ, তাঁহাদিগের সহিত এই প্রথম সাক্ষাৎ হইলেও, পূর্ব্ব হইতে পত্র ব্যবহারের দ্বারা তাঁহাদের সহিত পরিচয় ছিল।

"আজি হইতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন।
দৈন্যছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥
দৈন্য পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার।
সেই পত্রীতে জানি তোমার ব্যবহার॥
তোমার হৃদয়ইচ্ছা জানি পত্র দ্বারে।
শিক্ষাইতে শ্লোক লিখি পাঠাইল তোমারে॥"

চৈঃ, চঃ, মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ।

যাহা হউক, রূপ ও সনাতন দুই ভাই অনেক দীনতা প্রকাশ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব উভয়ের মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহারা তাঁহার চরণ মস্তকে ধারণ করিলেন। এইরূপে একে একে নিত্যানন্দ, হরিদাস, জগদানন্দ প্রভৃতি সকল ভক্তগণের চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাত্রা কালে বলিয়া গেলেন, রাজধানীর সন্নিধানে অবস্থান না করাই ভাল; যদিও গৌড়রাজ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন, তথাপি যবনকে বিশ্বাস নাই। সনাতন আরও বলিলেন, এত লোকজন সঙ্গে তীর্থযাত্রা সমীচীন নহে।

"যাঁর সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবন যাত্রার এ নহে পরিপাটি॥"

চৈঃ, চঃ, মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে শ্রীচৈতন্যদেব রামকেলি পরিত্যাগ করিয়া কানাই এর নাটশালা নামক স্থানে আগমন করিলেন এবং সেই রাত্রিতে সনাতনের ইঙ্গিতবাক্য চিন্তা করিয়া বৃন্দাবন যাত্রার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। পরদিন প্রভাতে তাঁহারা নীলাচলাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের এই তৃতীয়বার বৃন্দাবনের পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন।

কানাইএর নাটশালা হইতে গঙ্গার তীরে তীরে আসিয়া কয়েকদিন পরে শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট পৌছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অদ্বৈতপ্রমুখ বৈষ্ণবগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। অদ্বৈতাচার্য্য শচীমাতাকে আনিবার জন্য তখন নবদ্বীপে লোক প্রেরণ করিলেন। সংবাদ পাইয়া শচীমাতা ও নবদ্বীপের ভক্তগণ শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাহাদের সঙ্গে দশ দিন

শান্তিপুরে অবস্থান করেন। শচীমাতা এই কয়দিন স্বহস্তে নানাবিধ পুত্রের প্রিয়খাদ্য রন্ধন করিয়া ভোজন করাইতেন। এই কয়দিন শান্তিপুরে মহানন্দে উৎসব হইল। শ্রীচৈতন্যের আগমন-সংবাদ পাইয়া যুবক রঘুনাথ দাস শান্তিপুরে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। উত্তরকালে তিনি বৈষ্ণবমণ্ডলীতে স্বীয় সাধনগুণে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। রঘুনাথ দাসের জীবন অতি কৌতূহলপূর্ণ। তিনি অতি ধনীর সন্তান, ইঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত গোবর্দ্ধন ও হিরণ্য দাস, সপ্তগ্রামের জমিদার, মুসলমান সরকারে বার্ষিক বারলক্ষ মুদ্রা রাজস্ব দিতেন, দুই ভাই পরম ধার্ম্মিক ও দানশীল। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিকট হইতে অনেক দান পাইতেন। শ্রীচৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত ইঁহাদের গভীর সৌহৃদ্য ছিল। তিনি তাঁহাদিগকে ভ্রাতার মত দেখিতেন। শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রকেও তাঁহারা সম্মান করিতেন। রঘুনাথ দাস তাঁহাদের বিপুল সম্পত্তির এক মাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু বাল্যকাল হইতে ইনি বিষয়ভোগে উদাসীন। সম্ভবতঃ তিনি বাল্যকালে হরিদাস ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং তখন হইতেই তাঁহার ধর্ম্মে অনুরাগ জন্মায়। সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর শ্রীচৈতন্যদেব যখন শান্তিপুরে কয়েকদিন অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে বাস করেন, সেই সময়ে রঘুনাথ দাস আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখন হইতেই তাঁহার মনে গৃহত্যাগ করিয়া নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে বাস করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। অনেকবার তিনি গৃহ হইতে পলাইয়া নীলাচল যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি পলাইতে না পারেন এইজন্য পাঁচ জন পাইক, চারিজন সেবক ও

দুইজন ব্রাহ্মণ প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। সুতরাং আর তাঁহার পলাইবার উপায় ছিল না। শ্রীচৈতন্যদেব পুনরায় শান্তিপুরে আসিয়াছেন শুনিয়া রঘুনাথ দাস তাঁহাকে দেখিতে যাইবার জন্য পিতার নিকটে অনুমতি চাহিলেন। গোবর্দ্ধন দাস শীঘ্র তাঁহাকে ফিরিতে বলিয়া বহু লোকজন ও দ্রব্যাদি সঙ্গে শান্তিপুরে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি শান্তিপুরে সাত দিন শ্রীচৈতন্য-দেবের সঙ্গে বাস করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে কি করিয়া বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার পাইবেন, এই বিষয়ে পরামর্শ করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, গৃহে ফিরিয়া অনাসক্ত থাকিয়া বিষয় ভোগ কর। বাহিরে কোনরূপ বৈরাগ্য দেখাইও না; যাহার প্রাণে প্রবল ঈশ্বরানুরাগ কেহ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। ঈশ্বর তোমাকে অচিরে মুক্ত করিবেন। আমি বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিলে নীলাচলে আমার সঙ্গে মিলিত হইবে। রূপ সনাতনের সহিত সাক্ষাতের ন্যায় রঘুনাথ দাসের সহিত সাক্ষাতের বিবরণ চৈতন্যভাগবতে নাই। কিন্তু চরিতামৃতের বিবরণই প্রামাণিক। কেন না উত্তরাকালে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ দাসের মুখে এই সকল বিবরণ শুনিয়া থাকিবেন।

রঘুনাথ দাসের সঙ্গে মিলনের পরিবর্ত্তে চৈতন্যভাগবতে বৈষ্ণব-নিন্দার মহা অনর্থসূচক একটি ঘটনার বিবরণ আছে। অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে অবস্থানকালে একজন কুষ্ঠ রোগী শ্রীচৈতন্যদেবের নিকটে আসিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া রোগমুক্তি ভিক্ষা করিল। চৈতন্যদেব তাহাকে 'দূর হও' 'দূর হও,' তোকে দেখিলেও পাপ হয় বলিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুই মহা বৈষ্ণব শ্রীবাসাচার্য্যের নিন্দা করিয়াছিলি, সেই পাপে তোর এই শাস্তি হইয়াছে। শ্রীবাসাচার্য্য

প্রসন্ন না হইলে তোর এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।" ঘটনাটি মূলতঃ সত্য হইলেও ইহার ভাষা চৈতন্যদেবের উপযুক্ত নহে। মহা প্রেমিক চৈতন্যদেব এইরূপ কর্কশ ব্যবহার করিবেন বলিয়া মনে হয় না। তবে বৈষ্ণবনিন্দার প্রতি তিনি অতিশয় বিরূপ ছিলেন।

এইরূপে দশ দিন শান্তিপুরে মহানন্দে কাটাইয়া শচীমাতা ও ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণকরতঃ শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শীঘ্রই বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন বলিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণকে সে বৎসর পুরী যাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি কুমারহট্টে শ্রীবাসাচার্য্যের গৃহে কয়েক দিন স্থিতি করেন। শ্রীবাসাচার্য্য তাঁহাকে পাইয়া সপরিবারে পরমানন্দ লাভ করিলেন। চৈতন্যদেবের আগমন-সংবাদ পাইয়া পুরন্দর মিশ্র, বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ সেন প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া শ্রীবাসের গৃহে মিলিত হইলেন। এখানেও কয়েক দিন মহানন্দে উৎসব হইল। শ্রীবাসাচার্য্য মহা বিশ্বাসী বৈষ্ণব, তাঁহার বৃহৎ পরিবার, অথচ বিশেষ কোন আয় ছিল না। চৈতন্যদেব অত বড় পরিবারের ব্যয় সঙ্কুলান কি করিয়া হইবে ভাবিয়া চিন্তা প্রকাশ করিলে শ্রীবাস পণ্ডিত ঈশ্বরের উপরে নির্ভর রাখিয়া নিশ্চিন্ত আছেন বলিলেন। চৈতন্যদেবও তাঁহার এই নির্ভর দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন।

এইরূপে স্থানে স্থানে ভক্তগৃহে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া চৈতন্যদেব নীলাচল অভিমুখে গমন করেন। শ্রীবাসাচার্য্যের নিকট বিদায় লইয়া তিনি পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আগমন করেন। সেখানেও অন্যান্য স্থানের মত আনন্দোৎসব হইল; তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া গদাধর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত ও পরমেশ্বর দাস প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া জুটিলেন। এখানে কয়েক দিন তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিয়া তিনি

বরাহনগরে আসিলেন। সেখানে এক ব্রাহ্মণের ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া প্রেমাবেশে মত্ত হইলেন এবং তাঁহার বহু প্রশংসা করিলেন। এইরূপে ক্রমে তিনি পুরী পৌঁছিলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদে ভক্তগণ সত্বর আসিয়া মিলিত হইলেন। তিনি ও সার্ব্বভৌম প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে গৌড় গমনের এবং রামকেলি হইতে সনাতনের কথামত ফিরিয়া আসার বিবরণ জানাইয়া বলিলেন, "সনাতন ঠিক কথাই বলিয়াছেন। এত লোক সঙ্গে লইয়া তীর্থযাত্রা উচিত নহে; অতঃপর আমি একাকী অথবা একজন সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিব।"

এখন ভক্তগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব অতিশয় কোমল হৃদয় হইলেও স্বীয় সঙ্কল্প সাধনে বজ্রের মত কঠিন। সুতরাং আর বাধা না দিয়া বলিলেন, "আপনার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই হইবে, তবে এখন বর্ষা সম্মুখে, বর্ষার চারি মাস পরে বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন।"

বর্ষার কয়েক মাস উৎকলবাসী বৈষ্ণবগণের সঙ্গে যাপন করিয়া শরৎকালের প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। একদিন রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, এখন তোমরা আমার বৃন্দাবন যাত্রার সহায় হও। এবার কাহাকেও না বলিয়া আমি রাত্রিতে উঠিয়া গোপনে পশ্চিম যাত্রা করিব। কেহ যদি সন্ধান পাইয়া আমার অনুসরণ করিতে চায় তাহাকে নিবৃত্ত করিও। তাঁহারা বলিলেন, "দুর্গম পথ, আপনার আহারাদির ব্যবস্থা কে করিবে, অতএব অন্ততঃ একজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লউন।" চৈতন্যদেব বলিলেন, "পুরাতন সঙ্গী কাহাকেও লইব না, একজনকে লইলে অপর সকলে দুঃখিত হইবেন।" অবশেষে স্থির হইল, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নামক একজন নব পরিচিত ব্রাহ্মণ ও তাঁহার ভৃত্য সঙ্গে যাইবেন। তিনি তীর্থদর্শন উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছেন, সম্প্রতি চৈতন্য-

দেবের সঙ্গে পুরী আসিয়াছেন। তদনুসারে একদিন শেষ রাত্রিতে উঠিয়া সঙ্গী দুইজনকে লইয়া চৈতন্যদেব গোপনে পুরী হইতে বাহির হইলেন। প্রভাতে ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া চিন্তিত হইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু স্বরূপ দামোদর তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন। ওদিকে চৈতন্যদেব সাধারণ পথ ছাড়িয়া বিপথ দিয়া দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইলেন। যাহাতে পথে পরিচিত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না হয়। কটক দক্ষিণে রাখিয়া ঝারিখণ্ড বনপথে মনের আবেগে হরিনাম করিতে করিতে তিনি চলিতে লাগিলেন; সঙ্গী দুই জন পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন। পথে লোক জন নাই, বনমধ্যে স্থানে স্থানে মৃগ ও হিংস্র জন্তু প্রভৃতি বিচরণ করিতেছিল, সঙ্গী দুই জন তাহা দেখিয়া ভয় পাইতেছিল, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; তিনি হরিনাম-গানে মত্ত হইয়া প্রাণের আবেগে চলিতেছিলেন; বন্য পশুসকল পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এমনও লিখিয়াছেন যে, মৃগসকল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল। এক স্থানে পথে শায়িত একটি ব্যাঘ্রের গাত্রে শ্রীচৈতন্যের পা লাগিয়াছিল, পদাঘাতে ব্যাঘ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, কৃষ্ণ কহ, অমনি ব্যাঘ্র "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিতে লাগিল। আর একদিন তিনি বনমধ্যে নদীতে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময়ে একদল বন্যহস্তী জল পানের জন্য সেখানে আসিল। চৈতন্যদেব তাহাদের গায়ে জল ছিটাইয়া দিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ কহ, অমনি তাহারা কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে লাগিল। এই সকল স্পষ্টই কাল্পনিক অত্যুক্তি। বনমধ্যে স্থানে স্থানে দুই একটি লোকালয় ছিল; আহারের সময় কোন লোকালয় পাইলে সেখানে তাঁহারা ভিক্ষা করিতেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের ব্রাহ্মণ ভৃত্য রন্ধন করিতেন, লোকালয় ছাড়িয়া যাইবার সময়ে দুই চারি দিনের মত চাউল

সঙ্গে লইয়া যাইতেন ; পথে যেখানে খাদ্য-দ্রব্য পাওয়া যাইত না, সেখানে বন্য শাক সংগ্রহ করিয়া ও সেই চাউল রন্ধন করিয়া আহার করিতেন। এইরূপে ক্রমে তাঁহারা বনপথ অতিক্রম করিয়া কাশী আসিয়া পৌঁছিলেন। মধ্যাহ্নে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময়ে পূর্ব্ব পরিচিত তপনমিশ্র নামক বঙ্গদেশীয় এক ব্যক্তি সেখানে স্নান করিতে আসিলেন। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বেই তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে বাস করিতেছিলেন। লোক-মুখে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণের কথা শুনিয়াছিলেন। এখন তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিয়া সঙ্গীদের সহ তাঁহাকে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। তপনমিশ্র সপরিবারে তাঁহাদের সেবা করিলেন ও কাশীর দর্শনীয় স্থান সকল দেখাইলেন। চন্দ্রশেখর নামক বৈদ্যজাতীয় আর একজন বাঙ্গালী সেই সময়ে কাশীতে বাস করিতেন। সংবাদ পাইয়া তিনিও আসিয়া শ্রীচৈতন্যের অনেক স্তবস্তুতি করিলেন। উভয়েই বৈষ্ণবভাবাপন্ন; কাশীতে সর্ব্বত্রই বৈদান্তিক মায়াবাদের প্রচার, সুতরাং ভক্তিধর্ম্মের কথা কোথাও প্রায় শুনিতে পাইতেন না। শ্রীচৈতন্যকে পাইয়া তাঁহাদের বড়ই আনন্দ হইল। তিনি মথুরা যাইতেছেন শুনিয়া কয়েক দিন কাশীতে অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন। তপনমিশ্র বলিলেন, "যে কয়দিন থাকিবেন অপর কোথাও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না, আমার গৃহেই ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।" চৈতন্যদেবও বড় বাহির হইতেন না, কাশীতে মায়াবাদের প্রবল প্রচার; তাঁহার তাহা ভাল লাগিত না। কেবলমাত্র তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের অনুরোধে কাশীতে দিন দশ অবস্থিতি করেন; তখন কাশীতে ভক্তিধর্ম্মানুরাগী একজন মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি চৈতন্যদেবকে দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন এবং

প্রসিদ্ধ বেদান্ত-অধ্যাপক প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট তাঁহার অনেক প্রশংসা করিলেন। প্রকাশানন্দ তাঁহাকে প্রবঞ্চক সন্ন্যাসী বলিয়া অনেক উপহাস করিলেন। সম্ভবতঃ লোকমুখে প্রকাশানন্দ তাঁহার কথা শুনিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ প্রকাশানন্দের কথায় ব্যথিত হইয়া শ্রীচৈতন্যের নিকট সকল কথা নিবেদন করিলেন; তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। দশ দিন কাশীতে থাকিয়া তিনি বৃন্দাবনাভি-মুখে অগ্রসর হইলেন; তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর ও মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা-বাক্যে নিবৃত্ত করিলেন। নিজ সঙ্গী দুই জনকে লইয়া ক্রমে তিনি প্রয়াগে পৌছিলেন, সেখানে তিনদিন থাকিয়া ত্রিবেণীতে স্নান, ও মাধব দর্শন করিয়া মথুরা চলিলেন। দাক্ষিণাত্য পথের ন্যায় এখানেও পথে লোক-দিগকে হরিনামে মাতাইয়াছিলেন, পথে যেখানে যমুনা দেখেন ভাবাবেশে অমনি ঝাঁপ দিয়া জলে পড়েন; বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সাবধানে তাঁহাকে জল হইতে উঠাইতেন, ক্রমে তাঁহারা মথুরার সন্নিহিত হইলেন; মথুরা দৃষ্টিগোচর হওবামাত্র ভক্তিতে গদগদ হইয়া সাষ্টাঙ্গে মাটিতে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। এতদিনে তাঁহার বহুকালসঞ্চিত পুরাণকথিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলদর্শনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রেমাবেশ দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে নৃত্য করিল। উভয়ে হরি, কৃষ্ণ বলিয়া হাত ধরিয়া নাচিলেন, সেখানে বহু লোক সমাগত হইল এবং সন্ন্যাসীর আশ্চর্য্য প্রেমাবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হইল। অবশেষে ব্রাহ্মণ চৈতন্যদেবকে ভিক্ষার জন্য লইয়া গেলেন, চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণের অসাধারণ ভক্তিলক্ষণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, পূর্ব্বে যখন মাধবেন্দ্রপুরী মথুরায় আসিয়াছিলেন

সেইসময়ে এই ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হন এবং তাঁহাকে দীক্ষা দেন। মাধবেন্দ্রপুরীর সম্পর্ক ভিন্ন এমন প্রেম সম্ভব হয় না বলিয়া চৈতন্যদেব বিপ্রের চরণে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ তাহাতে বড় কুণ্ঠিত হইলেন। তখন চৈতন্যদেব বলিলেন, "আমি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্যের শিষ্য, সুতরাং আপনি আমার গুরুস্থানীয়। ব্রাহ্মণ সমাদরে চৈতন্যদেবকে ভিক্ষা করাইলেন ; তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে বহুলোকের সমাগম হইল। শ্রীচৈতন্যদেব বাহিরে আসিয়া তাহাদিগকে হরি বোল বলিয়া নৃত্য করিতে উপদেশ দিলেন এবং নিজেও ভাবে মত্ত হইয়া নাচিতে লাগিলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বায়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘ, বিষ্ণু, ভূতেশ্বর, মহাবিদ্যা ও গোকর্ণ প্রভৃতি মথুরার দ্রষ্টব্য তীর্থ স্থানগুলি দর্শন করাইলেন। চৈতন্যদেব একে একে যমুনার চব্বিশ ঘাটে স্নান করিলেন। তৎপরে বন পরিভ্রমণ করিতে ইচ্ছুক হইলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মধুবন, তালবন, কুমুদ ও বহুলা বন প্রভৃতি দেখাইলেন। চৈতন্যদেব ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক স্থানে বহু নৃত্য করিলেন। মাঠে গাভী সকল চরিতেছে দেখিয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের গোচারণের কথা মনে পড়িল। তিনি নিকটে গিয়া তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কোন কোন শান্ত গাভী হয়ত তাঁহার গাত্রও চাটিয়া থাকিবে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভক্তকবিসুলভ অত্যুক্তিতে লিখিয়াছেন যে, গাভীদল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল, রাখালেরা তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না, মৃগ ও মৃগীগণ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, ময়ূরময়ূরীগণ তাঁহাকে দেখিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, বৃক্ষলতাগণ তাহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। বৃন্দাবনের স্থাবরজঙ্গম শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখিয়া আনন্দে মগ্ন হইল ;

তাহারা হউক আর না হউক চৈতন্যদেব যে বৃন্দাবন দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন, তা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এতদিন যে বৃন্দাবনের চিত্র কল্পনায় ধ্যান করিয়াছিলেন এখন তাহা বাস্তব সম্মুখে। শ্রীচৈতন্যদেব তমাল ও কদম্ব বৃক্ষ দেখিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করেন, নর্ত্তনশীল ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়েন। সঙ্গী ব্রাহ্মণ ও বলভদ্র ভট্টাচার্য্য যথাসাধ্য সযত্নে তাঁহাকে ক্রোড়ে ধরিয়া রক্ষা করেন। এইরূপে চৈতন্যদেব পুরাণোক্ত বৃন্দাবনের নানাস্থান দর্শন করিলেন। সে সময়ে সকল স্থান পরিচিত ছিল বলিয়া মনে হয় না, শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বে বৃন্দাবন অনেকটা অপরিজ্ঞাত ছিল, লুপ্ততীর্থ বৃন্দাবন উদ্ধার শ্রীচৈতন্যদেবের একটি প্রধান কার্য্য বলিয়া বৈষ্ণবেরা মনে করেন। সেকথা অনেকটা ঠিক। শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন গমনের পর হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বহু পরিমাণে বৃন্দাবনে গমন করিতে আরম্ভ করেন। বিশেষতঃ তাঁহার পরামর্শানুসারে তাঁহার দুই প্রধান শিষ্য রূপ ও সনাতন বৃন্দাবনে বাস করিয়া ইহাকে একটি বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আগমনে বৃন্দাবনের মহিমা বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। এখনকার অনেক প্রধান স্থান সে সময়ে অপরিজ্ঞাত ছিল। চৈতন্যদেব বৃন্দাবনের লোকদিগকে রাধাকুণ্ড কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কেহ তাহা বলিতে পারিল না। তখন তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়া ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ডোবা দেখিতে পাইলেন এবং সেইটীকে রাধাকুণ্ড স্থির করিয়া ভক্তিভরে সেখানে স্নান ও কীর্ত্তন করিলেন। তখন হইতে সে স্থান রাধাকুণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। এইরূপে তিনি ভাণ্ডারীবন, ভদ্রবন, শ্রীবন, লৌহবন ও মহাবন প্রভৃতি বহু স্থান দর্শন করিলেন। গিরি গোবর্দ্ধন গিয়া নিম্ন হইতে তাহা

দেখিলেন পাহাড়ের উপরে উঠিলেন না। পাহাড়ের উপরে গোপালের মন্দির; গোপাল দেখিতে ইচ্ছা অথচ উপরে উঠিলেন না। সুতরাং গোপাল দেখা হইল না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, রাত্রিতে মন্দিরের পূজারীগণের নিকট স্বপ্ন হইল যে, মুসলমানেরা মন্দির লুণ্ঠন করিতে আসিতেছে, গোপালকে লইয়া অন্যত্র পলায়ন কর। তদনুসারে পরদিন পূজারীরা গোপালকে লইয়া পাঠুলীগ্রামে লুকাইয়া রাখিল। চৈতন্যদেব সেখানে গিয়া গোপাল দর্শন করিলেন। উত্তরকালে রূপ-গোস্বামীর সম্বন্ধেও এইরূপ একটি বিবরণ আছে। এইসকল কথা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না, সম্ভবতঃ মধ্যে মধ্যে যবনের ভয়েই হউক বা অন্য কোন কারণে গোপাল মূর্ত্তিকে অন্যত্র লইয়া যাওয়া হইত। শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন অবস্থানকালে আর একটি কৌতুকজনক ঘটনার উল্লেখ আছে। একবার জনরব উঠিল বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি রাত্রিকালে কালিয়া হ্রদে মণি-খচিত ফণীর মস্তকে নৃত্য করেন। নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে অনেক লোক শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য সেখানে আগমন করিল। চৈতন্যদেবের সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য্য তাহা দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। চৈতন্যদেব তখন তাঁহাকে বলিলেন, এইসব বাতুলের কথা। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, শ্রীচৈতন্যদেব এইসব কথায় বিশ্বাস করিতেন না। পরে জানা গেল যে, এক জেলে রাত্রিতে নৌকায় প্রদীপ জ্বালিয়া মাছ ধরে। ক্রমে মথুরা ও বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্যের আগমন-সংবাদ বহু প্রচারিত হইল। তাঁহাকে দেখিতে বহুলোক সমাগত হইত। মথুরার ব্রাহ্মণেরা সাগ্রহে ভিক্ষার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিত। নির্জ্জনে থাকিবার জন্য মাঝে মাঝে তিনি অক্রূরে গমন করিতেন, কিন্তু সেখানেও বহুলোকের জনতা হইত, তখন তিনি আবার বৃন্দাবনে আসিতেন। এইরূপে তিনি কখনও মথুরা,

কখনও বৃন্দাবন, কখনও অক্রূর, কখনও গোকুলে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। যেখানে যান সেখানেই নাম সঙ্কীর্ত্তনে লোক সকলকে মাতাইয়া তোলেন। একদিন তিনি বৃন্দাবনে যমুনার তীরে তেঁতুল গাছের তলায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিল। সে যমুনা পার হইয়া কালিদহ যাইতেছিল, পথিপার্শ্বে বৃক্ষতলে আসীন সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। চৈতন্যদেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? সে বলিল, আমি অধম রাজপুত গৃহস্থ। নাম কৃষ্ণদাস, যমুনার অপর পারে বাস। বৈষ্ণবের অনুচর হইতে আমার একান্ত ইচ্ছা। রাত্রিতে এক স্বপ্ন দেখিয়াছি আপনাকে দেখিয়া সে স্বপ্ন প্রত্যক্ষ হইল। চৈতন্যদেব তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, সে প্রেমে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। সেইদিন হইতে গৃহপরিবার পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেবের সঙ্গী হইলেন।

আর একদিন চৈতন্যদেব অক্রূর ঘাটে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার মনে হইল, এইস্থানে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন। অমনি তিনি ভাবাবেশে যমুনায় ঝাঁপ দিলেন। নিকটে কৃষ্ণদাস ছিলেন তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ছুটিয়া আসিয়া অতিকষ্টে তাঁহাকে জল হইতে তুলিলেন। অতঃপর বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন, আজ না হয় আমি নিকটে ছিলাম কোনরূপে তাঁহাকে জল হইতে উঠাইলাম, কিন্তু অন্যত্র এমন ঘটিলে কে রক্ষা করিবে? তখন তিনি ভাবিলেন, এখন বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল। মথুরার ব্রাহ্মণের সঙ্গে এই পরামর্শ করিয়া শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, এখানকার এই জনতা ও নিমন্ত্রণের ধূম আমার আর ভাল

লাগিতেছে না। ইহা অপেক্ষা গঙ্গার তীর ভাল। আর মাঘ মাস আসিল, এখন ফিরিলে প্রয়াগে মকর স্নান করিতে পারি। শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, তুমি আমাকে বৃন্দাবন দর্শন করাইলে, তোমার নিকটে চিরকৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ আছি। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই পালন করিব। পরদিন তাঁহারা বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার আয়োজন করিলেন। বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া চৈতন্যদেবের মন অতিশয় বিষণ্ণ হইল। প্রভাতে নৌকায় যমুনা পার হইয়া তাঁহারা চলিলেন, সঙ্গে কৃষ্ণদাস, মথুরার সেই ব্রাহ্মণ বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার ভৃত্য। কিছু পথঅতিক্রম করিয়া শ্রান্ত হইয়া একটি বৃক্ষতলে বিশ্রামের জন্য বসিলেন। নিকটে একপাল গাভী চরিতেছিল, তাহার উপরে হঠাৎ রাখাল বাঁশী বাজাইল; শ্রীচৈতন্যের মন ভাবে পূর্ণ ছিল, বাঁশীর শব্দে তিনি একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল, মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইতে লাগিল। এমন সময়ে সে স্থান দিয়া দশ জন অশ্বারোহী পাঠান সৈন্য যাইতেছিল। শ্রীচৈতন্যকে তদবস্থায় দেখিয়া তাহারা মনে করিল ইহারা ঠগী। এই পথিককে বিষ অথবা ধুতুরা খাওয়াইয়া ইহারা তাহার সর্ব্বস্ব চুরি করিতেছে। এই সন্দেহে তাহারা সঙ্গিগণকে বান্ধিয়া কাটিতে যাইতেছিল। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভয়ে কিছু বলিতে পারিলেন না, কিন্তু মথুরাবাসী ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণদাস, সেই দেশীয় লোক, সুতরাং অপেক্ষাকৃত সাহসী। মথুরাবাসী ব্রাহ্মণ বলিল, "আমি মথুরার লোক, ইনি আমার গুরু। আমরা ইঁহাকে বধ করিতেছি না, ইনি মাঝে মাঝে এই প্রকার মূর্চ্ছিত হন।" কৃষ্ণদাস বলিল, "আমি রাজপুত, এই গ্রামে বাস, আমরা দস্যু নই। তোমরাই দস্যু। আমাদিগকে মারিয়া আমাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবে এই তোমাদের অভিপ্রায়; এখনই

যদি আমি ডাকি একশত জন যোদ্ধা আসিবে।" এইকথা শুনিয়া পাঠানেরা কিছু সঙ্কুচিত হইল। ইতিমধ্যে চৈতন্যদেবের সংজ্ঞা হইল, তখন পাঠানেরা সঙ্গীদিগের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। শ্রীচৈতন্যদেব সংজ্ঞা পাইয়া উঠিয়া প্রেমাবেশে হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে পাঠানদের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। মুসলমান-দিগকে দেখিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের বাহ্যজ্ঞান হইল; তখন পাঠানেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, "এই লোকগুলি ডাকাত; তোমাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া তোমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছিল;" চৈতন্যদেব বলিলেন, "ইঁহারা আমার সঙ্গী, পরম বন্ধু। আমি দরিদ্র সন্ন্যাসী, আমার কি অপহরণ করিবে? আমার রোগ আছে, সময়ে সময়ে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ি। সে সময়ে ইঁহারা আমাকে রক্ষা করেন।" সেই পাঠানদিগের মধ্যে একজন ধর্ম্মানুরাগী লোক ছিলেন। তিনি হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করিতেন। লোকে তাঁহাকে পীর বলিত। তিনি শ্রীচৈতন্যের কথায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ঈশ্বর বিষয়ে তাঁহাদের বিচার হয়। বিচারে পরাস্ত হইয়া পাঠান শ্রীচৈতন্যের শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে রামদাস নাম দিয়া আপনার শিষ্য করিলেন, পাঠানদের মধ্যে আর একজন লোক ছিলেন, তিনি রাজকুমার, নাম বিজলীখান। তিনিও শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। এইরূপে পাঠানদিগকে ভক্তিধর্ম্মে আনয়ন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে তাঁহারা প্রয়াগে পৌঁছিয়া গঙ্গা স্নান করিলেন। প্রয়াগে তাঁহারা দশদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। মাথুরব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণদাসকে এখান হইতে ফিরাইয়া পাঠাইলেন। প্রয়াগে অবস্থান সময়ে শ্রীরূপগোস্বামী আসিয়া তাঁহার

সহিত মিলিত হন। রামকেলী গ্রামে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর হইতেই, রূপ ও সনাতন দুই ভাই বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অনুচর হইতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা গৌড়ের নবাবের প্রিয় কর্ম্মচারী। কিরূপে রাজকার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইবেন ইহাই তাঁহাদের চিন্তার বিষয় হইল। কিছুদিন পরে রূপ স্বদেশ দেখিবার ছল করিয়া নৌকাযোগে সমুদয় ধন-সম্পত্তি লইয়া গৌড় হইতে প্রস্থান করিলেন। নিজগ্রামে আসিয়া অর্দ্ধেক সম্পত্তি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে এবং চতুর্থাংশ আত্মীয়-স্বজনকে দান করিলেন। অবশিষ্ট চতুর্থাংশ বিপদ সময়ে প্রয়োজন মত ব্যয়ের জন্য বিশ্বস্ত লোকের নিকটে গচ্ছিত রাখিলেন। দশসহস্র মুদ্রা গৌড়ে এক বণিকের নিকটে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। গৌড় হইতে আসিবার সময়, নীলাচলে দুইজন চর পাঠাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি আদেশ ছিল, চৈতন্যদেব বৃন্দাবন গমন করিলে তাঁহাকে আসিয়া সংবাদ দিবে। যথাসময়ে চর আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের বৃন্দাবন যাত্রার সংবাদ দিলে, রূপ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপম মল্লিককে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। অনুপম মল্লিকও পরম বৈষ্ণব। সম্ভবতঃ তিনিও মুসলমান ছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম শ্রীবল্লভ হইয়াছিল। তাঁহারা প্রয়াগে পৌঁছিয়া শুনিতে পাইলেন, শ্রীচৈতন্যদেব তখন সেখানে অবস্থিতি করিতেছেন। জনতাহেতু তাঁহারা সহসা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। একদিন একজন দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেব সেখানে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রূপ নিভৃতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রূপকে দেখিয়া চৈতন্যদেব অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন, ঈশ্বর তোমাকে কৃপা করিয়া বিষয় জাল হইতে মুক্ত করিয়াছেন। কয়েকদিন রূপকে নিকটে রাখিয়া

ধর্ম্মোপদেশ প্রদানকরতঃ বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। রূপ তাঁহার সঙ্গে নীলাচলে ফিরিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব বলিলেন, এখন তুমি বৃন্দাবনে যাও, পরে নীলাচলে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইও।

প্রয়াগ অবস্থান কালে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য বল্লভভট্টের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয়। তিনি তখন প্রয়াগের নিকটে অম্বুলীগ্রামে বাস করিতেছিলেন। চৈতন্যদেবের আগমন-সংবাদ পাইয়া বল্লভভট্ট প্রয়াগে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে নিজ বাসস্থানে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করান। বল্লভভট্টের গৃহে রঘুনাথ উপাধ্যায় নামে আর একজন বৈষ্ণবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। এবং সকলে মিলিয়া ধর্ম্মালোচনা করেন।

রূপ ও অনুপমকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া নিজ সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া চৈতন্যদেব বারাণসী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বারাণসীর বাহিরে চন্দ্রশেখরের সহিত সাক্ষাৎ হইল, এবার চৈতন্যদেব তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করিলেন। তপন মিশ্র সংবাদ পাইয়া সত্বর আসিয়া মিলিত হইলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় এবারও তাঁহার গৃহে ভিক্ষার ব্যবস্থা হইল। পূর্ব্বপরিচিত মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণও সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া ধর্ম্মালাপ করিতেন। চৈতন্যদেব যে সময়ে বারাণসীতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে সনাতন আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। বৃন্দাবন যাত্রাকালে রূপগোস্বামী তাঁহাকে গোপনে সংবাদ পাঠান যে, চৈতন্যদেব বৃন্দাবনে গিয়াছেন, আমি অনুপমকে লইয়া সেখানে যাইতেছি, তুমিও যেমন করিয়া পার সেখানে আসিয়া মিলিত হও। সনাতন তখন বন্দী, রূপ স্বদেশ হইতে ফিরিলেন না, সনাতনও রাজকার্য্যে উদাসীন, পীড়ার ভাণ করিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকেন, নবাবের

সন্দেহ হইল। একদিন নবাব হঠাৎ আসিয়া দেখিলেন, সনাতন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। নবাব বলিলেন, "এ তোমার কেমন ব্যবহার, তুমি আমার প্রিয় মন্ত্রী, তোমার অভাবে রাজকার্য্যের ক্ষতি হইতেছে, তুমি গৃহে বসিয়া আছ।" সনাতন বলিলেন, "আমার দ্বারা আর রাজকার্য্য হইবে না, আপনি অন্য ব্যবস্থা করিবেন।" উৎকলে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন হইতেছিল, নবাব সনাতনকে সঙ্গে আসিতে বলিলেন। সনাতন উত্তর করিলেন, "তুমি দেবতা ও ব্রাহ্মণদের নির্য্যাতন করিতে যাইতেছ। আমি এ যুদ্ধের সঙ্গী হইতে পারিব না।" নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া সনাতনকে কারাবদ্ধ করিয়া উৎকলে যাত্রা করিলেন। রূপের পত্র পাইয়া সনাতন বৃন্দাবন যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কারাধ্যক্ষকে সাতসহস্র মুদ্রা দিয়া গোপনে ফকিরের বেশে গৌড় হইতে পলায়ন করিলেন। পথে বহু বিপদ ও ক্লেশ সহ্য করিয়া কাশী আসিয়া পৌছিলেন। সেখানে শুনিলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। এই সংবাদে আনন্দিত হইয়া চন্দ্রশেখরের গৃহে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় হৃষ্টমনে পরম সমাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সনাতন অনেক দীনতা প্রকাশ করিলেন। চৈতন্যদেব চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। সনাতনের দরবেশের বেশ ছিল, চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, ইঁহার ক্ষৌরকার্য্য করাইয়া গঙ্গাস্নান করাও এবং নূতন কৌপীন ও বহির্বাস দাও। সনাতন নূতন বস্ত্রগ্রহণ না করিয়া পুরাতন ছিন্ন বহির্বাস চাহিয়া লইলেন। তাঁহার অঙ্গে একখানি বহুমূল্য ভোট কম্বল ছিল। সেখানি একজন দরিদ্র ভিক্ষুককে দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে তাহার ছিন্ন কাঁথা লইলেন। মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ প্রতিদিন তাঁহার গৃহে ভিক্ষার জন্য সনাতনকে নিমন্ত্রণ করিলেন,

কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, আমি দ্বারে দ্বারে মাধুকরী করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করিব। চৈতন্যদেব সনাতনের বৈরাগ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বাস্তবিক, সনাতনের ত্যাগ ও বৈরাগ্য অতুলনীয়; কোথায় গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রীর অতুল ঐশ্বর্য্য, আর কোথায় জীর্ণ বহির্বাস ছিন্নকন্থা ও উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা!

সনাতনের জন্য দুই মাস কাশীতে থাকিয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে ভক্তি ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন। প্রতিদিন চন্দ্রশেখরের গৃহে পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া ও চন্দ্রশেখর তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইতেন। এই যাত্রায় কাশীর বৈদান্তিক পণ্ডিতগণও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন, কাশীবাসী বৈদান্তিক ব্রাহ্মণগণ শ্রীচৈতন্যকে উপহাস করিতেন। তাহাতে মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ভক্তগণ অতিশয় ব্যথিত হইতেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, একবার চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পণ্ডিতগণের ভ্রান্তি ঘুচিবে। এই স্থির করিয়া একদিন স্বগৃহে পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং অনেক অনুনয় করিয়া চৈতন্যদেবকেও সেখানে লইয়া গেলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে গঙ্গা-স্নানের পর বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয় ভক্তিতে পরিপূর্ণ। সঙ্গে চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া, তপন মিশ্র ও সনাতন। ব্রাহ্মণের গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ভাবাবেশে চৈতন্যদেব নাচিতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গে স্বেদ, পুলক ও অশ্রু প্রভৃতি দেখা দিল, সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া সশিষ্যে প্রকাশানন্দ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি চৈতন্যদেবের অপূর্ব্ব দেহকান্তি ও আশ্চর্য্য প্রেমাবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। ক্রমে বহুলোক ও সন্ন্যাসীর জনতা

হইল। লোক দেখিয়া শ্রীচৈতন্যের বাহ্যজ্ঞান হইল, সম্মুখে প্রকাশানন্দকে দেখিয়া চৈতন্যদেব স্বীয় স্বভাবসুলভ দীনতায় তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে পরিচয় ও শাস্ত্রালোচনা হইল। চৈতন্যদেব অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া ব্যাসসূত্রের ভক্তি পক্ষে ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন, ভাগবৎ পুরাণে স্বয়ং ব্যাসদেব সূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্ম অর্থে ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ভগবান। তাঁহার নির্ব্বিশেষ ব্যাখ্যা করিলে পূর্ণতার হানি হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রকাশানন্দপ্রমুখ সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া স্বীকার করিলেন। এ কথা অত্যুক্তি হইতে পারে, কিন্তু তখন আর সন্ন্যাসীর দল তাঁহাকে মূর্খ ভাবুক বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তাহা নিশ্চিত। সেইদিন হইতে কাশীর পণ্ডিতগণও তাঁহাকে সম্মান করিতে লাগিলেন। সেখানে চৈতন্যদেবের যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইল। তাঁহাকে দেখিতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল।

অতঃপর তিনি নীলাচলে প্রত্যাগমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন, সনাতন তাঁহার সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব আপাততঃ তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইতে বলিলেন এবং সেখানে অবস্থিতি করিয়া গৃহত্যাগী বৈষ্ণবদের সেবা করিতে বলিলেন। চন্দ্রশেখর তপন মিশ্র প্রভৃতিও তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব সকলকে বাধা দিয়া বলিলেন, যাঁহার যাইবার ইচ্ছা তিনি পরে আসিবেন, এখন তিনি একাকী, ঝারিখণ্ডের বনপথে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিবেন। এই বলিয়া বলভদ্র মিশ্র ও তাঁহার ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া কাশী হইতে যাত্রা করিলেন। এবং পূর্ব্বপথে নীলাচলে পৌঁছিলেন।

শেষ জীবন

বৃন্দাবন হইতে শ্রীচৈতন্যের প্রত্যাগমন-সংবাদে পুরীর ভক্তগণ-মধ্যে পরমানন্দের স্রোত বহিল। স্বরূপ দামোদর অবিলম্বে গৌড়ে তাঁহার প্রত্যাগমন সংবাদ প্রেরণ করিলেন। বর্ষার কিছু পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে পৌঁছিয়া থাকিবেন। কেননা সংবাদ পাইয়া রথযাত্রার পূর্ব্বেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নীলাচলে আসিতে পারিয়াছিলেন। বোধহয় তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের পুরী প্রত্যাগমন-সংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সংবাদ পাইবামাত্রই শ্রীখণ্ড, কুলীনগ্রাম প্রভৃতি নানা-স্থান হইতে বৈষ্ণবগণ শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আসিয়া মিলিত হইলেন এবং শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বে পুরী যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ যাত্রার একটি ঘটনা বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই:—সেবার যাত্রীদলের সঙ্গে একটি কুকুর আসিয়াছিল; শিবানন্দ সেন কুকুরটীকে যত্ন করিয়া আহারাদি দিতেন। একস্থানে ঘাটিয়াল কুকুরটীকে পার করিতে সম্মত না হওয়ায় আটপণ কড়ি দিয়া কুকুরটীকে নৌকা পার করান। একদিন পাচক কুকুরটীকে খাইতে না দিয়া তাড়াইয়া দেয়। শিবানন্দ সেন সন্ধ্যাকালে কুকুরটীকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, পাচক খাইতে না দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেন। ইহাতে তিনি অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। এই বিবরণে বৈষ্ণবদিগের ইতরপ্রাণীর প্রতি দয়ার আভাষ পাওয়া যায়। পথে আর কুকুরটীকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু বৈষ্ণবদল পুরীতে পৌঁছানর পর, কুকুরটীকে শ্রীচৈতন্যের গৃহে দেখিতে পাইয়াছিলেন;

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এমনও লিখিয়াছেন যে, কুকুরটী চৈতন্যদেবের আদেশে "রাম, কৃষ্ণ, হরি" বলিয়াছিল। ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যাঘ্রহস্তি কৃষ্ণ, হরি বলার মতই কথা। লিখিত আছে কুকুবটী পুরীতেই প্রাণত্যাগ করে।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও গৌড়ীয় ভক্তগণ চারিমাস পুরীতে অবস্থান করিয়া গুণ্ডিচামার্জ্জন, রথযাত্রাদর্শন প্রভৃতি করেন। তাঁহাদের পুরী অবস্থানকালে রূপগোস্বামী সেখানে আসেন। প্রয়াগে শ্রীচৈতন্যের নিকট বিদায় লইয়া তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা অনুপম বৃন্দাবন যান এবং সেখানে অল্পদিন থাকিয়া গৌড়ে ফিরিয়া আসেন। গৌড়ের বৈষ্ণবগণ তৎপূর্ব্বেই পুরী যাত্রা করিয়াছিলেন। গৌড়ে তাঁহার ভ্রাতা অনুপমের মৃত্যু হয়। সেজন্য তাঁহাকে কয়েকদিন গৌড়ে বিলম্ব করিতে হইয়াছিল। চৈতন্যের সহিত মিলিত হইবার ব্যগ্রতায় তিনি যত শীঘ্র সম্ভব, গৌড় হইতে পুরী যাত্রা করিলেন এবং পুরী পৌঁছিয়া হরিদাসের বাসস্থানে আগমন করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রতি দিন উপলভোগ দর্শনান্তর হরিদাসের গৃহে আসিতেন। সেদিন আসিতেই রূপ আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া চৈতন্য-দেব পরমানন্দিত হইলেন, কিন্তু অনুপমের মৃত্যু-সংবাদে ব্যথিত হইলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন পথে সনাতনের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। সনাতন রাজপথ দিয়া বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু রূপ গঙ্গাপথে আসিয়াছিলেন, সেইজন্যই তাঁহাদের পরস্পরের সহিত দেখা হয় নাই। হরিদাসের গৃহেই রূপের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ভৃত্য গোবিন্দের হস্তে হরিদাসের ন্যায় তাঁহার খাদ্য প্রতিদিন প্রেরিত হইত, ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে, রূপ পূর্ব্বে মুসলমান ছিলেন। ক্রমে ক্রমে অদ্বৈত নিত্যানন্দ-প্রমুখ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের এবং বাসুদেব, রামানন্দ প্রভৃতি

উৎকলবাসী বৈষ্ণবগণের সঙ্গে রূপের পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীচৈতন্তের ইচ্ছানুসারে তাঁহারা তাঁহাকে পরম সমাদরে মণ্ডলীমধ্যে গ্রহণ করিলেন। বৃন্দাবন অবস্থান কালেই, রূপ কৃষ্ণলীলা নামক একখানি সংস্কৃত নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। পথেও সময়ে সময়ে কড়চা করিয়া লিখিতেছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে যে, উৎকলের পথে সত্যভামাপুর নামক একগ্রামে রাত্রিতে স্বপ্নে যেন এক দিব্যনারী তাহাকে বলেন যে, আমার নাটক পৃথক করিয়া রচনা কর। ইহাতে রূপ মনে করিলেন যে, সত্যভামা কৃষ্ণলীলায় তাঁহার বিষয়ক অংশ পৃথক গ্রন্থে লিখিতে আদেশ করিলেন। যাহা হউক পুরীতে পৌছিলে চৈতন্যদেব এবং বৈষ্ণবগণ রূপের কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নাটক রচনার কথা জানিতে পারিলেন। চৈতন্যদেবের আদেশে তাহার কোন কোন অংশ বৈষ্ণবমণ্ডলীতে পড়িয়া শুনানও হইয়াছিল। চৈতন্যদেবও দুইভাগে নাটক লিখিতে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। যে কারণেই হউক ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব দুই ভাগে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছিল।

চারিমাস পুরীতে অবস্থান করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। রূপ দোলযাত্রা পর্য্যন্ত পুরীতে হরিদাসের সঙ্গে অবস্থান করেন; চৈতন্যদেব প্রতিদিন আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্ম ও কাব্যালাপ করিতেন। দোলযাত্রার পরে রূপকে বলিলেন, "তুমি বৃন্দাবনে গিয়া তোমার ভ্রাতার সঙ্গে মিলিত হইয়া লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও ব্রজলীলা-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা ও প্রচার কর। একবার সনাতনকে এখানে পাঠাইও। পরে আমি আর একবার বৃন্দাবন যাইব।" ইহাতে মনে হয় শ্রীচৈতন্যদেবের আর একবার বৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইয়া উঠে নাই। তাঁহার জীবনের

অবশিষ্টাংশ নীলাচলে অতিবাহিত হইয়াছিল। দশমাস পুরীতে থাকিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ও পুরীর ভক্তমণ্ডলীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রূপগোস্বামী গৌড়ের পথে বৃন্দাবন গমন করেন।

এখন হইতে শ্রীচৈতন্যদেব জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রায় আঠারো বৎসর কাল পুরীতে অবস্থান করেন। নিত্য নিয়মিতরূপে জগন্নাথ দর্শন, দিবসে বৈষ্ণবগণের সহিত ধর্ম্মালোচনা ও কীর্ত্তন, রাত্রিতে রামানন্দ ও স্বরূপ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত নিগূঢ় তত্ত্বালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। প্রতি বৎসর বর্ষার প্রাক্কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন এবং চারিমাস তাঁহার সঙ্গে পরমানন্দে বাস করিতেন। মধ্যে মধ্যে দুই একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত আসিয়া মিলিত হইতেন। রূপগোস্বামী পুরী হইতে চলিয়া যাওয়ার দশ দিন পরেই তাঁহার ভ্রাতা সনাতন পুরীতে আগমন করেন। সেই যে গৌড় হইতে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন, তদবধি দুই ভাইএর আর সাক্ষাতই হয় নাই। কাশীতে চৈতন্যদেবের নিকট বিদায় লইয়া সনাতন যখন বৃন্দাবন পৌছিলেন, তাহার পূর্ব্বেই রূপ তথা হইতে গৌড়ের পথে নীলাচলে যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর বৃন্দাবনে থাকিয়া সনাতনও শ্রীচৈতন্যের সহিত পুনর্ম্মিলনের জন্য নীলাচলে আগমন করেন, কিন্তু তাঁহার পৌছিবার অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বেই রূপ তথা হইতে গৌড়ের পথে চলিয়া যান। গৌড়ে তাঁহার বৎসরাধিক কাল বিলম্ব হইয়াছিল; যে-সমুদয় সম্পত্তি তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন তাহা সংগ্রহ করিয়া আত্মীয়স্বজন ও ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া চিরদিনের মত গৌড় পরিত্যাগ করতঃ বৃন্দাবনে চলিয়া যান।

সনাতন ঝারিখণ্ডের বনপথে পুরী আসিয়াছিলেন। পথে বন্য ফল-

মূল ভক্ষণ ও দূষিত জলপান করায় তাঁহার চর্ম্মরোগ হইয়াছিল। পুরীতে পৌছিয়া হরিদাসের বাসস্থান অনুসন্ধান করিয়া সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রাতঃকালে উপলভোগের পরে নিয়মিত সময়ে চৈতন্যদেব যখন হরিদাসের গৃহে আসিলেন, সনাতন তাঁহাকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া চৈতন্যদেব পরমানন্দে আলিঙ্গন করিতে গেলেন, কিন্তু সনাতন পশ্চাতে সরিয়া গেলেন, বলিলেন, "আমি নীচজাতি, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গে চর্ম্মরোগ হইয়াছে, আমাকে স্পর্শ করিবেন না।" কিন্তু শ্রীচৈতন্য সে আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া সবলে সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার ক্ষত স্থানের পুঁজ, রক্ত চৈতন্যদেবের গাত্রে লাগিয়া গেল। ইহাতে সনাতন অতিশয় দুঃখিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যের নিকটে সনাতন কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের মৃত্যু ও দশমাস পুরীতে অবস্থানের পর রূপের গৌড়পথে বৃন্দাবন প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইলেন। শ্রীচৈতন্য সনাতনকে বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। এইরূপ বহুক্ষণ আলাপের পরে চৈতন্যদেব মধ্যাহ্নের স্নান-আহারাদির জন্য নিজের বাসস্থানে গমন করিলেন। রূপের ন্যায় হরিদাসের গৃহে সনাতনের বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা হইল। ইহাতেও বুঝা যাইতেছে যে সনাতন পূর্ব্বে মুসলমান ছিলেন বলিয়া পুরীর মধ্যে তাঁহার স্থান হয় নাই। এবিষয়ে আরও একটি ঘটনার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এক সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব নগরের বাহিরে যমেশ্বর উদ্যানে বাস করিতেছিলেন। একদিন মধ্যাহ্নে সনাতনকে সেখানে ডাকিয়া পাঠান। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস; প্রচণ্ড রৌদ্রে সমুদ্রতীরে বালুকা উত্তপ্ত হইয়া অগ্নিসম হইয়াছিল। চৈতন্যদেব ডাকিয়াছেন শুনিয়া সনাতন ব্যস্তসমস্ত হইয়া সেই উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া চলিলেন। নগরের ভিতর দিয়া যাওয়ার পথ ছিল,

কিন্তু সে পথে মন্দিরের নিকট দিয়া যাইতে হইবে, জগন্নাথের পূজারীদের স্পর্শ হইতে পারে এই ভয়ে সনাতন সে পথে গেলেন না।

"সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষ ঠাকুরের তাঁহা সেবক প্রচার॥
সেবক সব গতা গতি করে অবসরে।
কারও সহিত স্পর্শ হৈলে সর্ব্বনাশ করে॥"
(চৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।)

সমুদ্রতীরে উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া আসায় সনাতনের পায়ে ফোস্কা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সেদিকে লক্ষ্যই ছিল না। চৈতন্যদেব তাহা দেখিয়া দুঃখিত হইলেন, কিন্তু সনাতনের ব্যবহারের প্রশংসাই করিয়াছিলেন।

সনাতনের চর্ম্মরোগ বোধ হয় অনেক দিন ছিল। চৈতন্যদেব সর্ব্বদা জোর করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন, ক্ষতস্থানের পুঁজ, রক্ত তাঁহার গায়ে লাগিয়া যাইত, এইজন্য সনাতন অতিশয় কুণ্ঠিত হইতেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, এ প্রাণ আর রাখিবেন না, রথযাত্রার সময়ে রথচক্রের নীচে পড়িয়া দেহত্যাগ করিবেন। চৈতন্যদেব তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া এক দিন বলিলেন, "দেহত্যাগ করিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না, কেবল ভক্তিতেই ভগবানকে পাওয়া যায়; দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম, তাহাতে অপরাধ হয়। সাত্ত্বিকভাবে ঈশ্বর-ভজন ও তাঁহার সেবায় প্রেমধন লাভ হয়। ঈশ্বরের নিকটে জাতিকুল বিচার নাই, সকলেই তাঁহার সেবার অধিকারী। যে তাঁহার ভজনা করে সেই উচ্চ, আর যে ভগবানের ভজনা করে না সে নীচ।" শ্রীচৈতন্যের এইবাক্যে সনাতন দেহত্যাগের সঙ্কল্প

পরিত্যাগ করিলেন; চৈতন্যদেব আরও বলিলেন, "তোমার এই দেহ আমার; ইহার দ্বারা আমি অনেক কার্য্য সাধন করিব।" ক্রমে পুরীর বৈষ্ণবগণের নিকটে সনাতনের পরিচয় করাইয়া দিলেন। রায় রামানন্দ প্রভৃতিকে তাঁহার অতুলনীয় ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কথা বলিলেন। যথাসময়ে গৌড়ের বৈষ্ণবগণ নীলাচলে আগমন করিলেন। তাঁহাদের সকলের সঙ্গেও সনাতনের সাক্ষাৎ ও পরিচয়াদি হইল; সনাতন চারি মাস তাঁহাদের সঙ্গলাভ করিলেন। চৈতন্যদেব প্রতিদিন ভক্তদের সঙ্গে হরিদাসের বাসস্থানে আসিয়া সনাতনের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেন। এইরূপে প্রায় এক বৎসর সনাতনকে নিকটে রাখিয়া শিক্ষা ও উপদেশ প্রদানকরতঃ বৃন্দাবন পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, রূপের সঙ্গে মিলিত হইয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিশাস্ত্র প্রচার কর। রূপ ও সনাতনকে বৃন্দাবনে প্রেরণে শ্রীচৈতন্যদেবের তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতা ও কর্ম্মকুশলতার উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তরকালে বৃন্দাবন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার মূলে একদিকে রূপ সনাতন প্রভৃতির অসাধারণ ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সাধনা অপরদিকে চৈতন্যদেবের মানবচরিত্রের সূক্ষ্ম জ্ঞান, এবং উপযুক্ত স্থান ও পাত্র নির্ব্বাচনের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। যথাস্থানে বৃন্দাবনের মণ্ডলীগঠনের ইতিহাস প্রদত্ত হইবে।

দোলযাত্রার পরে চৈতন্যদেব ও ভক্তমণ্ডলীর নিকট বিদায় লইয়া সনাতন বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করেন। এইরূপে ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যের নিকট আসা যাওয়া করিতেন। শ্রীচৈতন্যের জীবন একভাবেই চলিতে লাগিল, তাঁহার শেষজীবনে অধিক ঘটনাবৈচিত্র্য ছিল না, কিন্তু অল্প যে সকল ঘটনার বিবরণ আছে তাহাতেও তাঁহার চরিত্র ও কার্য্যপ্রণালীর আভাস পাওয়া যায়। পুরীতে ভগবানাচার্য্য নামক একজন

ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি চৈতন্যদেবের অতিশয় অনুরাগী হইয়াছিলেন; মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে ভিক্ষা করাইতেন। এইরূপ একদিন চৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, বিবিধ ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার গৃহে ভাল চাউল ছিল না। তিনি শ্রীচৈতন্যের কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি শিখি মাইতির ভগিনীর নিকটে গিয়া আমার নাম করিয়া এক মণ ভাল চাউল আন।" হরিদাস তাহাই করিলেন, যথাসময়ে চৈতন্যদেব ভোজনে আসিলেন; উৎকৃষ্ট শাল্যন্ন দেখিয়া বহু প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "এই চাউল কোথায় পাইলে ?" আচার্য্য বলিলেন, "শিখি মাইতির ভগিনী মাধবী দেবীর নিকট হইতে আনিয়াছি"। কাহার দ্বারা আনান হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাস গিয়া আনিয়াছেন। আহারান্তে গৃহে ফিরিয়া ভৃত্য গোবিন্দকে আদেশ করিলেন, "ছোট হরিদাসকে আর আমার নিকটে আসিতে দিবে না।" চৈতন্যদেবের নিকট তাঁহার গমন নিষেধ সংবাদ শুনিয়া হরিদাস অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি তিন দিন অনাহারে রহিলেন। কেন যে এই কঠোর দণ্ড হইল কেহই বুঝিতে পারে না, স্বরূপদামোদর জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিদাসের প্রতি এই কঠোরদণ্ড কেন হইল ? চৈতন্যদেব বলিলেন, "যে বৈষ্ণব প্রকৃতি সম্ভাষণ করে, আমি তাহার মুখদর্শন করি না।" শিখি মাইতির ভগিনীর নিকট হইতে চাউল আনিয়াছিলেন, এই অপরাধে হরিদাসের প্রতি এই কঠিন দণ্ড হইয়াছিল. অথচ শিখি মাইতির ভগিনী পরম বৈষ্ণবী, বৃদ্ধা তপস্বিনী। বৈষ্ণবগণ, সাড়ে তিন পাত্রের মধ্যে তাঁহাকে অর্দ্ধপাত্র বলিতেন, স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ ও শিখি মাইতির অবশিষ্ট তিন পাত্র। তথাপি এমন ধার্ম্মিকা রমণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে ছোট হরিদাসের এই

কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছিল! স্বরূপদামোদর প্রভৃতি ভক্তগণ হরিদাসকে ক্ষমা করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে পরমানন্দ পুরীর দ্বারা অনুরোধ করা হইলে শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "আমি তাহা হইলে একাকী আলালনাথে চলিয়া যাইব"। আর কেহ কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। দুঃখে, অভিমানে, হরিদাস পুরী পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াগে চলিয়া গেলেন, এবং সেখানে বৎসরান্তে ত্রিবেণীতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এ কি কঠিন শাস্তি! উত্তরকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে নৈতিক শিথিলতার তুলনায় শ্রীচৈতন্যদেবের এই নৈতিক আদর্শ ও কঠোর শাসন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীচৈতন্যদেব নিজেও যে কঠিন নিয়মে আপনাকে আবদ্ধ রাখিতেন তাহার অনেক আভাস পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ে আর একটি ক্ষুদ্র ঘটনা হইয়াছিল তাহাতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময়ে পুরীতে একটি সুন্দরী বিধবা রমণী বাস করিতেন। তাঁহার একটি সুন্দর অল্পবয়স্ক পুত্র ছিল, সে সর্ব্বদা চৈতন্যদেবের নিকটে আসিত, তিনিও তাহাকে আদর করিতেন। ইহাতে দামোদর পণ্ডিত একদিন তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "সুন্দরী বিধবার পুত্রকে তুমি এত আদর কর, ইহাতে লোকাপবাদ হইতে পারে।" চৈতন্যদেব এই সতর্কতার জন্য দামোদরের প্রশংসা করিয়াছিলেন, এবং পরে তাঁহাকে নবদ্বীপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের মধ্যে নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় দামোদরকে তাহার শাসনের যোগ্যপাত্র ভাবিয়া তথায় প্রেরণ করেন।

স্থান ও পাত্র বিশেষে চৈতন্যদেব এই প্রকার কঠিন নৈতিক শাসনের যে ব্যতিক্রম করিতেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। চৈতন্য-

চরিতামৃতে লিখিত আছে যে, রায় রামানন্দ দুইজন অল্প বয়স্কা দেব-দাসীকে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নাটকের জন্য সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন, স্বহস্তে তাহাদের বেশ-ভূষাদি করিয়া দিতেন। ইহাতে রামানন্দ রায়ের আশ্চর্য্য নৈতিক বলেরও পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব এবং বৈষ্ণবগণ ইহা সত্ত্বেও তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের সম্ভবতঃ তিন বৎসর পরে রঘুনাথ দাস নীলাচলে আসিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হন। ইতিপূর্ব্বেই আমরা ইঁহার পরিচয় পাইয়াছি। রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে রঘুনাথ দাস শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সঙ্গে থাকিবার বাসনা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু সে সময়ে চৈতন্যদেবের পরামর্শে গৃহে ফিরিয়া বিষয়কর্ম্মে মন দেন, ইহাতে তাঁহার পিতামাতা অনেকটা আশ্বস্ত হন। শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া রঘুনাথ দাস নীলাচলে যাইবার জন্য ব্যগ্র হন। কিন্তু এই সময়ে জমিদারী-সংক্রান্ত বিষয় লইয়া মুসলমান রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের বিবাদ হয়। মুসলমান রাজপ্রতিনিধি আসিয়া তাঁহাদের বাড়ী ও জমিদারী ক্রোক করেন। রঘুনাথের পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত পলায়ন করেন, কর্ম্মচারীরা রঘুনাথ দাসকে বন্দী করিয়া উৎপীড়ন করেন। অবশেষে রঘুনাথ দাস মিষ্ট বাক্যে মুসলমান রাজকর্ম্মচারীদিগকে তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। মুসলমানেরা তাঁহাদের জমিদারী ও বাড়ী ইত্যাদি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর রঘুনাথ দাস নীলাচলে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একাধিকবার গোপনে পলায়নের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই; তাঁহার পিতা পথ হইতে তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়াছিলেন

এবং সর্ব্বদা প্রহরীর দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টিত রাখিতেন। একবার তিনি পিতার অনুমতি লইয়া পাণিহাটিতে নিত্যানন্দকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছানুসারে বহু অর্থব্যয়ে বৈষ্ণবগণকে চিড়াদইএর মহোৎসব দেন; এতদ্ভিন্ন প্রধান প্রধান বৈষ্ণবগণের জন্য বহু অর্থও দান করেন। গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের সঙ্গে নীলাচলবাসের ইচ্ছাও নিত্যানন্দকে জানান। অচিরে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে বলিয়া নিত্যানন্দ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। পাণিহাটি হইতে গৃহে প্রত্যাগমনের অল্পদিন পরেই রঘুনাথ দাস গৃহত্যাগের সুযোগ পান। একদিন শেষ রাত্রিতে জাগরিত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, প্রহরিগণ অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। সুযোগ বুঝিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন এবং পথ ছাড়িয়া বিপথ দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়া সমস্ত দিনে পনেরো ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যাকালে এক গোয়ালার বাথানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে উপবাসী দেখিয়া গোয়ালারা কিছু দুগ্ধ দিল; সেই দুগ্ধপান করিয়া তিনি সেখানে পড়িয়া রহিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া তিনি দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং ধরা পড়িবার ভয়ে প্রচলিত পথ ছাড়িয়া বিপথে বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন। পথে কোন দিন কিছু খাবার জোটে, কোন দিন জোটে না; এইরূপে ক্ষুধা তৃষ্ণা গ্রাহ্য না করিয়া বার দিনে তিনি পুরী পৌছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিন দিন মাত্র আহার হইয়াছিল। এদিকে তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে না দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তখন বর্ষার প্রাক্কাল; গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নীলাচল গমন করিতেছিলেন, রঘুনাথ দাসের পিতা মনে করিলেন, রঘুনাথ সেইসঙ্গে পুরী পলাইয়া গিয়াছেন। তিনি

শিবানন্দ সেনের নিকটে পত্র লিখিয়া রঘুনাথকে ফিরাইবার জন্য দশ জন পাইক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা গিয়া দেখিল, বৈষ্ণবদলে রঘুনাথদাস নাই। পাইকগণ ফিরিয়া সে সংবাদ দিল। বৈষ্ণবদল পুরীতে পৌছিবার অনেক পূর্ব্বেই রঘুনাথ দাস সেখানে পৌছিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীচৈতন্যদেব অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভক্তমণ্ডলীর নিকট তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং বিশেষভাবে স্বরূপদামোদরের হস্তে তাঁহার শিক্ষা ও সাধনের ভার অর্পণ করিলেন। অনাহারে ও পথশ্রমে তাঁহার শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছিল; তাহা দেখিয়া শ্রীচৈতন্যদেব গোবিন্দকে বলিলেন, ইহাকে সযত্নে আহার করাইও। কিন্তু রঘুনাথ দাস পাঁচ দিন মাত্র গোবিন্দের প্রদত্ত প্রসাদ ভক্ষণ করেন, তৎপরে জগন্নাথের সিংহদ্বারে ভিক্ষা করিয়া উদরযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। সারাদিন ধর্ম্মসাধনে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যাকালে সিংহদ্বারে দাঁড়াইতেন; যাত্রিগণ জগন্নাথ দর্শন করিয়া ফিরিবার সময়ে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ভিক্ষার্থিগণকে প্রসাদ ভিক্ষা দিতেন। রঘুনাথ দাস প্রথমতঃ কিছুদিন এইরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তৎপরে তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং মন্দিরের পার্শ্বে ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট পত্রাদিতে যে সামান্য অন্নাদি পড়িয়া থাকিত তাহাই সংগ্রহ করিয়া ভোজন করিতেন। একি বৈরাগ্য! যাঁহার পিতার আয় বিশ লক্ষ টাকা, একমাত্র উত্তরাধিকারী পুত্র, সেই অতুল ঐশ্বর্য্য, সুন্দরী স্ত্রী ত্যাগ করিয়া পথিপার্শ্বে পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করেন! শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণের এই ত্যাগ ও বৈরাগ্য ধর্ম্মজগতে অতুলনীয়।

যথাসময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নীলাচলে পৌছিলেন এবং পূর্ব্বের

ন্যায় চারি মাস তথায় অবস্থিতি করিয়া গৌড়ে প্রত্যাগমন করিলেন। রঘুনাথ দাসের পিতা গোবর্দ্ধন দাস তাঁহার সংবাদ জানিবার জন্য শিবানন্দ সেনের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। শিবানন্দ সেন, রঘুনাথ দাসের পুরীতে অবস্থিতি, তাঁহার প্রতি শ্রীচৈতন্যের কৃপা ও রঘুনাথ দাসের আশ্চর্য্য বৈরাগ্যের কথা লোকদিগকে বলিলেন। গোবর্দ্ধন দাস সংবাদ পাইয়া রঘুনাথ দাসের নিকট কিছু অর্থ ও দ্রব্য-সম্ভার পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়া কয়েকজন ভৃত্যকে শিবানন্দের নিকট পাঠাইলেন। শিবানন্দ সেন তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা একাকী সেখানে যাইতে পারিবে না। পরে আমরা যখন নীলাচলে যাইব সেই সময়ে আমাদের সঙ্গে যাইও।" তদনুসারে পর বৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বে গোবর্দ্ধন দাস চারিশত মুদ্রা দিয়া দুইজন ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যকে নীলাচলে রঘুনাথ দাসের নিকট প্রেরণ করিলেন। রঘুনাথ দাস প্রথমে তাহা গ্রহণ করেন নাই; পরে তাহা হইতে কিছু কিছু অর্থ লইয়া মাসে দুই দিন চৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করাইতেন। কিন্তু কিছুকাল পরে তাহাও বন্ধ করিয়া দিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, বিষয়ীর অন্ন ভক্ষণ করিলে মন কলুষিত হয়, আমি দুঃখিত হইব বলিয়া প্রভু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হয় না। রঘুনাথ দাস পুরীতে থাকিয়া চৈতন্যদেব ও স্বরূপদামোদরের নির্দ্দেশ অনুসারে শিক্ষা ও সাধন করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম চরিতামৃতে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে।

"গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম বার্ত্তা না কহিবে;
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।

অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে;
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।"

এই সময়ে বল্লভভট্টের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের আর একবার সাক্ষাৎ হয়। তিনি সম্ভবতঃ তীর্থদর্শনের জন্য নীলাচলে আসিয়াছিলেন; হয়ত চৈতন্যদেবের সহিত মিলনও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। যে কয়দিন তিনি নীলাচলে ছিলেন সর্ব্বদাই চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। কিন্তু তাঁহাদের মিলন বিশেষ প্রীতিকর হইত বলিয়া মনে হয় না। চৈতন্যদেবের জীবনচরিত লেখক বল্লভভট্টকে অহঙ্কারী ও জিগীষাপ্রবৃত্তিপরায়ণ বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। চৈতন্যদেব সে জন্য তাঁহার সঙ্গ ভালবাসিতেন না। বল্লভভট্ট তাঁহার নিকটে আসিলে সাধারণ ভদ্রভাবে আলাপাদি করিতেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ আন্তরিকতা ছিল না। বল্লভভট্ট স্বীয়কৃত ভাগবতের টীকা পাঠ করিয়া চৈতন্যদেবকে শুনাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়-ছিলেন বলিয়া তিনি তাহা শোনেন নাই। বল্লভভট্ট বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে শ্রীচৈতন্যের কৃতিত্বের বহু প্রশংসা করিলে চৈতন্যদেব নিজে সে গৌরব না লইয়া অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ, রামানন্দ রায় প্রভৃতি সহযোগিগণের সে গৌরব প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্তগণের মধুর ব্যবহার দেখিয়া এবং তাঁহাদের অদ্ভুত কীর্ত্তন শুনিয়া বল্লভভট্টের অহঙ্কার খর্ব্ব হইয়াছিল, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এরূপ আভাস দিয়াছেন। কিন্তু এই চিত্র কতটা যথার্থ তাহা বলা যায় না। পুরী অবস্থানকালেও বল্লভভট্ট একাধিকবার সদলে চৈতন্যদেবকে নিজ বাসস্থানে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করাইয়াছিলেন।

এই সময়ে রামচন্দ্র পুরী নামে আরও একজন বৈষ্ণব আচার্য্য

নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন; কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার চরিত্র যেরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা প্রীতিকর নহে। তিনি তাঁহাকে পরছিদ্রান্বেষী বিশ্বনিন্দুক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রামচন্দ্র পুরী সুবিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন। কিন্তু শিষ্য হইয়া তিনি গুরুকে উপদেশ দিতে গিয়াছিলেন! মাধবেন্দ্র পুরী "মথুরা পাইলাম না" অর্থাৎ প্রেম হইল না বলিয়া একবার কাতরোক্তি করিতেছিলেন তখন রামচন্দ্র পুরী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আপনি ব্রহ্মবিদ্ হইয়া কেন এইরূপ কাতরতা প্রকাশ করেন?

মাধবেন্দ্র পুরী তখন তাঁহাকে "দূর দূর" বলিয়া তাড়াইয়া দেন। নীলাচলে আসিয়া রামচন্দ্র পুরী, চৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্তগণের ছিদ্রানুসন্ধান ও নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য জানিয়া গুরুর মত সম্মান করিতেন। পরমানন্দ পুরী ও রামচন্দ্র পুরীকে লইয়া নিভৃতে ধর্ম্মালাপ করিতেন। কিন্তু রামচন্দ্র পুরী, চৈতন্যদেব ও তাঁহার শিষ্যগণ অতিভোজন করেন বলিয়া নিন্দা করিতেন। চৈতন্যদেবের নিত্য আহারের জন্য চারিপণ কড়ির প্রসাদ আনা হইত; তাহাতে চৈতন্যদেব ও তাঁহার দুইজন ভৃত্য গোবিন্দ ও কাশীশ্বরের আহার হইত। রামচন্দ্র পুরী তাঁহার অতিভোজনের অপবাদ করিতেছেন শুনিয়া চৈতন্যদেব ভৃত্য গোবিন্দকে আদেশ করিলেন, "এখন হইতে এক চৌথি ভাত ও পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন, আনা হইবে।" ভক্তগণ এই কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। কাশীশ্বর ও গোবিন্দ পেট ভরিয়া খাইতে না পারিয়া দিন দিন কৃশ হইতে লাগিল। চৈতন্যদেব তাহাদিগকে অন্যত্র ভিক্ষা করিতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু নিজে অর্দ্ধভুক্তই থাকিতেন। ভক্তগণ ইহাতে

অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা সদলে আসিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট আহার করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "রামচন্দ্র পুরীর স্বভাবই পরনিন্দা করা"। একদিন জগদানন্দকে নিজে অনুরোধ করিয়া আহার করাইয়া আহারান্তে অতিভোজনের নিন্দা করিয়াছেন, বলিলেন। ভক্তদের দুঃখ ও নির্ব্বন্ধ দেখিয়া চৈতন্যদেব দুইপণ কড়ির অন্ন ও ব্যঞ্জন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিছুদিন পরে রামচন্দ্র পুরী নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, ইহাতে ভক্তগণ নিশ্চিন্ত ও সুখী হইল।

এইসময়ে আর একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে চৈতন্যদেবের ব্যবহার ও তাঁহার প্রতি রাজা প্রতাপরুদ্রের ভক্তি উভয়েই অতি সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি ভবানন্দ রায়ের পরিবার শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় ছিল। তাঁহার পুত্র গোপীনাথ রাজা প্রতাপরুদ্রের কর্ম্মচারী ছিলেন। রাজকোষের অর্থ অপচয় অভিযোগে একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী তাঁহাকে ধরিয়া চাঙে চড়াইবার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে অপরাধীকে উচ্চমঞ্চের উপর চড়াইয়া নিম্নে উন্মুক্ত তরবারী রাখা হয় এবং যথাসময়ে মঞ্চ হইতে তরবারীর উপর ফেলিয়া প্রাণবধ করা হয়। রাজকোষ হইতে অপহৃত দুইলক্ষ কাহন কড়ি না দিলে গোপীনাথকে এইরূপে বধ করা হইবে, এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল। একজন লোক আসিয়া চৈতন্যদেবকে গোপীনাথের আসন্ন বিপদের কথা জানাইল; চৈতন্যদেব বলিলেন, "রাজকোষের অর্থ অপহরণ করিলে অপরাধীর ত শাস্তি হইবেই, ইহাতে রাজার ত দোষ নাই। আমি বিষয় নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী, আমি আর ইহাতে কি করিব?" ইতিমধ্যে আর একজন লোক আসিয়া বলিল, "রাজার লোকেরা বাণীনাথ প্রভৃতি সকলকে সবংশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এই সংবাদেও চৈতন্যদেব পূর্ব্বের ন্যায় উদাসীন

থাকিলেন; তখন স্বরূপাদি ভক্তগণ আসিয়া বলিলেন, "ভবানন্দ রায়ের পরিবার তোমার প্রিয়, তাহাদের এই বিপদে তোমার উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য নহে।" তদুত্তরে চৈতন্যদেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি বিষয়ত্যাগী সন্ন্যাসী, আমি এই বিষয় কি করিব? তোমরা কি বল আমি রাজদ্বারে গিয়া ভিক্ষা করিব? আর আমি পাঁচগণ্ডা কড়ির সন্ন্যাসী, আমি চাহিলেই বা দুইলক্ষ কাহন কড়ি কে দিবে? তোমরা যদি ভবানন্দ রায়ের পরিবারকে বাঁচাইতে চাও, সকলে মিলিয়া জগন্নাথের চরণে প্রার্থনা কর। এই বিপদে তিনিই রক্ষা করিতে পারেন।"

ইত্যবসরে হরিচন্দন নামক আর একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "গোপীনাথ তোমার ভৃত্য, তাহার প্রাণবধ করা তোমার উপযুক্ত নয়, বিশেষতঃ প্রাণবধ করিলে ত অর্থ পাওয়া যাইবে না; যে অর্থ নষ্ট হইয়াছে আমরা তাহা চাই। উপযুক্ত মূল্যে তাহার দ্রব্যসকল গ্রহণ করুন, যাহা বাকি থাকে ক্রমে ক্রমে আদায় করিয়া লওয়া যাইবে।" রাজা প্রতাপরুদ্র এই পরামর্শ যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে অনুমতি দিলেন। হরিচন্দন রাজার আদেশ জানাইয়া গোপীনাথকে মুক্ত করিলেন।

সেদিন কাশী মিশ্র যখন চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, তখন তিনি কাশী মিশ্রকে বলিলেন, "আমি আর এখানে থাকিব না, আলালনাথে যাইব। আমি সন্ন্যাসী, নির্জ্জনে থাকিতে চাই, এখানে নানা উপদ্রব। ভবানন্দ রায়ের পুত্রেরা রাজকার্য্য করে। রাজার অর্থ নষ্ট করিলে অবশ্যই তিনি শাস্তি দিবেন; তাহাতে তাঁহার কোন দোষ নাই। কিন্তু লোকে আসিয়া আমাকে বিরক্ত করে। আজ গোপীনাথ ধৃত হইলে চারিবার আমার নিকটে লোকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছিল। ভাগ্যক্রমে এই যাত্রায় রক্ষা পাইয়াছে। আবার যদি

এইরূপ হয় কে রক্ষা করিবে? এই বিষয়কোলাহলের মধ্যে আমি আর থাকিতে চাহি না।" এই কথা শুনিয়া কাশী মিশ্র অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন, "আপনি কেন এখান হইতে যাইবেন? আপনি নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী, বিষয় ব্যাপারের সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ নাই। বৈষয়িক স্বার্থের জন্য যাহারা আপনার শরণাপন্ন হয় তাহারা মূঢ়। গোপীনাথ বৈষয়িক ব্যাপারে আপনার সাহায্য চায় না, মূর্খ লোকেরা আসিয়া তাহার জন্য আপনাকে বিরক্ত করিয়াছে। আপনি এইসকল ব্যাপারে কর্ণপাত করিবেন না, নিশ্চিন্ত মনে এখানে অবস্থান করুন।" এইকথা বলিয়া কাশী মিশ্র বিদায় লইলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্রের এক নিয়ম ছিল, যতদিন তিনি পুরীতে বাস করিতেন প্রত্যহ মধ্যাহ্নে আসিয়া স্বীয় গুরুদেব কাশী মিশ্রের পাদসংবাহন করিতেন ও তাঁহার নিকটে জগন্নাথের সেবার বিবরণ শুনিতেন। সেদিন রাজা কাশী মিশ্রের গৃহে আসিলে তিনি চিন্তিত অন্তঃকরণে রাজাকে বলিলেন, "শ্রীচৈতন্যদেব পুরী ছাড়িয়া আলালনাথ যাইতেছেন।" এই সংবাদে রাজা অতিশয় দুঃখিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কাশী মিশ্র গোপীনাথ পট্টনায়ক সংক্রান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত ও চৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা ব্যক্ত করিলেন। তদুত্তরে রাজা প্রতাপরুদ্র বলিলেন, "দুই লক্ষ কাহন কড়ি কি ছার, সমুদয় রাজ্য ধন দিয়াও যদি প্রভুকে এখানে রাখিতে পারি, তাহাতে আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিব। আমি গোপীনাথের সমুদয় অর্থ ছাড়িয়া দিলাম।" কাশী মিশ্র বলিলেন, "গোপীনাথের অর্থ ছাড়িয়া দিলে চৈতন্যদেব সুখী হইবেন না। তাহা তাঁহার ইচ্ছা নহে, রাজকোষে যাহা প্রাপ্য তাহা নিশ্চয়ই লইবেন; কিন্তু তাহার দুঃখে তিনি দুঃখিত হইয়াছেন। আপনি তাঁহার জন্য গোপীনাথকে মার্জ্জনা

করিয়াছেন শুনিলে অধিকতর অসুখী হইবেন। রাজা বলিলেন, "আমি তাঁহার অনুরোধে গোপীনাথকে মার্জ্জনা করিতেছি না। গোপীনাথ আমার প্রিয় ভৃত্য; ভবানন্দরায়কে আমি সম্মান করি; তাহার পুত্রগণ সকলেই আমার প্রীতিভাজন। রায় রামানন্দকে রাজমহেন্দ্রীর শাসনকর্ত্তা করিয়াছিলাম, তিনি যেরূপ ইচ্ছা অর্থব্যয় করিয়াছেন, গোপীনাথও সেইরূপ করিবে, সে পূর্ব্বপদেই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং এখন হইতে তাহার বেতন দ্বিগুণ হইবে।" কাশী মিশ্র চৈতন্যদেবকে গোপীনাথের দুই কাহন কড়ির মার্জ্জনার সংবাদ দিলে চৈতন্যদেব বলিলেন, "মিশ্র, তুমি কি করিলে? আমাকে রাজার দান প্রতিগ্রহ করাইলে?" তদুত্তরে কাশী মিশ্র রাজা যেরূপ বলিতে বলিয়াছিলেন, সেইকথা জানাইলেন, বলিলেন, "তোমার জন্য রাজা গোপীনাথকে মার্জ্জনা করেন নাই, ভবানন্দের পুত্রেরা তাঁহার প্রিয় বলিয়া তিনি গোপীনাথকে মার্জ্জনা করিয়াছেন।" ইত্যবসরে ভবানন্দ রায় তাঁহার পাঁচপুত্রকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং গোপীনাথের মুক্তির জন্য তাঁহার নিকট অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। গোপীনাথও তাঁহার চরণে পড়িয়া একান্ত দীনভাবে বলিলেন, "রামানন্দ রায় ও বাণীনাথকে যেমন বিষয়মুক্ত করিয়াছ, আমাকেও তাহাই কর।" চৈতন্যদেব তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "সকলে বিষয় ত্যাগ করিলে তোমাদের বৃহৎ পরিবারের ব্যয় নির্ব্বাহ কিরূপে হইবে? ধর্ম্মপথে থাকিয়া রাজার কার্য্য কর; কিন্তু আমার একটি কথা মনে রাখিও, রাজার অর্থ ব্যয় করিও না।"

এইরূপে মাঝে মাঝে একটি তরঙ্গ তুলিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের শান্ত জীবনধারা বহিতে লাগিল। দিবসে জগন্নাথ দরশন, ভক্তগণ সঙ্গে নৃত্য ও কীর্ত্তন, সমাগত বৈষ্ণবগণের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা, এবং রাত্রিতে

স্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দের সঙ্গে গভীর তত্ত্বকথা ও প্রেমরসাস্বাদনে দিনগুলি কাটিয়া যাইত। প্রতি বৎসর নিয়মিত সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহার সঙ্গে মিলনের জন্য নীলাচলে আসিতেন এবং চারিমাস তথায় অবস্থিতি করিতেন। তাঁহাদের আগমনে দিনগুলি অধিকতর আনন্দে কাটিত। ভক্ত অদ্বৈতাচার্য্য অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়াও দূর ও সঙ্কট-পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া বৎসর বৎসর নীলাচলে আসিতেন। প্রেমিক নিত্যানন্দও নিষেধ সত্ত্বেও প্রায় প্রতিবৎসরই শ্রীচৈতন্যের সঙ্গ-লাভের জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সঙ্গে পুরী আগমন করিতেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীবাসপণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য্য, বুদ্ধিমন্ত খান, সঞ্জয়, বাসুদেব দত্ত, শুক্লাম্বর, শ্রীমান পণ্ডিত, কুলীনগ্রাম ও খণ্ডনিবাসী পূর্ব্ব পরিচিত ভক্তগণ এবং আরও অনেক নূতন বৈষ্ণব রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। যত দিন যাইতেছিল, নূতন নূতন লোক শ্রীচৈতন্যের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিলেন। নূতন যাত্রীদের মধ্যে এক-জনের নাম পরমেশ্বর মোদক; সে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের প্রতিবেশী মিষ্টান্নবিক্রেতা ছিল। শ্রীচৈতন্য বাল্যকালে অনেক সময়ে তাহার দোকানে গিয়া মিষ্টান্নাদি ভক্ষণ করিতেন। সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের মহত্ত্বের কথা শুনিয়া এখন তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল; সেই উদ্দেশ্যে রথযাত্রার সময় ভক্তদের সঙ্গে পুরী আসিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের নিকটে আসিয়া বলিল, "মুই পরমেশ্বরা"। তাহাকে দেখিয়া চৈতন্যদেবের বাল্যের কথা স্মরণ হইল এবং পরমপ্রীতি প্রকাশ করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আর এক বৎসর কালিদাস নামক একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীচৈতন্যকে দেখিতে আসিয়াছিলেন; ইনি রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি খুড়া হইতেন; অতি উদার, সরল, ব্যাকুলাত্মা লোক ছিলেন। নিরন্তর হরিনামে ডুবিয়া থাকিতেন; ইঁহার একটি নিয়ম

ছিল যে জাতিনির্ব্বিশেষে বৈষ্ণবদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতেন। সহজেই না পারিলে লুকাইয়া পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট পাত্র হইতে ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করিয়া খাইতেন। ঝড়ু নামে একজন ভুঁইমালী বৈষ্ণব ছিল; সে খুব নীচ জাতি। কালিদাস একদিন কিছু আম্রফল লইয়া তাহার নিকটে গেলেন এবং তাহা উপহার দিয়া তাহার সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিলেন। বিদায় কালে তাহার পদধূলি গ্রহণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু ঝড়ু নীচজাতি বলিয়া তাহা করিতে দিলেন না। ঝড়ু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দূর আসিল। সে ফিরিয়া গেলে যেখানে তাহার পদ-চিহ্ন ছিল তথাকার মৃত্তিকা লইয়া কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে মাখিল। তৎপরে তিনি নিকটে একস্থানে লুকাইয়া রহিলেন। ঝড়ু গৃহে ফিরিয়া কালিদাস প্রদত্ত আম খোসা ছাড়াইয়া খাইল; তৎপরে তাহার স্ত্রীও সেই আম খাইয়া আঁটি খোলা প্রভৃতি বাহিরে ফেলিয়া দিলেন; তখন কালিদাস গোপন স্থান হইতে বাহির হইয়া সেই উচ্ছিষ্ট ও আঁটি চুষিয়া চুষিয়া খাইলেন। এই কালিদাস পুরী আসিলে চৈতন্যদেব তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনায় বুঝিতে পারা যায় তখনকার বৈষ্ণবমণ্ডলীতে ভক্তি ও ব্যাকুলতার প্রবাহে জাতিভেদের বন্ধন কেমন শিথিল হইয়া গিয়াছিল।

শিবানন্দ সেন সর্ব্বদা পুরী যাত্রীদের নেতা ও পথপ্রদর্শক হইতেন। বোধহয় পুরীর পথ তাঁহার ভালরূপ জানা ছিল এবং তিনি বেশ বিচক্ষণ লোকও ছিলেন। সেই সময়ে পথ অতি বিপদসঙ্কুল ছিল। এতগুলি বৃদ্ধ স্ত্রীলোক ও বালককে লইয়া দীর্ঘপথ যাত্রা সহজ ব্যাপার ছিল না। শিবানন্দ সেন বিশেষ যত্ন ও শ্রমসহকারে যাত্রীদিগের বাসস্থান আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন। একদিন একটি নদী পার হওয়ার পরে মাঝিদের সঙ্গে পারের পয়সা চুক্তি করিতে তাঁহার ঘাটে

বিলম্ব হইয়াছিল। যাত্রীগণ ততক্ষণে অগ্রসর হইয়া গ্রামের মধ্যে গেলেন, সেখানে তখনও তাঁহাদের বাসা স্থির হয় নাই। শিবানন্দ আসিতেছেন না দেখিয়া নিত্যানন্দ অধীর হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে গালি দিতে লাগিলেন এবং অবশেষে শিবানন্দ তাহার তিন ছেলের মাথা খাক্ বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। যাত্রীদলে শিবানন্দের স্ত্রী ছিলেন; স্বভাবতঃই তিনি অভিসম্পাত শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শিবানন্দ সেখানে পৌছিলে নিত্যানন্দ ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে লাথি মারিলেন; কিন্তু শিবানন্দ তাহাতেও বিরক্ত না হইয়া অসুবিধার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এই ঘটনায় বৈষ্ণবদিগের অসাধারণ সাধুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

ভক্তগণ স্ব স্ব গৃহ হইতে শ্রীচৈতন্যের প্রিয় খাদ্যদ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া সযত্নে দীর্ঘপথ বহন করিয়া আনিতেন এবং কখনও বা তাঁহার নিজ বাসস্থানে চৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইতেন অথবা তাঁহার আহারের জন্য ভৃত্য গোবিন্দের হস্তে অর্পণ করিতেন। এইরূপে বহু খাদ্যদ্রব্য গৃহে জমিয়া যাইত; ভক্তগণ প্রত্যেকে আপনাপন খাদ্য-দ্রব্য শ্রীচৈতন্যদেব আস্বাদন করিলেন কি না গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেন। চৈতন্যদেব বোধহয় ভোজননিপুণ ছিলেন, তথাপি এত খাদ্য খাইয়া উঠিতে পারিতেন না। এক একদিন গোবিন্দ ভক্তগণ দুঃখিত হইতেছেন বলিয়া জোর করিয়া অনেক খাওয়াইতেন। পানি-হাটির রাঘব পণ্ডিত প্রতিবৎসর একটি থলিতে করিয়া বহু খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিতেন। তাঁহার স্ত্রী দময়ন্তী দেবী সারা বৎসর ধরিয়া বিবিধ মিষ্টান্ন, আচার প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেন।

"আম্র কাশন্দি, আদা কাশন্দি, ঝাল কাশন্দি নাম
নেম্বু আদা আম্রকলি বিবিধ সন্ধান।

আম্‌সি, আম্রখণ্ড, তৈলাম্র, আমতা ;
যত্ন করি গুণ্ডা করি পুরাণ শুকুতা।

ধনিয়া মোহুরী তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া ;
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া।
শুষ্ঠীখণ্ড নাড়ু আর আমপিত্ত হর ;
পৃথক পৃথক বান্ধিয়াছে কুথলী ভিতর।
কোলি শুষ্ঠী, কোলিচূর্ণ, কোলিখণ্ড আর ;
কত নাম লব যত প্রকার আচার।
নারিকেলখণ্ড নাড়ু, নাড়ু গঙ্গাজল ;
চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার করিল সকল।
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার
অত র আদি অনেক প্রকার।
শালিকা চুটি ধান্যের আতপ চিড়াকরি
নূতন বস্ত্রের বড় কুথলী সবভরি ;
কথক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া ;
চিনিপাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া।
শালি তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিয়া
ঘৃত সিক্ত চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া
কর্পূর মরিচ এলাচ লবঙ্গ রসবাস
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস।
শালি ধান্যের খৈ ঘৃতেতে ভাজিয়া
চিনি পাকে উখরা কৈল কর্পূরাদি দিয়া।

ফুট কলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল;
চিনি পাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু কৈল।

গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছাঁকিয়া
পাঁচ কুড়ি করি দিল গন্ধদ্রব্য দিয়া।
পাতল মৃৎপাত্রে সেন্দাদি নিল ভরি
আর সব বস্ত্র ভ'রে বস্ত্রের কুথলী।

চৈঃ, চঃ, অন্ত্যলীলা, ১০মঃ, পঃ।

এইসব দ্রব্য পৃথক পৃথক থলিতে ভরিয়া একটি বৃহৎ ঝালি করা হইত। তিনজন বাহক ক্রমান্বয়ে এই ঝালি বহন করিয়া লইয়া যাইত। পুরীতে পৌছিয়া গোবিন্দের হস্তে তাহা দেওয়া হইত; গোবিন্দ সযত্নে তাহা রক্ষা করিত এবং সারাবৎসর ধরিয়া প্রয়োজনমত শ্রীচৈতন্যের আহারের জন্য তাহা ব্যবহার করিতেন। বৈষ্ণবমণ্ডলীতে 'রাঘবের ঝালি' নামে ইহা প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কত ভক্তি ও ভালবাসা থাকিলে মানুষ এইরূপ করিতে পারে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। চৈতন্যদেবের ভক্তগণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির কথা চিন্তা করিলে মুগ্ধ হইতে হয়, তিনিও ভক্তদিগকে তদনুরূপ ভালবাসিতেন; ভালবাসা না দিলে ভালবাসা পাওয়া যায়? চৈতন্যদেব ও তাহার ভক্তগণের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর এক অমূল্য জিনিষ।

ভক্তগণের মধুর ভালবাসার বিষয়ে এখানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। পণ্ডিত জগদানন্দ চৈতন্যদেবের অতি প্রিয় ও অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহাকে বৎসর বৎসর শচীমাতাকে দেখিবার জন্য নবদ্বীপ পাঠাইতেন। কর্ত্তব্যবোধে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও

চৈতন্যদেব মাতার প্রতি অতিশয় স্নেহশীল ছিলেন। যথাসম্ভব তাঁহার দুঃখ ও বেদনা উপশম করিতে চেষ্টা করিতেন। জগদানন্দের দ্বারা অনেক প্রবোধবাক্য বলিয়া পাঠাইতেন। সময়ে সময়ে এমনও বলিতেন যে আমার মতিভ্রম হইয়াছিল সেইজন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলাম। ইহা বোধ হয় সাময়িক উত্তেজনা সম্ভূত অত্যুক্তি। কিন্তু চৈতন্যদেব জননীর দুঃখেতে উদাসীন ছিলেন না, তাহা নিশ্চিত। পুরী-প্রত্যাগত বৈষ্ণবের দ্বারা সর্ব্বদা জননীকে সান্ত্বনা দিতেন। এতদ্ভিন্ন বিশেষভাবে জগদানন্দকে নবদ্বীপে জননীর নিকটে পাঠাইতেন। একবার জগদানন্দ গৌড়ে গিয়া শিবানন্দ সেনের গৃহে উৎকৃষ্ট চন্দনাদি তৈল দেখিলেন। চৈতন্যদেবকে তাহা ব্যবহার করিতে দিবেন এই ইচ্ছা করিয়া এক কলস তৈল সঙ্গে লইয়া আসিলেন। পুরী পৌঁছিয়া ভৃত্য গোবিন্দের হস্তে তৈলপাত্র প্রদান করতঃ বলিলেন, "প্রত্যহ প্রভুর মস্তকে এই তৈল কিছু মর্দ্দন করিয়া দিও। গোবিন্দ যখন চৈতন্যদেবকে এই প্রস্তাব জানাইলেন, তিনি বলিলেন, "সন্ন্যাসীর তৈলে অধিকার নাই, বিশেষতঃ সুগন্ধি তৈল। জগদানন্দ পণ্ডিত বহুশ্রম করিয়া গৌড় হইতে তৈল আনিয়াছেন, জগন্নাথের প্রদীপে এই তৈল ব্যবহারের জন্য দাও, তাহা হইলে তাঁহার শ্রম সার্থক হ'বে। জগদানন্দ পণ্ডিত গোবিন্দের নিকট এইকথা শুনিয়া অতিশয় ক্ষুন্ন হইলেন। কয়েকদিন পরে পণ্ডিত পুনরায় গোবিন্দের দ্বারা এই তৈল ব্যবহারের জন্য শ্রীচৈতন্যকে অনুরোধ জানাইলেন। এইবার তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তাহা হইলে একজন তৈল মাখাইবার লোক নিযুক্ত কর। অমি যখন পথ দিয়া যাইব, তৈলের সুগন্ধ পাইয়া লোকে আমাকে বিলাসী বলিয়া উপহাস করিবে। তাহা হইলে তোমরা সুখী হইবে।" পরদিন জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিত আসিলে চৈতন্যদেব বলিলেন, "তুমি গৌড় হইতে বহু শ্রম

করিয়া আমার জন্য সুগন্ধি তৈল আনিয়াছ; কিন্তু সন্ন্যাসীর তৈল ব্যবহার নিষেধ, অতএব ঐ তৈল জগন্নাথকে দাও। মন্দিরে তাঁহার প্রদীপে ব্যবহার হইবে, তাহা হইলে তোমার শ্রম সার্থক হইবে।" জগদানন্দ অতিশয় অভিমানী। তিনি বলিলেন, "কে তোমাকে বলিল, আমি তোমার জন্য তৈল আনিয়াছি" এই বলিয়া গৃহভ্যন্তর হইতে তৈল কলস আনিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তৎপরে নিজগৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইয়া রহিলেন। পর দিন প্রভাতে চৈতন্যদেব জগদানন্দের বাসস্থানে গিয়া দ্বারে আঘাত করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, ওঠ। আজ তোমার গৃহে আমার ভিক্ষা হইবে;" তখন জগদানন্দ দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন এবং রন্ধনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নে চৈতন্যদেব ভোজনের জন্য আসিলেন। জগদানন্দ বিবিধ ব্যঞ্জন ও পিষ্ঠকাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন! চৈতন্যদেবের ভোজনের জন্য বহু অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিলেন। চৈতন্যদেব জগদানন্দকেও তাঁহার সঙ্গে আহারে বসিতে বলিলেন; তিনি বলিলেন "তুমি ভোজন কর, আমি পরে বসিব।" চৈতন্যদেব অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলেন। ভয়ে কিছু বলিতে পারেন না; জগদানন্দ যত দেন ততই খাইয়া যান, অবশেষে বলিলেন, "পণ্ডিত, আর ত পারি না। তোমার ভয়ে দশগুণ বেশী খাইয়াছি, এখন শেষ কর।" আহারান্তে চৈতন্যদেব ভৃত্য গোবিন্দকে পাঠাইয়া জগদানন্দের আহার সমাপ্তির সংবাদ লইলেন, তৎপরে নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন।

শ্রীচৈতন্যের প্রতি জগদানন্দের অনুরাগের আরও একটি দৃষ্টান্ত আছে। চৈতন্যদেব কদলীবৃক্ষের শুষ্ক খোলার উপরে শয়ন করিতেন। তাঁহার শীর্ণ দেহে তাহাতে কষ্ট হইতেছে দেখিয়া ভক্তগণ সকলেই দুঃখ পাইতেন। জগদানন্দ সূক্ষ্মবস্ত্র গিরিমাটীতে রাঙ্গাইয়া তাহার ভিতরে

শিমূলের তুলা ভরিয়া চৈতন্যদেবের জন্য তোষক ও বালিস প্রস্তুত করিয়া গোবিন্দকে শয্যা প্রস্তুত করিবার জন্য দিলেন। স্বরূপদামোদরকে বলিলেন, "শয়নকালে আপনি উপস্থিত থাকিয়া প্রভুকে ইহার উপরে শয়ান করাইবেন। শয়ান সময়ে চৈতন্যদেব তুলার শয্যা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কোথায় পাইলে ? ,স্বরূপদামোদর বলিলেন, "কঠিন শয্যাতে আপনার ক্লেশ হয় দেখিয়া দামোদর পণ্ডিত ইহা প্রস্তুত করাইয়াছেন। আপনি ব্যবহার না করিলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইবেন।" চৈতন্যদেব বলিলেন, "তাহা হইলে একখানি খাট লইয়া আইস। আমি সন্নাসী, জগদানন্দ আমাকে বিষয় ভোগ করাইতে চান।" গোবিন্দকে তুলার শয্যা সরাইতে বলিয়া, পূর্ব্বমত কলার খোলার শয্যায় শয়ন করিলেন। জগদানন্দ এইকথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কয়েকদিন পরে তিনি চৈতন্যদেবের নিকটে বৃন্দাবন যাইবার অনুমতি চাহিলেন, তাঁহার উপর অভিমান করিয়া বৃন্দাবন যাইতে চাহিতেছেন মনে করিয়া চৈতন্যদেব অনুমতি দিলেন না। জগদানন্দ পণ্ডিত বলিলেন, "অনেক দিন হইতে আমায় বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা ; ইতিপূর্ব্বেও আপনার নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি তখন অনুমতি দেন নাই। অবশেষে স্বরূপদামোদরের অনুরোধে চৈতন্যদেব তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যকে ছাড়িয়া জগদানন্দ পণ্ডিত দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে থাকিতে পারিলেন না। মাস দুই সনাতন গোস্বামীর সহিত বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া পুরী প্রত্যাগমন করেন। এ সময়েও শ্রীচৈতন্যের মনে পুনরায় বৃন্দাবন গমনের সংকল্প ছিল। কেননা, দেখা যায় জগদানন্দের দ্বারা সনাতন গোস্বামীকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে তাঁহার জন্য একটি বাসস্থান স্থির করিয়া রাখেন। কার্য্যতঃ সে সংকল্প পূর্ণ হয় নাই।

এইসময়ে চৈতন্যদেবের ভক্তমণ্ডলীতে মৃত্যুর দূত প্রথম প্রবেশ করে। সামান্য অসুস্থতার পরে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে প্রাচীন বৈষ্ণব হরিদাস ঠাকুর দেহত্যাগ করেন। ঠিক কোন্ বৎসরে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না; তবে মনে হয় চৈতন্যদেবের তিরোধানের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই এই বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। চৈতন্য-দেব নিত্য নিয়মিতরূপে হরিদাসকে দেখিবার জন্য তাঁহার বাসস্থানে আসিতেন; একদিন শুনিতে পাইলেন যে তিনি আহার করেন নাই, কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে সেদিন তাঁহার নিয়মিত সংখ্যক নাম লওয়া পূর্ণ হয় নাই। ধর্ম্মজীবনের প্রথম উন্মেষ হইতেই হরিদাস প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম জপ করিতেন। সেদিন শারীরিক দুর্ব্বলতাবশতঃ নামের সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই। চৈতন্য-বৈষ্ণব-মণ্ডলীতে হরিদাস সাধননিষ্ঠার আদর্শস্বরূপ ছিলেন; এইজন্য তিনি নাম সাধনের অবতার বলিয়া বিদিত হইয়াছেন। চৈতন্যদেব বলিলেন, "এখন তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, নামের সংখ্যার হ্রাস কর, কিন্তু হরিদাস তাহাতে সম্মত হইলেন না; তিনি বলিলেন, "আমার যাইবার সময় হইয়াছে, আমার একান্ত ইচ্ছা যে আপনাকে দেখিতে দেখিতে এ দেহ ত্যাগ করি।" চৈতন্যদেব বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা ভগবান অবশ্যই পূর্ণ করিবেন, কিন্তু আমাকে ত্যাগ করিয়া তোমার যাওয়া কি উচিত? তোমাকে লইয়াই আমার সমুদয় সুখ।" হরিদাস বলিলেন, "তোমার মণ্ডলীতে কত ভক্ত শিরোমণি রহিয়াছেন, আমার মত একটি ক্ষুদ্র কীট গেলে তোমার কি ক্ষতি?" এইরূপ কথোপকথনের পরে চৈতন্যদেব মধ্যাহ্নে নিজগৃহে গমন করেন। পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব-গণসহ হরিদাসের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। অঙ্গনে বৈষ্ণবদল কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, বক্রেশ্বর পণ্ডিত বহুক্ষণ নৃত্য করিলেন; চৈতন্যদেব

সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ প্রভৃতির নিকটে হরিদাসের অনেক প্রশংসা করিলেন। হরিদাস শ্রীচৈতন্যকে নিকটে বসাইয়া বৈষ্ণবগণের পদধূলি গ্রহণ করিলেন, ও নাম করিতে করিতে মহাযোগেশ্বরের ন্যায় স্বচ্ছন্দে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। চৈতন্যদেব হরিদাসের মৃতদেহ কোলে লইয়া নাচিতে লাগিলেন, চারিদিকে বৈষ্ণবগণের সঙ্কীর্ত্তন হইল, শ্রীচৈতন্যের আবেশ দেখিয়া ভক্তগণ সকলেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিছুক্ষণ সঙ্কীর্ত্তনের পরে হরিদাসের দেহ সমুদ্রধারে লইয়া যাওয়া হইল; সমুদ্র-জলে তাঁহাকে স্নান করাইয়া ডোর, মালা, চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করতঃ সমুদ্রতীরে বালুকামধ্যে দেহ প্রথিত করা হইল ও তদুপরি সমাধি রচনা করা হইল। শ্রীচৈতন্য ভক্তগণকে লইয়া হরিদাসের সমাধি প্রদক্ষিণ করতঃ বহুক্ষণ নৃত্য ও কীর্ত্তন করিলেন; তৎপরে সকলে সমুদ্রে স্নান করিয়া সিংহদ্বারে আগমন করিলেন। সেখানে স্বয়ং চৈতন্যদেব অঞ্চল পাতিয়া দোকানদারদের নিকটে হরিদাস ঠাকুরের বিজয় মহোৎসবের জন্য ভিক্ষা চাহিলেন। দোকানদারেরা আপনাদের পণ্যদ্রব্যের সমুদয় দিতে উদ্যত হইলে স্বরূপদামোদর তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়া শ্রীচৈতন্যকে গৃহে পাঠাইলেন; দোকানদারদিগকে বলিলেন, প্রত্যেক দ্রব্যের এক এক পোয়া দাও, অধিক দিবার প্রয়োজন নাই। তাহাতেই চারিটী চাঙ্গারী পূর্ণ হইয়া গেল। চারিজন বৈষ্ণবের দ্বারা তাহা চৈতন্যদেবের বাসস্থানে আনা হইল; বাণীনাথ ও কাশীমিশ্রও বহু প্রসাদ পাঠাইয়াছিলেন, চৈতন্যদেব সকল বৈষ্ণবকে সারি সারি বসাইয়া পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইলেন। এইরূপে হরিদাস ঠাকুরের বিজয় মহোৎসব সম্পন্ন হইল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম বিধানে হরিদাস ঠাকুর একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন; তাঁহার আশ্চর্য্য সাধননিষ্ঠা, অপূর্ব্ব সংযম ও বৈরাগ্য, অলৌকিক সহিষ্ণুতা

ও ক্ষমা জগতের ধর্ম্মইতিহাসে বিরল। যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও অদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে ব্রাহ্মণের অধিক শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়াছিলেন।

জীবনের শেষভাগে শ্রীচৈতন্যদেব ঈশ্বরের বিরহে অনেক সময়েই মুহ্যমান হইয়া থাকিতেন। বৈষ্ণব জীবনচরিত লেখকগণ এই অবস্থাকে দিব্যোন্মাদ বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনে ভগবানের জন্য যেরূপ ব্যাকুলতা ও তাঁহার বিরহে বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়,জগতের ধর্ম্মইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। এই ব্যাকুলতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া শেষজীবনে অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। বৈষ্ণব চরিতাখ্যায়কগণ যে বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা কঠিন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার দৈন্য, ক্রন্দন, স্বেদ, কম্প, মূর্চ্ছা, প্রভৃতি বহু বিবরণ পাওয়া গিয়াছে ; কিন্তু ইহার পরে যে অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা আরও অধিক বিস্ময়কর।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; তিনি স্বয়ং ইহা দেখেন নাই সত্য কিন্তু বলিয়াছেন যে, স্বরূপদামোদর ও রঘুনাথ দাস স্বচক্ষে এই সকল দেখিয়া কড়চা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন এবং তিনি তাঁহাদের কড়চা হইতে এই সকল বিবরণ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণ অনুসরণ করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে রাধার যে প্রকার অবস্থা হইয়াছিল, এখন শ্রীচৈতন্যের জীবনে সেইসকল ভাবের স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। চৈতন্যদেব প্রথম হইতেই রাধার ভাবসাধন করিয়াছিলেন, এখন অনেক সময়ে সেইভাবেই মগ্ন হইয়া থাকিতেন। ভাগবতাদি পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপীগণের যে বিলাপ বর্ণনা আছে, ভক্তগণকে সর্ব্বদা তাহা পাঠ করিয়া শুনাইতে বলিতেন, এবং জয়দেব, বিদ্যাপতি,

চণ্ডীদাসের গীতাবলি শুনিতেন। স্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দের সঙ্গে দীর্ঘরাত্রি পর্য্যন্ত এই প্রকারে সময় অতিবাহিত করিতেন। একদিন অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত এইরূপ ধর্ম্মালোচনার পরে শয়ন করিয়া স্বপন দেখিলেন যেন তিনি বৃন্দাবনে রাসলীলা দেখিতে পাইতেছেন; গোপীগণ হাত ধরাধরি করিয়া মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া নৃত্য করিতেছেন, মধ্যে রাধা ও কৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন। চৈতন্যদেব ইহা দেখিয়া আবিষ্ট হইয়া আছেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না দেখিয়া ভৃত্য গোবিন্দ তাঁহাকে জাগাইল। তখন তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন বুঝিয়া দুঃখিত হইলেন। অভ্যাসমত প্রাতঃকৃত্য করিয়া তিনি জগন্নাথ দর্শনে গেলেন এবং গরুড়স্তম্ভের নিকটে নির্দ্দিষ্ট স্থানে জানু পাতিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতে লাগিলেন। একজন উড়িয়া রমণীও জগন্নাথ দর্শন করিতে আসিয়াছিল, সম্মুখে বহু লোকের জনতা তাহাতে সে জগন্নাথকে দেখিতে পাইতেছিল না বলিয়া গরুড়স্তম্ভের উপরে উঠিয়া সে জগন্নাথ দেখিতে লাগিল। পার্শ্বে চৈতন্যদেব এমন নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন যে, 'তাঁহাকে কোন স্থাবর পদার্থ মনে করিয়া তাঁহার স্কন্ধে এক পা রাখিল। কিছুক্ষণ পরে গোবিন্দ আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া রমণীকে নামাইয়া দিল। চৈতন্যদেব বলিলেন, উহাকে নামাইও না, ও স্বচ্ছন্দে জগন্নাথ দর্শন করুক। জগন্নাথ যদি আমাকে এমন ব্যাকুলতা দিতেন, ব্যাকুলতায় উহার জ্ঞান নাই যে আমার স্কন্ধে পা দিয়াছে। চৈতন্যদেব তখন পর্য্যন্ত স্বপ্নদৃষ্ট রাসলীলার ব্রজেন্দ্রনন্দন দর্শন করিতেছেন। মন্দিরস্থ জগন্নাথকে তদ্রূপ মুরলীবদন দেখিতেছেন, একি তন্ময়তা! এখন এই রমণীকে দেখিয়া তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল। তখন তিনি অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। গৃহে ফিরিয়া "পাইয়া হারাইনু" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কখনও বা প্রেমাবেশে নৃত্য গীত করিতেন।

"পাইনু বৃন্দাবন নাথ, পুনঃ হারাইনু
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ ? কাঁহা মুঞি আইনু ?
স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গর গর মন ;
বাহ্য হৈলে হয় যেন হারাইনু ধন।
উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান নৃত্য
দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজন কৃত্য।"

চৈঃ ভাঃ, অন্ত্যলীলা, ১৪ শঃ পঃ।

রাত্রিতে নিভৃতে রায় রামানন্দ ও স্বরূপদামোদরের নিকটে নিজের মনের ব্যাথা বর্ণনা করিলেন। তাঁহারা তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া ভাগবত ও বিদ্যাপতি প্রভৃতি পদাবলী হইতে তৎকালোপযোগী শ্লোক পাঠ ও গান করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলেন। এইরূপে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া রামানন্দ রায় স্বগৃহে গমন করিলেন ; স্বরূপ-দামোদর ও ভৃত্য গোবিন্দ শ্রীচৈতন্যকে গৃহমধ্যে শয়ন করাইয়া দ্বারদেশে শয়ন করিয়া রহিলেন। শয়ন করিয়াও তাঁহার নিদ্রা হইল না ; উচ্চৈঃস্বরে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শেষ রাত্রিতে কোন শব্দ শুনিতে না পাইয়া স্বরূপদামোদর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া চৈতন্য-দেবকে দেখিতে পাইলেন না। তিন দ্বার বন্ধ কিন্তু গৃহ শূন্য, তখন তাঁহারা অতিশয় আশঙ্কিত হইলেন এবং প্রদীপ জ্বালিয়া নানাস্থানে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বহু অন্বেষণের পরে সিংহদ্বারে গাভীগণের মধ্যে তাঁহাকে পাওয়া গেল। তিনি অচেতন হইয়া শুইয়া আছেন, নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ, মুখ দিয়া ফেণ ও লালা পড়িতেছে ; সমস্ত শরীর, হাত ও পা দীর্ঘাকার হইয়াছে।

প্রভু পড়িয়াছে দীর্ঘে হাত পাঁচ ছয় ;
অচেতন দেহ, নাশায় শ্বাস নাহি রয়।

একেক হস্ত পাদ দীর্ঘ তিন হাত,
অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম্ম আছে মাত্র তাত।
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থি সন্ধি যত;
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত।
চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা;
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিয়া।

চৈঃ ভাঃ, অন্ত্যলীলা, ১৪শঃ পঃ।

শ্রীচৈতন্যের এই অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ অতিশয় ভীত ও দুঃখিত হইলেন। স্বরূপদামোদর উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে শ্রীচৈতন্যের জ্ঞান হইল। তখন তিনি হরিবোল বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। শরীর পূর্ব্বের মত হইল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। কাল পাত্রসুলভ অত্যুক্তি বাদ দিলেও এই বিবরণ বিশ্বাস করা দুষ্কর; কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন এই ঘটনা রঘুনাথ দাস তাঁহার 'চৈতন্যস্তব কল্পবৃক্ষে' লিখিয়াছেন।

রঘুনাথ দাস তখন পুরীতে ছিলেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার মুখে শুনিয়া স্বীয় গ্রন্থে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চৈতন্যদেব প্রকৃতিস্থ হইয়া আপনাকে এইরূপ অবস্থায় সিংহদ্বারে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে স্বরূপদামোদর তাঁহাকে সকল কথা নিবেদন করিলেন। চৈতন্যদেব বলিলেন, "আমার কিছুই জ্ঞান ছিল না; এইমাত্র স্মরণ আছে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে একবার বিদ্যুতের মত দর্শন দিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।"

আর একদিন সমুদ্রস্নানে যাইবার সময়ে পথে চটকগিরি দেখিয়া বৃন্দাবনের গোবর্দ্ধনগিরি মনে হইল; অমনি ভাগবদ্বর্ণিত তদ্বিষয়ক শ্লোক পড়িতে পড়িতে সেই দিকে ধাবিত হইলেন। ভৃত্য গোবিন্দ তাঁহার পশ্চাতে ছুটিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব এত দ্রুত যাইতেছিলেন যে গোবিন্দ তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারিলেন না। সে চীৎকার করিয়া অন্যান্য ভক্ত-গণকে ডাকিল, তাঁহারাও শব্দ শুনিয়া সেইদিকে ছুটিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া চৈতন্যদেব স্তম্ভাকৃতি হইয়া দাঁড়াইলেন। আর তিনি চলিতে পারেন না, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল অসাড় হইয়া গেল, সমুদয় লোমকূপের মাংস ঘনীভূত হইয়া ব্রণের আকার ধারণ করিল। তাহার উপরে লোমসকল খাড়া হইয়া কদম্ব পুষ্পের মত হইল, লোমকূপ হইতে স্বেদ ও রক্ত বহির্গত হইতে লাগিল। দুইচক্ষু হইতে নদী ধারার মত বারি ধারা বহিতে লাগিল; মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না, কেবল গলার মধ্যে ঘর্ঘর করিতে লাগিল। সমুদয় শরীর শাঁকের মত সাদা হইয়া গিয়াছে। অবশেষে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি ভূমিতে পড়িয়া গেলেন; তৎক্ষণে ভক্তগণ তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন; তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাহারা ভীত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন; অনেকক্ষণ বাতাস ও জলসিঞ্চন করার পর তাঁহার চেতন সঞ্চার হইল। তখন তিনি হরিবোল বলিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "আমাকে গোবর্দ্ধন হইতে এখানে কেন আনিল? আমি গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলাম। সেখানে দেখিলাম পর্ব্বত শিখরে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেছেন; বেণুরব শুনিয়া গোপীগণ আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছেন। এমন সময়ে তোমরা কোলাহল করিয়া আমাকে এখানে ধরিয়া আনিলে। এমনি আমার দুর্ভাগ্য কৃষ্ণের লীলা দেখিয়াও দেখিতে পাইলাম না; এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময়ে পুরী ও ভারতী গোঁসাই

আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহাদের দেখিয়া চৈতন্যদেবের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল। তখন সকলে মিলিয়া সমুদ্রস্নানে গেলেন।

আর একদিন সমুদ্রস্নানে যাইবার সময়ে পথে একটি পুষ্পোদ্যান দেখিয়া বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা স্মরণ হইল। তাঁহার মনে হইল শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা দেখিতেছেন। ইতিমধ্যে শ্রীরাধাকে লইয়া কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন; তখন গোপীগণ বৃন্দাবনের তরুলতাকে যেমন শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন চৈতন্যদেবও সেইরূপ বৃক্ষলতা ও মৃগ পক্ষীদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "তোমরা বল আমার শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গেলেন।" উদ্যানের আম্র, পনস প্রভৃতি বৃক্ষের নিকটে করযোড়ে মিনতি করিয়া বলিলেন, এখানে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন, বলিয়া দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।" কোন উত্তর না পাইয়া ভাবিলেন ইহারা পুরুষ, ইহারা আমাকে কৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দিবে না। স্ত্রীজাতি ও তুলসী, মালতি প্রভৃতি লতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের সখী স্থানীয়; তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে বলিয়া দিবে শ্রীকৃষ্ণ কোথায় লুকাইলেন এই-রূপে প্রতি বৃক্ষ, লতা, মৃগ পক্ষীকে সম্বোধন করিয়া কত অনুনয় করিলেন। অবশেষে একস্থানে আসিয়া মনে হইল, যমুনাতীরে কদম্ব তলে, দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেছেন; অমনি তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। ততক্ষণে স্বরূপাদি ভক্তগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণ দেখা দিয়াছিল; জল সিঞ্চনাদি করাতে ক্রমে তাঁহার সংজ্ঞা কইল। তখন তিনি বলিলেন, "আমার শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গেলেন? এখনই তাঁহাকে পাইয়াছিলাম আবার কোথায় গেলেন? তাঁহার সৌন্দর্য্যে আমার নয়ন ও মন মুগ্ধ হইয়াছে। এই বলিয়া বিশাখার

নিকটে রাধা যে বিলাপোক্তি করিয়াছিলেন, সেই শ্লোক পড়িয়া চৈতন্যদেব কাঁদিতে লাগিলেন।

স্বরূপদামোদরকে বলিলেন, "আমার হৃদয়ে সান্ত্বনা পাই এমন একটি গান কর।" তখন স্বরূপদামোদর স্বীয় মধুব স্বরে গীত গোবিন্দ হইতে

"রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসং
স্মরতি মনো মম কৃত পরিহাসং॥"

এই গান করিলেন। গান শুনিয়া চৈতন্যদেব আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। "বোল, বোল" বলিয়া বার বার গান করিবার জন্য স্বরূপকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ নৃত্য গীতির পর চৈতন্যদেবকে অতিশয় শ্রান্ত দেখিয়া স্বরূপ গান বন্ধ করিলেন, তখন রায় রামানন্দ প্রভৃতি চৈতন্যদেবকে শান্ত করিয়া গৃহে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন।

যুক্তিবাদিগণের নিকট এই সকল ব্যাপার ভ্রম বা বাতুলতা মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও তন্ময়তার পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বরের জন্য মানবাত্মার ব্যাকুলতার এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখা যায় না। ভাগবতাদি ভক্তি গ্রন্থে ভগবানের জন্য ভক্তের ব্যাকুলতার যে-সব বিবরণ আখ্যায়িকার ছলে বিবৃত হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যের জীবনে তাহা বাস্তব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। জীবনের শেষ ভাগে তিনি এই ভাবে মগ্ন থাকিতেন। এতদিন যাহা কথা, কল্পনা ও আখ্যায়িকা ছিল এখন তাহা সত্য হইল। ভগবানের জন্য মানব-হৃদয়ের কতদূর ব্যাকুলতা হইতে পারে চৈতন্য-চরিত্রে তাহার পরাকাষ্ঠা দেখা যায়।

এইরূপে শ্রীচৈতন্যদেব দিনরাত্রি ভগবচ্চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিতেন। অভ্যাসবশতঃ তাঁহার স্নানাহারাদি দৈহিক কার্য্য হইত,

কিন্তু মন নিরন্তর ঈশ্বরচরণে মগ্ন হইয়া থাকিত। এই সময়ে তাঁহার সাধনের অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন রায় রামানন্দ ও স্বরূপদামোদর; রামানন্দ রায় কর্ণামৃত ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে শ্লোক পড়িয়া শুনাইতেন; স্বরূপদামোদর জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি পদাবলী গান করিয়া শুনাইতেন। এইভাবে কোথা দিয়া দিনরাত্রি চলিয়া যাইত জ্ঞান থাকিত না, কেবল যে সময়ে গৌড়ের ভক্তগণ আসিতেন সেই সময়ে তিনি অপেক্ষাকৃত শান্ত হইতেন।

আর একদিন রায় রামানন্দ ও স্বরূপদামোদরের সঙ্গে অর্দ্ধরাত্রি অতিবাহিত হইলে তাঁহারা তাঁহাকে গৃহমধ্যে শয়ন করাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। গোবিন্দ গম্ভীরার দ্বারদেশে শয়ন করিয়া রহিল। অনেক রাত্রিতে গোবিন্দ কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল গৃহ শূন্য; তখন সে স্বরূপদামোদরকে ডাকিয়া প্রদীপ লইয়া অন্বেষণে বাহির হইল। এবারেও সিংহদ্বারে গাভীগণের মধ্যে তাঁহাকে পাওয়া গেল; কিন্তু এবার দেহ অন্যরূপ বিকার ধারণ করিয়াছে। কচ্ছপে যেমন দেহমধ্যে হস্ত পদ গুটাইয়া লয়, শ্রীচৈতন্যের হস্তপদ সেরূপ দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। দেহখানি একটী কুষ্মাণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে; মানবদেহের এমন বিকার হইতে পারে কিনা জানি না। এ ঘটনাটীও কৃষ্ণদাস কবিরাজ রঘুনাথ দাসের চৈতন্যস্তব-কল্পতরু হইতে লইয়াছেন। আমরা চরিতামৃতের বিবরণ পুনরাবৃত্তি করিলাম; ভক্তগণের অনেক চেষ্টা সত্বেও শ্রীচৈতন্যের সংজ্ঞা হইল না, তখন তাঁহাকে তদবস্থাতে গৃহে আনিলেন এবং সেখানে অনেকক্ষণ ধরিয়া উচ্চৈস্বরে নাম সংকীর্ত্তন করার পর তাঁহার বাহ্য জ্ঞান হইল; শরীর স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল। তখন তিনি উঠিয়া বসিয়া স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আমাকে কোথায় আনিলে? আমি

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া বৃন্দাবনের কুঞ্জে গিয়াছিলাম, সেখানে কুঞ্জের মধ্যে গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের হাস্য-পরিহাস শুনিতেছিলাম, এমন সময়ে তোমরা আমাকে এখানে ধরিয়া আনিলে। এখন আর সে মধুর বংশীধ্বনি শুনিতে পাইতেছি না। আমার কর্ণ তাহার জন্য তৃষিত হইয়া আছে। স্বরূপকে শ্লোক পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন, স্বরূপ তৎকালোপ-যোগী শ্লোক পড়িলেন,তাহা শুনিয়া চৈতন্যদেব গোপীভাবে মগ্ন হইলেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের আর একটি ঘটনার উল্লেখ আছে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন নহে। শরৎকালে একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে চৈতন্যদেব ভক্তগণ সঙ্গে সমুদ্রতীরে উদ্যানে বেড়াইতেছিলেন; চন্দ্রালোকে বৃক্ষ লতা সকল উদ্ভাসিত, চৈতন্যদেব রাসলীলা-বিষয়ক শ্লোকসকল পাঠ ও ব্যাখ্যাকরতঃ উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে তিনি সমুদ্রতীরে আসিলেন। সমুদ্রতীরের নীলজল চন্দ্রকিরণে জ্বলিতেছিল; তাঁহার মনে হইল সম্মুখে যমুনা, অমনি তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। সে সময়ে ভক্তগণ কেন নিকটে ছিলেন না, বুঝা যায় না, সম্ভবতঃ তাঁহারা পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন। সমুদ্রে পড়িয়া শ্রীচৈতন্যের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল; তিনি তরঙ্গের উপর ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। ওদিকে ভক্ত-গণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিলেন, সকল উদ্যান খুঁজিয়া তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা অতিশয় চিন্তিত হইলেন।

কেহ বা মন্দিরের দিকে, কেহ বা নরেন্দ্রসরোবরে, কেহ বা অন্যান্য উদ্যানে খুঁজিতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। তখন তাঁহারা একপ্রকার স্থির করিলেন যে, আর তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। স্বরূপদামোদর প্রভৃতি কয়েক জন সমুদ্রের তীরে তাঁহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন; সেখানে একজন জেলের সহিত

তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। সে 'হরি' বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় হাসিতে ও কাঁদিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি হইয়াছে? তুমি এমন করিতেছ কেন?" এদিকে কোন মনুষ্য দেখিলে? জেলিয়া উত্তর করিল, "মনুষ্য নয়, কিন্তু আমার জালে একটি মৃতদেহ উঠিয়াছে। আমি বড় মাছ মনে করিয়া ধরিতে গিয়া দেখিলাম দীর্ঘাকৃতি মনুষ্য দেহ, হাত পায়ের জোড়সকল ছাড়িয়া গিয়াছে। এক একখানা হাত দুই তিন হাত লম্বা হইয়াছে। তাঁহাকে ছুঁইয়া আমার এই দশা হইয়াছে, আমাকে ভূতে ধরিয়াছে।" স্বরূপ তখন ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ভূত নয়, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।" জেলিয়া বলিল, "আমি তাঁহাকে চিনি, তিনি নন। ইঁহার হাত পা অতিশয় দীর্ঘ।" স্বরূপ বলিলেন, "তাঁহার দেহের এইরূপ বিকার হয়" তৎপরে জেলিয়াকে শান্ত করিয়া দ্রুতগতিতে তাহার নির্দ্দিষ্ট পথে যেখানে দেহ পড়িয়াছিল সেখানে আসিয়া দেখিলেন যে, চৈতন্যদেব অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছেন; তাঁহার শরীর দীর্ঘ হইয়াছে। হস্তপদ সন্ধিচ্যুত, সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ, ভক্তগণ তাঁহার আর্দ্র বহির্ব্বাস পরিবর্ত্তিত করিয়া শুষ্কবস্ত্র পরাইয়া দিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কর্ণের নিকটে হরিনাম করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার সংজ্ঞা হইল; তিনি হরি-বোল বলিয়া উঠিয়া এদিক ওদিকে তাকাইতে লাগিলেন। ভক্তগণকে দেখিয়া বলিলেন, তোমরা এখানে কেন আসিলে? আমি বৃন্দাবনে যমুনার তীরে গিয়াছিলাম, সেখানে দেখিলাম শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ সহ যমুনায় জলক্রীড়া করিতেছেন। স্বরূপদামোদর বলিলেন, "তুমি যমুনা ভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলে এবং সমুদ্রের জলে ভাসিয়া যাইতেছিলে। পরে এই জেলিয়ার জালে পড়িয়াছিলে, সে তোমাকে উঠাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছে। আমরা সারারাত্রি সর্ব্বত্র তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি;

মূর্চ্ছিত হইয়া তুমি বৃন্দাবনের জলক্রীড়া দেখিতেছিলে; এক্ষণে হরিনাম শুনিয়া তোমার বাহ্যজ্ঞান হইল।" তৎপরে সকলে তাঁহাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। এই সময়ে চৈতন্যদেব আর একবার শচীমাতাকে দর্শনের জন্য জগদানন্দকে গৌড়ে পাঠাইয়াছিলেন। গৌড় হইতে প্রত্যাগমন সময়ে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতে গেলে তিনি জগদানন্দের মুখে শ্রীচৈতন্যের নিকটে এই তরজা বলিয়া পাঠাইলেন:—

"বাউলকে কহিও লোক হইল আউল;
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।"

জগদানন্দ আসিয়া চৈতন্যদেবকে এই কথা বলিলে, তিনি অধিকতর বিষণ্ণ হইলেন। পুরীর ভক্তগণ অদ্বৈতাচার্য্যের হেঁয়ালির অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। সম্ভবতঃ তরজায় তিনি গৌড়ে ভক্তিধর্ম্মের অবসাদের সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন; এখন হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের বিরহ-বেদনা আরও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তিনি অনেক সময়েই রায় রামানন্দ ও স্বরূপদামোদরের কণ্ঠ ধরিয়া ক্রন্দন করিতেন। রাধিকা বিশাখাকে যে শ্লোকে কৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সেই শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন; তাঁহারা তাঁহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেন। একদিন এইরূপে অর্দ্ধরাত্রি অতিবাহিত করিয়া তাঁহাকে গৃহমধ্যে শয়ন করাইয়া রামানন্দ রায় নিজগৃহে গমন করিলেন। অনেক রাত্রিতে গৃহাভ্যন্তরে গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া ভৃত্য গোবিন্দ ভিতরে গিয়া দেখিল যে, চৈতন্যদেব দেওয়ালে নাক মুখ ঘষিতেছেন। ক্ষতস্থান হইতে রক্ত বাহির হইতেছে। ইহাতে ভক্তগণ অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং

ইহার পর হইতে তাঁহার নিকটে একজন ভক্তকে শোয়াইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন।

অতঃপর চৈতন্যদেব সম্বন্ধে আর কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় ইহার পরে আর বেশীদিন তিনি জীবিত ছিলেন না। চৈতন্য-চরিতামৃতে তাঁহার তিরোধানের কোন উল্লেখ নাই। বোধ হয় ভক্তগণের নিকটে এই ঘটনা এত শোকাবহ ছিল যে, বৈষ্ণব কবি তাহার কোন উল্লেখ করিতে পারেন নাই।

লোচন দাস প্রণীত চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে যে, গুণ্ডা মন্দিরে জগন্নাথ দর্শন করিতে গিয়া চৈতন্যদেব জগন্নাথের গাত্রে বিলীন হইয়া যান। ইহা স্পষ্টই কবিকল্পনা। সাধারণের ধারণা এই যে, কোন সময়ে অলক্ষিতে ভাবাবেশে যমুনাভ্রমে তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, আর তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই, ইহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মতে জয়ানন্দ স্বপ্রণীত চৈতন্যমঙ্গলে যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও প্রামাণিক; তিনি লিখিয়াছেন যে, রথযাত্রার দিনে নৃত্য করিবার সময়ে তাঁহার বাম পায়ে ইটের আঘাত লাগিয়া ক্ষত হয়। ক্রমে সেই ক্ষত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়। এই বিবরণ সত্য না হইলে কবি কখনও এইরূপ লিখিতে পারিতেন না। ইহা কখনও কল্পনাসম্ভূত হইতে পারে না। লোচন দাসও আষাঢ়ের সপ্তমী তিথি তাঁহার তিরোধানের দিন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সম্ভবতঃ ১৫৩৪ সালে জুলাই মাসে এই শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল; তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের বয়স তখন ৪৮ বৎসর।

শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মমত

চৈতন্যদেবের জীবনের বিস্তৃত আলোচনার পরে তাঁহার ধর্ম্মমত বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এই কৌতূহল স্বাভাবিক হইলেও ইহার চরিতার্থতা সুলভ নহে; তিনি কোন ধর্ম্মমত প্রচার বা প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যগ্র ছিলেন না। তাঁহার ধর্ম্মে মত অপেক্ষা ভাবেরই প্রাধান্য ছিল। অবশ্য শ্রীচৈতন্যদেবও কতকগুলি ধর্ম্মমত অবলম্বন করিয়াছিলেন; তাঁহার শিক্ষা ও কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে কতকগুলি মত ও বিশ্বাস লক্ষিত হয়; কিন্তু তাহাদের মধ্যে সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য পাওয়া যায় কি না তাহা সন্দেহের বিষয়। শ্রীচৈতন্যদেব কোন পুস্তক লিখিয়া রাখিয়া যান নাই; অনুবর্ত্তীগণও তাঁহার উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া রাখেন নাই। প্রচলিত জীবনচরিতে তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশ অতি সামান্যই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় শ্রীচৈতন্যের সম্পূর্ণ ও সুসঙ্গত ধর্ম্মমত সংগ্রহ করা কঠিন। তিনি নিজে সুসঙ্গত সমঞ্জস্যীভূত একটি ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত করিতে কোথাও চেষ্টা করেন নাই। তথাপি সাময়িক বাক্য ও কার্য্য হইতে তাঁহার ধর্ম্মমতের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে কাশীতে সনাতনকে দুই মাস ধরিয়া যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে ধর্ম্মবিষয়ে অনেক তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা কতদূর শ্রীচৈতন্যের নিজের মত, বা ইহাতে কতটা পরবর্ত্তী সময়ের গ্রন্থকারের মত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, তাহা বলা দুষ্কর। এতদ্ভিন্ন দাক্ষিণাত্যের পথে বিদ্যানগরীতে রায় রামানন্দের সঙ্গে কথোপকথনের একটি মূল্যবান বিবরণ আছে। প্রধানতঃ এই দুইটী

অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মমতের একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

চৈতন্যের ধর্ম্মমতের দুইটী দিক আছে, একটি অভাবাত্মক ও একটি ভাবাত্মক। অভাবাত্মক দিকে দেখা যায়, তিনি নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। চৈতন্যদেব সহজে কোন ধর্ম্মের নিন্দা বা প্রতিবাদ করিতেন না। ধর্ম্মমত বিষয়ে তিনি অতিশয় উদার ছিলেন এবং যথেষ্ট সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এইজন্য সাধারণতঃ শান্ত ও প্রতিবাদবিমুখ হইলেও, যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, চৈতন্যদেব নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। স্বভাবতঃ তর্ক ও বিচারে তাঁহার একেবারেই প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে একাধিকবার তিনি বৌদ্ধগণের সহিত বিচার করিয়াছেন। মায়াবাদী বৈদান্তিকগণের তিনি চিরবিরোধী ছিলেন। অনেক সময়ে প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইলেও তিনি তাঁহাদের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পুরীতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত এবং কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত বিচার তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের স্থল। (জীবনচরিত লেখকগণ লিখিয়াছেন যে, এই বিচারে তিনি জয়যুক্ত হইয়াছেন।) সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে অদ্বৈতবাদ পরিত্যাগ করাইয়া যে ভক্তিধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এই বিচারের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। যে সকল যুক্তির দ্বারা চৈতন্যদেব অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া ভক্তিবাদ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষিত হইলে ধর্ম্মসাহিত্যে একটি অমূল্য সম্পদ হইত।)

ভাবপক্ষে শ্রীচৈতন্যদেব বিশ্বাসী উপাসক ছিলেন। ঈশ্বরের উপাসনা

ও সেবাই তাঁহার ধর্ম্মের মূলমন্ত্র ছিল; এইজন্যই তিনি অদ্বৈতবাদের এত বিরোধী ছিলেন। ঈশ্বরের উপাসনাই মানবের শ্রেষ্ঠ অধিকার ও কর্ত্তব্য। নিত্যকাল জীবাত্মা পরমাত্মার পূজা করিবে।

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস;
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।

চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা, ২০শঃ, পঃ।

উপাস্য উপাসকের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যিনি যে ভাবেই উপাসনা করিতেন, চৈতন্যদেব তাহাতে কিছু প্রতিবাদ করিতেন না। এইজন্য দেখা যায়, তিনি সকল ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের সহিত সহানুভূতি করিতে পারিয়াছিলেন। শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত সকল মন্দিরে গিয়া ভক্তিভরে তৎ তৎ স্থানীয় পূজায় যোগ দিয়াছেন। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোর বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের উপাসকেরা রাম নাম সহ্য করিতে পারে না, রামের উপাসকেরা কৃষ্ণনামের বিরোধী; শাক্ত বৈষ্ণবে বিষম বিবাদ। শ্রীচৈতন্যের সময়ে এই ভাব আরও প্রবল ছিল। কিন্তু তাঁহার উদার হৃদয়ে এইরূপ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা তিলমাত্র স্থান পায় নাই। তবে সকল সম্প্রদায়ে যে সকল আচরণ দোষাবহ মনে করিতেন তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। যেমন দেখিতে পাওয়া যায় কালীর মন্দিরে ছাগ বলিদান নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। একাধিক স্থানে মন্দিরে দেবদাসী প্রথার নিন্দা করিয়াছেন।

সকল দেবতার উপাসকদিগের সহিত সহানুভূতি করিলেও চৈতন্যদেব স্বয়ং কৃষ্ণের উপাসক ছিলেন বলিতে পারা যায়। তবে তিনি কৃষ্ণ বলিতে কি বুঝিতেন তাহার আলোচনা আবশ্যক। অনেক স্থলে তিনি কৃষ্ণ বলিতে অনন্ত অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াছেন,

তাহাতে সন্দেহ নাই। কাশীতে সনাতনকে ঈশ্বরতত্বের বিষয়ে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন সেখানে কৃষ্ণ শব্দে একেশ্বরবাদগণের পরমেশ্বর বা উপনিষদের ব্রহ্ম হইতে কোন পার্থক্য নাই ; যথা—

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর ;
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর।

চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা, ২০শঃ পঃ।

অন্যত্র,—

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার ;
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আর।
বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ শক্তি কার্য্য হয় ;
স্বরূপ শক্তি, শক্তি কার্য্যের কৃষ্ণ সমাশ্রয়।

অন্যত্র,—

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম ;
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম।

অথবা,-

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ;
সর্ব্ব অবতারী, সর্ব্ব কারণ প্রধান।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার ;
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার।
সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্র নন্দন ;
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরস পূর্ণ।

চৈঃ, চঃ, মধ্যলীলা ৮ম পঃ

এখানে দেখা যাইতেছে উপনিষদ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, অথবা বর্ত্তমান যুগে একেশ্বরবাদিগণ যাঁহাকে ঈশ্বর বলেন, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন। ইনি অনন্ত, অদ্বিতীয়, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর, সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত শক্তি। শ্রীচৈতন্যদেব নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে ঈশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত শক্তি ও ঐশ্বর্য্যশালী; তাঁহার অনন্ত শক্তির মধ্যে বিশেষভাবে তিন শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন—জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি। এই তিন শক্তির দ্বারা তিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন।

অনন্ত শক্তির মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান;
ইচ্ছা শক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞান শক্তি নাম।
ইচ্ছা শক্তি প্রধান কৃষ্ণের ইচ্ছায় সর্ব্ব কর্ত্তা;
জ্ঞান শক্তি প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা।
ইচ্ছা, জ্ঞান ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন;
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ রচন।

চৈঃ, চঃ, মধ্যলীলা, ২০শ পঃ।

সৃষ্টি সম্বন্ধেও শ্রীচৈতন্যদেবের মত অতি উদার ও শাস্ত্র এবং যুক্তি-সঙ্গত। তিনি বলিয়াছেন, এই বিশ্বে অসংখ্য লোক রহিয়াছে। সে সমুদয়ই কৃষ্ণের সৃষ্টি এবং তাঁহাতেই নিরন্তর স্থিতি করিতেছে।

সর্ব্ব তত্ত্ব মিলি সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ;
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন।
এত মহৎ স্রষ্টা পুরুষ মহা বিষ্ণু নাম;
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম।

গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায়;
পুরুষ নিশ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায়।
পুনরপি নিশ্বাসসহ যায় অভ্যন্তর;
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর সব মায়া পর।"

চৈঃ, চঃ, মধ্যলীলা, ২১শঃ পঃ।

যেরূপ গবাক্ষপথে সূর্য্যালোকে দেখা যায় লক্ষ লক্ষ ধূলিকণা উড়িয়া বেড়ায় তদ্রূপ এই বিশ্বে অসংখ্য লোক চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহনক্ষত্র সকল উড়িয়া বেড়াইতেছে। এই অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা একমাত্র অদ্বিতীয় অনন্ত সত্বাকে শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। উপনিষদের ব্রহ্ম অপেক্ষাও ইঁহাকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন। ব্রহ্মকে কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি বলিয়াছেন। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান, কৃষ্ণের এই তিন প্রকাশ। পরমাত্মাকেও তিনি কৃষ্ণের এক অংশ বলিয়াছেন। জ্ঞানে তিনি ব্রহ্মরূপে, যোগে পরমাত্মারূপে এবং ভক্তিতে ভগবানরূপে মানবের নিকটে তিনি প্রকাশিত হন।

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে।
ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে
সূর্য্য যেমন চর্ম্ম চক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে।
পরমাত্মা যিঁহো, তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস।
ভক্ত ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ;
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ।

চৈঃ, চঃ, মধ্যলীলা, ২০শ পঃ।

পুরাণোক্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবকেও চৈতন্যদেব কৃষ্ণের অংশ বা

অবতার বলিয়াছেন। কৃষ্ণের অসংখ্য অবতার কেহ বা পুরুষাবতার, কেহ বা গুণাবতার, কেহ বা অংশাবতার।

পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর।
গুণাবতার আর মন্বন্তাবতার আর
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশাবতার।
বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম;
এতদ্রূপে লীলা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অনন্ত অবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন;
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ দরশন।

চৈঃ, চঃ, মধ্যলীলা, ২০শঃ পঃ।

অপর দিকে কৃষ্ণ শব্দে তিনি ভাগবতাদি পুরাণবর্ণিত ব্রজলীলার কৃষ্ণও বুঝিয়াছেন। ইহার মধ্যে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য হইতে পারে কি না তাহা আমরা বিচার করিতেছি না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি চৈতন্যদেব যুক্তিসঙ্গত ধর্ম্মবিজ্ঞান গঠন করিতে প্রয়াসী ছিলেন না। তাঁহার প্রকৃতি ও ধর্ম্মে জ্ঞান অপেক্ষা ভাবের স্থানই উচ্চ। তিনি জ্ঞানও কর্ম্মের পথ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তির পথে চলিতেই তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

ঐছে শাস্ত্র কহে, কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি;
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি।

চৈঃ, চঃ, মধ্যলীলা, ২০শঃ পঃ।

জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগের পথকে তিনি ভয়াবহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভূগর্ভপ্রোথিত ধন অন্বেষণের জন্য মৃত্তিকা খনন করিতে গিয়া যেমন অজগর সর্প বাহির হয়, তেমনি জ্ঞানাদিমার্গে অনেক বিপত্তি উপস্থিত হয়।

"বাপের ধন আছে জ্ঞানে নাহি পায়
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়
এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে
ভীমরুল বরুলী উঠিবে ধন না পাইবে
পশ্চিমে খুদিতে তাঁহা যক্ষ এক হয় ;
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না পড়য়।
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজাগরে ;
ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সবারে।
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটি অল্প খুদিতে
ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে।"

এই দৃষ্টান্তে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের পথে ভীমরুল, যক্ষ ও অজগর সর্প উত্থিত হওয়ার ন্যায় বিপদের আশঙ্কা দেখান হইয়াছে, কিন্তু ভক্তির পথ সহজ ও সুগম বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষত্ব এই ভক্তিতত্ত্ব। বৈষ্ণবধর্ম্মে ভক্তিকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। যে নামে যে ভাবেই হউক ভক্তি থাকিলেই হইল।

বৈষ্ণবধর্ম্মের সবলতা ও দুর্ব্বলতা উভয়েই এখানে। বৈষ্ণবধর্ম্মে ভক্তির যে উচ্চ আদর্শ বিবৃত হইয়াছে তাহা জগতে অতুলনীয় ; অপরদিকে জ্ঞান ও কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হওয়ায় বৈষ্ণবধর্ম্মের যে অধঃপতন হইয়াছিল তাহাও স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মমতও বোধ হয় এই দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। সম্ভবতঃ এই ভক্তিরস আস্বাদনের জন্যই চৈতন্যদেব ব্রজলীলার আখ্যায়িকা গ্রহণ করিয়াছেন।

চৈতন্যদেবের ধর্ম্মে এবং সাধনে ব্রজলীলা অনেক স্থান

অধিকার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরাণবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ভক্তিরস আস্বাদনে বিশেষ সাহায্য করে। আমাদের মনে হয়, এইভাব হইতেই ব্রজলীলার কৃষ্ণের উৎপত্তি ও বিকাশ। ইহার মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে কিনা বলা দুষ্কর। কিন্তু ইহার বিকাশে কবিকল্পনা প্রভাব যে বহুল, তাহাতে সন্দেহ নাই। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এবং পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ ভক্তিমিশ্রিত কল্পনায় কৃষ্ণাখ্যায়িকাকে যে বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত, রঞ্জিত ও মধুর করিয়াছিলেন তাহা ঐতিহাসিক সত্য। শ্রীচৈতন্যদেবও এইভাবে কৃষ্ণ আখ্যায়িকা গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগবতে পঞ্চপ্রকারের ভক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভক্তি। ব্রজলীলায় এই পাঁচপ্রকারের ভক্তি দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভাগবতের ভক্তিতত্ত্ব জগতের ধর্ম্মসাহিত্যে অপূর্ব্ব সম্পদ। শ্রীচৈতন্যদেব এই অপূর্ব্ব ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা ও আস্বাদনে সমগ্রজীবন নিয়োজিত করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরীতে রায় রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের কথোপকথনের ছলে এই ভক্তিতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহার কতটা শ্রীচৈতন্যদেবের, কতটা রায় রামানন্দের তাহা বলা যায় না।

চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনায় চৈতন্যদেব প্রশ্নকর্ত্তা, রায় রামানন্দ ব্যাখ্যাতা। কিন্তু বৈষ্ণবগণ বলেন, চৈতন্যদেবের প্রেরণায় রামানন্দ রায় যন্ত্রের মত এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই কথা সমীচীন মনে হয় না। শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বেও রায় রামানন্দ ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞানের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। সেইজন্যই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য চৈতন্যদেবকে রায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ

করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই ভক্তিতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যদেব বিশেষভাবে নিজের জীবনে সাধন করিয়াছিলেন। এই স্থলে ইহার কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। চৈতন্যদেব রায় রামানন্দকে প্রশ্ন করিলেন, "সাধ্য অর্থাৎ ধর্ম্মজীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য কি?" রায় রামানন্দ উত্তর করিলেন, "স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রম অনুযায়ী স্বীয় কর্ত্তব্য সকল সম্পাদন করিলে ঈশ্বরভক্তিলাভ করিতে পারেন। এই বাক্যে রামানন্দ রায় প্রচলিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রয়োজন ও সিদ্ধির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চৈতন্যদেব ইহা শুনিয়া বলিলেন, ইহা ত বাহিরের কথা, ইহা অপেক্ষা গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি; তদুত্তরে রামানন্দ রায় বলিলেন, "কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণ সকল সাধ্যের সার।" অর্থাৎ বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের আশা ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে সকল কার্য্য করা শ্রেষ্ঠ সাধন। এখানে রামানন্দ রায় ভগবদ্গীতার সার শিক্ষার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতাকার অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের মুখে যে উচ্চ শিক্ষা ব্যক্ত করিয়াছেন—

"যৎ করোসি, যদশ্নাষি, যুজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়, কুরুষ্ব তৎ মদর্পণং।"

রামানন্দের বাক্য তাহার প্রতিধ্বনি মাত্র। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" তদনুসারে রামানন্দ বলিয়াছেন "শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্ম অর্পণ সর্ব্বসাধ্যসার।"

বাস্তবিক গীতার এই শিক্ষা ধর্ম্মরাজ্যের অপূর্ব্ব সম্পদ। কিন্তু চৈতন্যদেব ইহাতেও তৃপ্ত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "এও বাহ্য, আগে কহ আর।" ইহাও নিম্ন স্তরের কথা, ইহা অপেক্ষা উচ্চ

আদর্শ যদি থাকে, বল।” তখন রামানন্দ রায় বলিলেন, “জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার।” এতক্ষণ কর্ম্মের কথা হইতেছিল, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন অথবা ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণেও কর্ম্ম থাকে। এখন কর্ম্মের রাজ্য পশ্চাতে ফেলিয়া উপরে চলিলেন; এতক্ষণে আমরা ভক্তিরাজ্যের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। রামানন্দ রায় এই ভক্তিরাজ্যের নিম্নতম সোপানকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলিয়াছেন।

এখানে যদিও কর্ম্ম নাই তথাপি জ্ঞান আছে; জ্ঞান থাকিলেই আমিত্ব বোধ আছে। চৈতন্যদেব ইহাকেও বাহ্য বলিলেন। তখন রামানন্দ রায় বলিলেন—“জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার।”

এই বাক্যে বৈষ্ণবগণ জ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ঠিক কি অর্থে শ্রীচৈতন্যদেব বা রায় রামানন্দ এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনাসাপেক্ষ। ঈশ্বর বিষয়ে সত্য তথ্য বা ব্রহ্মজ্ঞানকে তাঁহারা অবজ্ঞা করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। তবে জ্ঞানের পথে অনেক বিঘ্ন আছে, ইহা পদে পদে সংশয় আনিয়া দেয়, ভক্তি গভীর হইতে দেয় না। সম্ভবতঃ তাই এখানে জ্ঞানশূন্যা ভক্তিকে উচ্চতর স্থান দেওয়া হইয়াছে; ইহাতে কেবলই ভক্তি। উপাস্যদেবের প্রতি সরল, সংশয় ও প্রশ্নরহিত অনুরাগ। এতক্ষণে শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, “হাঁ, ইহা হইতে পারে। এ হো হয়। কিন্তু যদি কোন গভীরতর তত্ত্ব থাকে, তাহা বল।” তদুত্তরে রামানন্দ রায় বলিলেন, “প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্যসার।” ঈশ্বরে রতি বা প্রীতি গভীর হইলে তাহাকে প্রেমভক্তি বলা হয়।

“কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান;
কৃষ্ণ ভক্তিরসের সেই স্থায়ীভাব নাম।”

চৈঃ, চঃ, মধ্যলীলা, ২৩ শঃ পঃ।

কি উপায়ে মানবচিত্তে এই প্রেমভক্তি সঞ্চারিত হয় কাশীতে সনাতনকে শিক্ষা দিবার সময়ে চৈতন্যদেব তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয় ;
তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ করয়।
সাধু সঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন।
অসমর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয় ;
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপাজয়।
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর ;
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে রত্যঙ্কুর।
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম ;
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম।

চৈঃ, চঃ, মধ্যলীলা, ২৩ শঃ পঃ।

এই ভাবকে শান্ত ভক্তিও বলা হইয়াছে। ইহার প্রকৃতি ঈশ্বরে নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ গাঢ় প্রীতি। বৈষ্ণবগণ শুক, সনক প্রভৃতি সাধুগণকে এই প্রকার সাধকের দৃষ্টান্তস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

চৈতন্যদেব রামানন্দের কথা শুনিয়া বলিলেন,"এই বেশ কথা, আরও যদি গভীরতর তত্ত্ব থাকে তাহা বল।"

তখন রামানন্দ রায় বলিলেন, "দাস্যভক্তি সর্ব্ব সাধ্যসার" ; শান্ত ভক্তিতে ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। দাস্যভক্তিতে ভক্ত আপনাকে ঈশ্বরের দাসরূপে অনুভব করেন।

জগতের ধর্ম্মইতিহাসে এই ভাব বহু বিস্তৃত ; পাশ্চাত্য, ইহুদী ও মুসলমান ধর্ম্মে এই ভাব বিশেষভাবে সাধিত হইয়াছে। এই সকল ধর্ম্মে ঈশ্বরকে প্রধানতঃ প্রভু বলিয়াই সম্বোধন করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে

হনুমান এই দাস্য ভাবের প্রধান সাধক। রামের প্রতি হনুমানের যে আত্মহারা ভক্তি বাস্তবিকই তাহা অতি সুন্দর। আখ্যায়িকায় উক্ত আছে যে, একবার হনুমান স্বীয় বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, তাঁহার বুকের মধ্যে রাম-সীতা বিরাজ করিতেছেন। চৈতন্যদেবও ঈশ্বরের সঙ্গে এই প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ মানবের সাধারণ ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।"

চৈতন্যদেব বলিলেন ইহা উত্তম কথা, ইহা অপেক্ষা গভীরতর কিছু থাকে, তবে বল। তদুত্তরে রামানন্দ রায় বলিলেন, "সখ্য প্রেম সকল সাধ্যের সার।"

দাস্যভক্তিতে ভক্ত যেমন ঈশ্বরকে প্রভুরূপে দেখেন, সখ্য ভক্তিতে ভক্ত তাঁহাকে সখারূপে দেখেন। দাস্যভক্তিতে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ভাব প্রকাশিত, তিনি প্রভু, তিনি মহান, তিনি রাজা, ভক্ত তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার ঐশ্বর্য্য, তাঁহার গৌরব দেখিয়া নত হন, কিন্তু সখ্য ভক্তিতে ঐশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে মাধুর্য্যের প্রকাশ। এইজন্যই শ্রীচৈতন্যদেব বিষ্ণু ও নারায়ণকে নিম্নস্থান দিয়া ব্রজবালক কৃষ্ণকে উপাস্য দেবতার পদে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা গোলোক ও বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য উচ্চতর বলিয়াছেন। বৈকুণ্ঠের নারায়ণ ও লক্ষ্মীতে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশিত, ব্রজের কৃষ্ণ ও রাধিকায় ঈশ্বরের মাধুর্য্য ভাবের বিকাশ, এইজন্যই বৈষ্ণবদের নিকটে ব্রজলীলা প্রিয়। সখ্য-ভক্তি মাধুর্য্য রসের প্রথম সোপান। এখান হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্মের আরম্ভ ; বৈষ্ণবধর্ম্মে ঈশ্বরের মাধুর্য্য ভাব নানাভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ভক্ত কেবল তাঁহাকে মহান্ অনন্ত প্রভু বা রাজা বলিয়াই তৃপ্ত হন নাই ; তিনি যে আমার বন্ধু, আমার সখা ইহা অনুভব

করিয়াছিলেন। জগতের ধর্ম্ম ইতিহাসে এই ভাব একেবারে অজ্ঞাত না হইলেও বিরল। মুসলমান ধর্ম্মের স্থফি সম্প্রদায়ে এই ভাব অনেক পরিমাণে সাধিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক সাধকগণের মধ্যে কবি হাফেজ সখ্যভাবের উচ্চ সাধক, ভারতীয় হিন্দুধর্ম্মে অর্জ্জুন সখ্যভাবের সাধকের দৃষ্টান্ত। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পরের সখা; কিন্তু ব্রজলীলায় এই সখ্য প্রেমের উচ্চতম আদর্শ অভিব্যক্ত হইয়াছে। অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ সখা হইলেও তাঁহাদের মধ্যে দূরত্ব ছিল। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে ভয় ও সম্ভ্রম করিতেন। ব্রজলীলায় শ্রীদাম স্থদাম প্রভৃতি গোপ বালক কৃষ্ণের সঙ্গী সখা, কৃষ্ণকে না পাইলে তাহাদের মাঠে যাওয়া হয় না। একত্র গোচারণ করেন, খেলা করেন, খেলায় জয় পরাজয় হয়; কখনও কৃষ্ণ তাঁহাদের কাঁধে চড়েন আবার তাঁহারাও কৃষ্ণের কাঁধে চড়েন। ভাল ফল পাইলে আধখানা খাইয়া আধখানা কৃষ্ণকে দেন। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এমনি মধুর সম্বন্ধ। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ অনুভব করিয়াছেন, ভগবানের সঙ্গে ভক্তের কোন ব্যবধান নাই। একেবারেই একাত্ম ভাব। ধর্ম্মের এই মাধুর্য্য রস ব্যাখ্যা ও আস্বাদনের প্রয়াসেই ব্রজলীলার জন্ম ও বিকাশ। ভক্ত কবিগণ নানাভাবে এই মধুর তত্ত্ব বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং ইহারই জন্ম শ্রীচৈতন্যের নিকট ব্রজলীলা এত প্রিয় হইয়াছে। তিনি ইহাকে ইতিহাস কি আখ্যায়িকা মনে করিতেন তাহা বলা যায় না। তাঁহার মত ভাবপ্রধান প্রকৃতিতে ইতিহাস ও আখ্যায়িকার বড় পার্থক্য ছিল না। স্বপ্ন দেখিয়া যিনি নিদ্রা হইতে উঠিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেন, তাঁহার নিকটে বাস্তব ও ভাবরাজ্যের দূরত্ব কোথায়? যাহা হউক এই সখ্য-প্রেম শ্রীচৈতন্যের নিকটে অতি মূল্যবান জিনিষ ছিল। রামানন্দের মুখে ইহার ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হইলেন। তিনি বলিলেন,

"ইহা অতি উত্তম কথা; ইহার উপরে আর কিছু আছে?" তখন রামানন্দ রায় বলিলেন, "বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার।" এই বাৎসল্য প্রেম বৈষ্ণব ধর্ম্মের বাহিরে আর কোথাও দেখা যায় না। বাৎসল্য-প্রেমে ঈশ্বরকে সন্তানরূপে দেখা হইয়াছে। নন্দ, যশোদা কৃষ্ণকে যেভাবে দেখিয়াছেন, ভক্তও ঈশ্বরকে সেই ভাবে দেখেন। যশোদা কৃষ্ণকে আদর করেন, ননী খাওয়ান, প্রয়োজন মত শাসনও করেন। কখনও দড়ি দিয়া উদখলে বান্ধিয়া রাখেন, কখনও বেত্রাঘাতও করেন; একেবারে আত্মীয়ভাব। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এই সম্বন্ধ। বাস্তবিকই এই ভাবে এমন একটি আত্মীয়তা আছে যাহা আর কোথাও নাই। জননী যেমন সন্তানকে ভালবাসেন ভক্ত ঈশ্বরকে সেইরূপ ভালবাসিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন।

বৈষ্ণব আচার্য্যগণ এই ভাবকে বাৎসল্য প্রেম আখ্যা দিয়াছেন। মানব-হৃদয়ের প্রীতি যে সকল আকার ধারণ করে, ঈশ্বরের প্রতি তাহা আরোপ করিয়া তাঁহারা এই অপূর্ব্ব ভক্তিতত্ত্ব রচনা করিয়াছেন এবং তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্য ব্রজলীলার অবতারণা। জননীর প্রেম মানবপ্রীতির অতি উচ্চ আকার। সুতরাং বৈষ্ণব-সাধকগণ কেবল ঈশ্বরকে পিতা বা মাতা বলিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। আরও গভীরে গিয়া তাঁহাকে সন্তান বলিলেন। অন্যান্য ধর্ম্মে ঈশ্বরকে পিতা বা মাতা বলা হইয়াছে; পিতামাতার প্রতি সন্তানের প্রেম অপেক্ষা সন্তানের প্রতি পিতামাতার প্রেম অধিকতর গভীর; তাই বৈষ্ণবধর্ম্মে ঈশ্বরকে সন্তানরূপে অনুভব করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। চৈতন্যদেব ইহা শুনিয়া বলিলেন, "ইহা অতি উত্তমতত্ত্ব। যদি আরও কোনও উচ্চতর তত্ত্ব থাকে তাহা বল।" তদুত্তরে রামানন্দ রায় বলিলেন, "কান্তভাব সর্ব্বসাধ্য সার।" কান্তভাবের অর্থ ঈশ্বরকে স্বামীরূপে দেখা।

জননীর ভালবাসা অপেক্ষা যদি জগতে কোন গাঢ়তর ভালবাসা থাকে তবে তাহা পতির প্রতি পত্নীর ভালবাসা। বৈষ্ণব ভক্তগণ ঈশ্বকে এইভাবে দেখার নাম কান্তভাব বলিয়াছেন; এবং ইহাকেই ধর্ম্মরাজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। (বৈষ্ণবধর্ম্মের বাহিরেও কোন কোন স্থানে এই ভাব সাধন করা হইয়াছে। খৃষ্টীয় রোমান ক্যাথোলিক সম্প্রদায়ে ম্যাডাম গেঁয়ো প্রভৃতি কোন কোন সাধক ও সাধিকা উপাস্য দেবতাকে পতিরূপে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে এই সাধনের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার মূল উদ্দেশ্য এই কান্তভাবের ব্যাখ্যা। ব্রজ-গোপীগণ কৃষ্ণকে যে ভাবে দেখিতেন, বৈষ্ণবসাধকগণ ঈশ্বরকে সেই ভাবে দেখিতে উপদেশ দিয়াছেন। কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে গোপীগণ গৃহ, পতি, পুত্র, লজ্জা, ভয়, সমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার অন্বেষণে ছুটিতেন। ভক্তেরও তেমনি ভগবানের জন্য ধন মান পদ সুখ সম্পদ লজ্জা ভয় সমুদয় পায়ে ঠেলিয়া ঈশ্বরের অন্বেষণে বাহির হওয়া আবশ্যক। বৈষ্ণব কবি ও আচার্য্যগণ এই সত্য ব্রজলীলায় নানাভাবে বিবৃত করিয়াছেন। ব্রজলীলায় আরও একটি গভীরতর কথা আছে, শুধু ভক্ত ভগবানকে ভালবাসেন না, ভগবানও ভক্তকে ভালবাসেন। রাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল কৃষ্ণও তেমনি রাধার জন্য ব্যাকুল। অর্থাৎ ভক্ত যেমন ভগবানকে অন্বেষণ করেন, ভগবানও ভক্তের তেমনি অন্বেষণ করেন; অথবা ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রেম অপেক্ষা ভক্তের প্রতি ভগবানের প্রেম অধিকতর গভীর। ধর্ম্মরাজ্যে ইহা অতি গভীর তত্ত্ব। বৈষ্ণব কবি ও আচার্য্যগণ বহু দৃষ্টান্তের দ্বারা এই তত্ত্ব বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

আমাদের মনে হয় সমগ্র ব্রজলীলা একটি সুবৃহৎ আখ্যায়িকা

(parable)। বহু ভক্তকবি দীর্ঘকাল ধরিয়া ধীরে ধীরে এই আখ্যায়িকার অঙ্গ পুষ্টি করিয়াছেন। এই আখ্যায়িকার মূল তত্ত্ব জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার লীলা; শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা, ব্রজবাসিগণ জীবাত্মা; পরমাত্মা মানবাত্মার সহিত নিত্য যে লীলা করিতেছেন, নানাবিধ রূপকের দ্বারা ব্রজলীলায় তাহা বিবৃত করা হইয়াছে। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে মানবাত্মা যে পরমাত্মাকে নিরন্তর অন্বেষণ করিতেছে, রূপকের ছলে ভক্তগণ তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি ভগবানের আহ্বান বা আকর্ষণীশক্তি; তাহা শুনিয়া মানবাত্মা ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়। বৈষ্ণব কবিগণ যাহাকে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে ভক্তকবি রবীন্দ্রনাথ তাহাকে "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর," বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে গাভী সকল পর্য্যন্ত গন্তব্য পথে পরিচালিত হয় অর্থাৎ ঈশ্বরের নীরব বাণীতে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে। গোপীগণ এই বংশীধ্বনি শুনিয়া গৃহকার্য্য ফেলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য ধাবিত হন অর্থাৎ ঈশ্বরের আহ্বানে মানবাত্মা তাঁহার সহবাসের জন্য ব্যাকুল হইয়া ছোটে। এইরূপ ব্রজলীলার সকল বিবরণই মানবাত্মা ও জীবাত্মার লীলা বিষয়ক রূপক। রূপক বা parable ভাবে গ্রহণ করিলে ইহাতে অতি গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব পাওয়া যায়। কিন্তু রূপক ভুলিয়া ইহার স্থূল অর্থ লইলে ইহা অতি কদর্য্য ভাব ধারণ করে। ভক্ত কবিগণ রূপকভাবে যাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সময়ে সাধারণ লোকে তাহা স্থূল অর্থে গ্রহণ করায় প্রভূত অকল্যাণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয়, চৈতন্যদেব অন্তর্নিহিত ভাবার্থের জন্য ব্রজলীলা গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগবদোক্ত ভক্তিধর্ম্মের সাধনই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল; তাঁহার ধর্ম্মে ভাগবতের স্থান অতি উচ্চ ছিল। তিনি ভাগবতকেই প্রধান

শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাগবতের মুখ্য কথা ভক্তি; ভাগবত বলিতে তিনি ভক্তিই বুঝিতেন।

পূর্ব্ব বিবৃত ভক্তিসাধন শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মজীবনের গূঢ় কথা। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্ত ভাবের মধ্যে শেষ জীবনে চৈতন্যদেব বিশেষভাবে কান্তভাবই সাধন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ তাহাকে রাধা ভাবের অবতার বলেন। এই কথা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। চৈতন্যদেব ভগবানকে জীবনের স্বামীরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান জিনিষ এই ভক্তি। এমন উচ্ছ্বসিত ভগবদ্‌ভক্তি জগতে বুঝি আর কোথাও দেখা যায় না। তাঁহার সমুদয় মত বা কার্য্যের সমাদর করিতে পারা যাক্ বা না যাক্ এই ব্যাকুল আত্মহারা উচ্ছ্বসিত ভক্তির জন্য ধর্ম্মরাজ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের স্থান অতি উচ্চ। আমরা বিশ্বাস করি এমন দিন আসিবে যখন সমগ্র জগতে ধর্ম্মপিপাসু ব্যাকুলাত্মা নরনারীগণ এই জীবনের মাধুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন এবং শ্রদ্ধাভরে ইহার মহত্ত্ব স্বীকার করিবেন।